বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

প্রথম অংশ

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

সভাপতি

ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান সম্পাদক

শ্রীগোপাল হালদার

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীঅশোক ঘোষ

সাক্ষরতা প্রকাশন
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

প্রথম প্রকাশ
১০ এপ্রিল ১৯৭৩
২৭ চৈত্র ১৩৭৯

প্রকাশক
শ্রীপ্রণব ঘোষ
সাক্ষরতা প্রকাশন
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক
শ্রীমদন সিংহ
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

বাঁধাই
শ্রীদীন মহম্মদ
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

বর্ণলিপি
শ্রীমানব বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' আবির্ভাব (বঙ্গাব্দ বৈশাখ, ১২৭৯; খ্রীষ্টাব্দ এপ্রিল-মে, ১৮৭২) বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আশা করেছিলেন: "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন।···তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।" এ আশার একাংশ সার্থক হয়েছে, অন্য অংশ সার্থক হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও যে তা অনুভব না করেছিলেন, তা নয়। বঙ্গাব্দ ১২৮৫ অগ্রহায়ণের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর "লোকশিক্ষা" এক হিসাবে তার স্বীকৃতি। 'বঙ্গদর্শন' ইংরেজি শিক্ষিতের মনে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগাতে পেরেছিল, কিন্তু সেই সুশিক্ষিতের সমাজ থেকে সাধারণের মধ্যে সেই আনন্দ ও জ্ঞানের সম্পদ পৌঁছিয়ে দিতে পারে নি। বাঙালী জনসাধারণের অক্ষরজ্ঞানও লাভ হয় নি, ততক্ষণ তা সম্ভবও ছিল না। বঙ্কিমের প্রজ্বালিত আলো সাক্ষরতার সেই তৈলটুকুর অভাবে নতুন দীপ জ্বালতে পারল না।

আমরা সকলেই জানি—অক্ষরজ্ঞান হলেই মানুষ চতুর্ভুজ হয় না। সম্পূর্ণসাক্ষর দেশেও আশিক্ষা-কুশিক্ষা দেখা যায়। কিন্তু একটা কথা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে—এ যুগে অক্ষরজ্ঞান না থাকলে শিক্ষার পথ শত কথকতায়, রেডিও-চলচ্চিত্রাদিতেও মুক্ত হয় না। অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যিক ও প্রাথমিক সোপান। জনশিক্ষার প্রয়োজন-বোধ বঙ্কিমেরও ছিল, তাই তিনি তাঁর কালেই প্রাথমিক শিক্ষার সুপ্রসারের প্রস্তাবও সমর্থন করেছিলেন। জনশিক্ষার কর্মীমাত্রই একথাও স্মরণ করবে।

কিন্তু যে প্রধান কারণে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুলভ সংস্করণ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছে, তা এই—নতুন-সাক্ষর বাঙালীর বাঙলা পাঠে অগ্রসর হতে-হতে এমন বই পাঠ করা প্রয়োজন, যা তার জ্ঞানের সীমা বাড়াবে; যার সরসতায় তার মনও সঞ্জীবিত হবে; যার মধ্য দিয়ে সে সরল ও সরস বাঙলা ভাষার আস্বাদন লাভ করবে; বাঙালী জীবনের শ্রেষ্ঠ চিন্তাসম্পদেরও সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হবে; সর্বোপরি, যুক্তি ও বুদ্ধির অনুশীলনে সত্যই সে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। শুধু তাঁদেরই পক্ষে নয়,—শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত সকল বাঙালীর পক্ষেই বঙ্কিমসাহিত্য শিক্ষা ও রসাস্বাদনের অতুলনীয় ভাণ্ডার।

বঙ্কিমগ্রন্থাবলী একাধিক প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান অনেক বাঙালী পাঠকের হাতে দিয়ে এসেছেন—এ তাঁদের গৌরবের কথা, সৌভাগ্যেরও হয়তো কারণ। তার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-প্রকাশিত বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণের তুলনা নেই—তা প্রামাণিকতায় অগ্রগণ্য। কিন্তু সে সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। বঙ্কিম-গবেষকদের পক্ষে তা অপরিহার্য। বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রকাশিত বঙ্কিমগ্রন্থাবলীও অতুলনীয়—শিক্ষিত সাধারণ বাঙালীকে তা বঙ্কিম পড়বার সুযোগ দিয়েছে। সাহিত্য সংসদের প্রকাশিত সংস্করণ দুয়ের অনেকগুলি গুণের আধার। যোগেশচন্দ্রের 'পরিচয়' এবং মুদ্রণসৌকর্য

প্রশংসনীয়। কিন্তু আরও সুলভ ও সহজলভ্য সংস্করণ পেলে পাঠেচ্ছু অনেক বাঙালীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, আমরা তা অনুভব করেছি। বিশেষত, নতুন-সাক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত বাঙালী প্রায়ই দরিদ্র। কাজেই, লাভালাভের বৈষয়িক কথা সাক্ষরতা প্রকাশনের পরিচালকগণ বিবেচনা করেন নি; এঁদের প্রতি কর্তব্যপালনের দায়েই এই যথাসম্ভব সুলভ সংস্করণ প্রকাশে এঁরা দুঃসাহসী হয়েছেন।

সহযোগীদের সকলের নিকটই এঁরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু ব্যবসায়-স্বার্থে এঁদের প্রতি তির্যক মন্তব্য অজ্ঞাত নয়। তাই এঁরা সবিনয়ে জানাতে চান—'সৎ ব্যবসায়ী মাত্রেই স্বীকার করবেন—ঊনবিংশ শতাব্দীর মনস্বীরা তাঁদের দেশবাসীর জন্যই তাঁদের দান রেখে গিয়েছেন—শক্তিমান্ ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটবার জন্য নয়। দরিদ্র দেশের ক্রয়সামর্থ্য মনে না রেখে, শুধু মুনাফার স্বার্থে চিরায়ত সাহিত্য মুদ্রণ ও প্রকাশন কতটা সদ্ব্যবসায় জানি না, কিন্তু, সাধারণ মানুষকে তাঁদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনার কাজ, এবং পরলোকগত মনস্বীদের প্রতিও অবজ্ঞাসূচক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের জনসাধারণ চিরদিন এরূপ ব্যবসায়-স্বার্থের আব শিকার হয়ে থাকবে কেন?'

বলা নিষ্প্রয়োজন—বাঙালী পাঠকই এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দিষ্ট; তাই বঙ্কিমের বাঙলা রচনাই এই রচনা-সংগ্রহে সংগৃহীত হবে। ইচ্ছা থাকলেও সম্পূর্ণ আকারে 'পাঠভেদ' প্রদর্শন 'সংগ্রহের' বর্তমান আকাবে অসম্ভব। তবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আভাস ও বঙ্কিমলিখিত প্রয়োজনীয় 'বিজ্ঞাপনা'দি যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট হবে।

বঙ্কিম-সাহিত্য বলতে বঙ্কিমের উপন্যাসাদি যেমন বোঝায়, তেমনি বোঝায় তদপেক্ষা বৃহত্তর বঙ্কিমের প্রবন্ধসাহিত্য—আলোচনা, সমালোচনা ও নানা বিচারমূলক প্রবন্ধ। এই দুই প্রধান সাহিত্য-সম্পদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সহজসাধ্য করা প্রয়োজন। আবার, এ কালের মতো করে সে পরিচয় সাধিত হোক, বর্তমান যুগের এ দাবিও অসংগত নয়। কিন্তু বঙ্কিমপ্রতিভার সবিস্তার বর্ণনা ও সবিশদ মূল্যায়ন এক-আধ হাজার পৃষ্ঠায়ও অসম্ভব। সম্পাদকীয় ভূমিকায় শুধু রচনাসমূহের সূত্রনির্দেশ ও বঙ্কিম-জিজ্ঞাসার প্রকৃত তাৎপর্যের মোটামুটি আভাসই দেওয়া সম্ভব। আভাস মাত্র,—বিশদ বিচার নয়, সুসম্পূর্ণ মূল্যায়ন নয়; অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের তো প্রশ্নই ওঠে না।

'বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ' প্রকাশের এই আনন্দমুহূর্তে আমাদের পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা, সহায়ক, গ্রাহক-সাধারণ এবং বঙ্কিম-রচনার প্রকাশক, বঙ্কিম-গবেষক, বঙ্কিম-জীবনীকার বঙ্কিম-সমালোচক প্রভৃতি সকলের উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করছি। ইতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন
(উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

৭ এপ্রিল, ১৯৭৩

ভূমিকা

অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব ?" "লইয়া কি করিতে হয় ?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে…এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি।

ধর্মতত্ত্ব, ১১শ অধ্যায়, ঈশ্বরে ভক্তি।

পরিচয়-সূত্র

এই বঙ্কিমজীবনী। অথবা, এই নিয়ে বঙ্কিমের অন্তর্জীবন—জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন-সাধনা, জীবনোপলব্ধি। আপনার জীবনকে চরম পাদ থেকে দেখে এই বঙ্কিমের উত্তর। এই উত্তর ও এই উপলব্ধির গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার্য। কিন্তু তা সত্ত্বে বলতে হয়—এর মধ্যে অনেক কথা অনুক্ত থেকে গিয়েছে। বঙ্কিমের অন্তর্জীবনের একটা বিশিষ্ট সত্য—বঙ্কিমের রস-দৃষ্টি, তাঁর শিল্পচেতনা। বঙ্কিম যেমন মনস্বী তেমনি রসস্রষ্টা,—যেমন তাঁর ভাবয়িত্রী-প্রতিভা, তেমনি তাঁর কারয়িত্রী-প্রতিভা। বঙ্কিমের উপন্যাস ও রসরচনা প্রভৃতিকে ঈশ্বরভক্তির সোপান বলা যায় না; কিন্তু বঙ্কিম-প্রতিভার তা বিশিষ্ট এক প্রকাশ; বরং পাঠক-সাধারণের নিকট মনস্বী বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের ও কৃষ্ণচরিত্রের জীবন-দর্শন অপেক্ষা রূপস্রষ্টা বঙ্কিমের কথাসাহিত্য বেশি পরিচিত। এবং বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদ যাঁদের বিবেচনায় বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ দান, তাঁদেরও কাছে বঙ্কিমের রসসম্পদ কম আদরণীয় নয়। এই দুয়ে মিলেই বঙ্কিম—বঙ্কিম, তাঁর অন্তর্জীবন রচিত, বঙ্কিম-প্রতিভার সম্পূর্ণতা।

আরও একটু কথা আছে। অন্তর্জীবনটা আসল কথা বটে, কিন্তু আরও একটা জীবন আছে—তাকে বহির্জীবন বললে যথেষ্ট হয় না। কারণ, জীবন দুটো নয়, একটাই। নানা প্রয়োজনে তাকে ভাগ করে দেখতে হয়, এই মাত্র। সমগ্রভাবে তা দেখা সমীচীন, দুয়ের যোগাযোগও অনুধাবনযোগ্য। এ কথা ঠিক, বঙ্কিম আপনার রচনার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। 'বঙ্কিম সাহিত্যের কর্মযোগী' - তদতিরিক্ত নিজের কোনো পরিচয় রাখবার জন্য তিনি ব্যস্ত ছিলেন না। বঙ্কিম-পাঠকের কাছেও তা-ই প্রধান সত্য—বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবন। তার অতিরিক্ত যে জীবন—বঙ্কিম খেতেন-পরতেন; ডিপুটিগিরি করতেন; রাশভারি, ব্যক্তিত্ব-সচেতন পুরুষ ছিলেন; সগর্বে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন, সংসারের নানা সূত্রে বহুলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—দূরত্ব রক্ষা করেই আলাপ-আলোচনাও করেছেন, হয়তো ভক্তগোষ্ঠীতে সাহিত্য আলোচনায় আগ্রহীও হতেন; আবার, কখনো কখনো কারও ওপর বিরূপ হয়েছেন, স্বজনদের সঙ্গেও বিরোধ

হয়েছে, দৌহিত্র ভ্রাতুষ্পুত্রদের মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি, এসব তথ্যগুলি বঙ্কিমজীবনীর প্রমাণিত তথ্য, কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে এসব অনেক বিষয় গৌণ। যেমন ধরা যাক—

"শৈশবে বঙ্কিম খেলাধূলা ভালবাসিতেন না—তাঁহার শরীর এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাস খেলা পছন্দ করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড় গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না…কখনো ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না।" ('বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২২ এবং পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' পৃঃ ৪১-৪৫।)

এসব কথা কৌতূহলোদ্দীপক। ব্যবহারিক জীবনের মানুষটিকে চিনবার একটা উপকরণও বটে। কিন্তু সে মানুষের এ একটা গৌণ দিক মাত্র। কারণ, ডিপুটি বঙ্কিম ডাকাতদের শায়েস্তা করতে জানতেন, (মি. ই. বাকল্যাণ্ডের কথা), মিথ্যাপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীকেও শাস্তি দিতেন. সুবিচারক হাকিমও ছিলেন, সে দিনের উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীদের অন্যায়েও প্রতিবাদ করতেন—তাতে কখনো কখনো বিবাদও বাধত —(খুলনায় 'যৌবনে গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন'—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা', ব্রজেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত। পৃঃ ২৪-২৫।) এ কাহিনীতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বঙ্কিমের দৈহিক শক্তি সামান্য ছিল না, এবং তাঁর দৈহিকশ্রমবিমুখতার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমজীবনীর এ জাতীয় তথ্যে নিশ্চয়ই বঙ্কিম-মানসেরও আভাস কিছু-না-কিছু দেখা যায়। সাধারণভাবে অনুভব করা যায়, প্রবল ব্যক্তিত্ববান বঙ্কিম ছোট বড় দোষ-গুণের সহিত অসামান্য প্রতিভাবান্ পুরুষরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন। সেই পথে অনেক ছোট ছোট প্রবণতা ও ধারণা যেমন ছাড়িয়ে এসেছিলেন, কোনো কোনো প্রবণতা ও ধারণা তেমনি একেবারে পরিহার করতে পারেন নি, বা চান নি। জীবনীকারেরা ও সমসাময়িকেরা (যেমন, বঙ্কিমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ করে, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, কাশীনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি) বঙ্কিম সম্বন্ধে নানা চিত্তাকর্ষক তথ্য লিখে রেখে গিয়েছেন, তা সবই পাঠ্য। বঙ্কিম-মানসের বিকাশের দিক থেকে সেসব কিছু-কিছু তথ্যের গুরুত্ব আছে, প্রয়োজনমত তাও স্মরণীয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে বঙ্কিমপ্রতিভার মুখ্য-গৌণ সকল তথ্যের বিশদ পরিচয়ের অবকাশ এখানে নেই। বঙ্কিমের রচনাই আমাদের বিবেচনায় তার যথেষ্ট পরিচয়। তবে সে রচনার পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবন করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে প্রথম চাই বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী স্মরণে রাখা, বঙ্কিম-জীবনের দু-একটি অর্থপূর্ণ দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকা। তারপর, বঙ্কিম-রচনার সাধারণ পরিচয়-সূত্র নির্দেশ করা, এবং সর্বশেষে বঙ্কিম-সাহিত্যের স্বরূপ সংক্ষেপে বুঝতে যৎসামান্য চেষ্টা করা—এইমাত্র ভূমিকার স্বল্প সীমার মধ্যে সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবৃত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যনির্ভর জীবনী-সার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় (২২ নম্বর) সংকলন করেছেন, সেই সঙ্গে সজনীকান্ত দাস লিখিত 'সাহিত্য-জীবন'ও সংযোজিত হয়েছে। এবং কালানুক্রমিক 'গ্রন্থাবলী' ও 'জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী' সে পুস্তিকার শেষে উল্লেখিত হয়েছে। এই তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলেই গ্রাহ্য। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের 'বঙ্কিম-জীবনকথা' (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা) সম্বন্ধেও একথা সত্য। প্রধানত এইসব বিবরণ বঙ্কিম-জীবনীর সারাংশের জন্য অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। তবে বঙ্কিমের কর্মজীবনের কাল বাঙালী জীবনের গৌরবের কাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান-প্রধান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বঙ্কিমের 'জীবনপঞ্জী' ও 'রচনাপঞ্জী' লক্ষণীয়—পরবর্তী অংশে তা সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। এই ভূমিকায় আমরা বঙ্কিম-জীবনের দু-একটি প্রধান তথ্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই—বঙ্কিমের কোনো কোন প্রবণতা, ধারণা, প্রেরণা প্রভৃতির মূল ও তাঁর প্রতিভার সাধারণ বিবর্তন বোঝাই তার উদ্দেশ্য।

১। **পরিবার-পরিবেশ** ॥ বঙ্কিম সুসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠাপন্ন পরিবারের সন্তান। বাঙালী হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণে ও উচ্চশ্রেণীতে তাঁর জন্ম। এই জন্মগত পরিবেশ অর্থহীন নয়। বঙ্কিমের পিতা রায়বাহাদুর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকায় বিশালবপু বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। পুত্রদের উপর এই গৃহকর্তার শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব স্মরণীয়। তাঁদের কুলদেবতা রাধাবল্লভের প্রভাব বঙ্কিমের জীবনে সম্ভবত পূর্বাপর অব্যাহত ও অতলস্পর্শী। চন্দ্রনাথ বসুকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "উনি (কুলদেবতা) আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন, আমাদের সকল কথা শুনেন ও সব আবদার রক্ষা করেন, রোগে শোকে বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি। উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।" বুঝতে পারি, 'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম'—বঙ্কিমের নিজের সম্বন্ধে একথাও আসলে অত্যুক্তি—বড় জোর নাস্তিকদের মতো যুক্তিবাদী হতে চেয়েছিলেন। কারণ, সাধু সন্ন্যাসী সম্পর্কে বাড়ির বিশ্বাস তিনি কখনো হারান নি। ভগবদ্বিশ্বাস—বিশেষত শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসও তাঁর পরিবারগত অভ্যাস। শুধু তা নয়। যাদবচন্দ্রের এক সন্ন্যাসী গুরু ছিলেন—শোনা যায়, 'এক সন্ন্যাসীর কৃপায় তিনি বিপন্মুক্ত হন'। পরিবারের এই চলিত বিশ্বাস বঙ্কিমের জীবনে কখনো অচল হয় নি। সন্ন্যাসীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস পিতৃসূত্রে লব্ধ এবং আমরণ পরিপোষিত। তা ছাড়া, মেসমেরিজম্, যোগবল, ঝাড়া-ঝোড়া, মন্ত্রপড়া, তারকেশ্বরে মানত প্রভৃতি পরিবার-পরিবেশগত অলৌকিকতায় বিশ্বাসও তাঁর ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মিল, বেন্থাম, কোঁৎ প্রভৃতির মতবাদের অনুশীলন সত্ত্বেও তিনি অলৌকিকতায় বিশ্বাস পরিহার করেন নি। বঙ্কিম-সাহিত্যে তার ছাপ সুবিদিত। এমন কি, শোনা যায়, বঙ্কিম শেষ জীবনে কিছুদিন নিরামিষ আহার ও গেরুয়া কাপড়ও ধরেছিলেন।

২। **শিক্ষাজীবন** (১৮৪৬—১৮৫৮ খ্রী) ॥ "আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোনো শিক্ষকের কাছে কিছু শিখি নি।…ক্লাসে কখন

থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা ভালো লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকালের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি।"—এই মর্মের যে উক্তি (দ্রষ্টব্য : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ') আছে, তা যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকলেও আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। মদ্যপানে তখনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে বঙ্কিম মদ্যপান একেবারে ছাড়তে পারেন নি। কিন্তু মদ্যপান দোষের হলেও কুনীতি-জনক নয়। তবে বঙ্কিম সাহিত্যে যোগ্য শিক্ষক-অধ্যাপকের অভাব এবং উন্নত মাতৃ-চরিত্রের অভাব কেন, এই উক্তি থেকে তা বুঝি। অথচ বঙ্কিমসাহিত্যে স্মরণীয় নারী-চরিত্র যথেষ্ট।

বঙ্কিমেরই মুখে শুনি (ঐ পূর্বোক্ত "প্রসঙ্গ") "এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সেকথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং ঝাঁসীর রাণীর চেয়ে (ইউরোপীয় মনস্বিনী নারীর) কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই।....আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চটিয়াছে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।"

মাতার কাছে সমুচিত শিক্ষা না পেলেও বঙ্কিমের শিক্ষার বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়েছিল। ছাত্র হিসাবে বঙ্কিম অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জুনিয়র, সিনিয়র সকল পরীক্ষায় বৃত্তিধারী, আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও অগ্রগণ্য গ্র্যাজুয়েট—এসব তাঁর অসামান্য মেধার প্রমাণ। আপন আগ্রহে ও ইচ্ছানুরূপে বঙ্কিম ইংরেজিতে ও সংস্কৃতে ব্যাপক জ্ঞানসঞ্চয় করেন ('রজনী'র অমরনাথের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। সেই সঙ্গে হুগলী কলেজে পাঠকালে (১৮৪৬—১৮৫৬ খ্রী) 'সংবাদপ্রভাকরে' (১৮৫৫-৫৬-এর মধ্যে) কবিতা রচনায় তিনি অগ্রবর্তী হন। কবিতা তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার বিশিষ্ট রূপ নয়, সে প্রতিভার স্বরূপ ছাত্রজীবনে বঙ্কিম সন্ধান পান নি। তবে ছাত্রজীবনেই রচনার ঝোঁক তাঁকে পেয়েছিল, একথা স্মরণীয়।

৩। **কর্মজীবন** (১৮৫৮-১৮৯৪) ॥ 'বঙ্কিম সাহিত্যের কর্মযোগী' এবং সাহিত্যই তাঁর প্রধান কর্ম। (ক) সরকারী চাকরির (১৮৫৮—১৪।৯।৯১ অবধি) সচ্ছলতা ও প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই বাস্তবক্ষেত্রে সাহিত্য অনুশীলনের পক্ষে কতকটা তাঁর সহায়ক হয়েছিল। বাস্তব ও মানসিক ক্ষেত্রে আবার চাকরি কিছুটা তাকে ব্যাহতও করেছে। সরকারী চাকরির উপর তাই কিছুটা বিরাগও তাঁর লেখায় দেখা যায়। চাকরি জীবন—বঙ্কিমের নিজের ভাষায়—'আঘাত-সংঘাতের ইতিহাস' হলেও গণনীয়। কারণ—বঙ্কিম চাকরি-সূত্রে নানা স্থানে ঘুরেছেন, (উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ দেখেন নি, তাও স্মরণীয়), নানা চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, বরং চাকরির সচ্ছলতায় নিজের ঈপ্সিত প্রকাশও লাভ করতে পেরেছেন। চাকরিকালে তা ছাড়া বঙ্কিম কোথায় কী অবস্থায় কোন গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন,—তা মনে রাখাই এই কারণে যথেষ্ট। (এই জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য)।

(খ) ব্যক্তিজীবন॥ ব্যক্তিজীবনে সমধিক গুরুত্ব তাঁর স্ত্রীর। প্রথম পত্নীর বিয়োগের পরে রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয় (১৮৬০, জুন)।

বঙ্কিম একাধিক স্থলে জানিয়েছেন 'চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণস্বরূপা।" "আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন, একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।" কী হতেন, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল ও সূর্যমুখী-ভ্রমরের স্রষ্টার সম্বন্ধে তা কি অনুমান করা চলে? রূপজ মোহ তাঁর যথেষ্ট ছিল। স্মরগরলখণ্ডন রমণীয় মাধুর্যে সে মোহ রমণীয় অনুভূতিতে পরিণত হয় (শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর এই মর্মের কথা বিশেষ স্মরণীয়)। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যরসের উপলব্ধি—দুয়ে মিলে সে মোহেরই এই পরিণতি সম্ভব হয়ে থাকবে। বঙ্কিম-সাহিত্যে 'স্ত্রী-চরিত্রের উৎকর্ষের' একটি কারণ—বঙ্কিমের নিকটতম সেই নারী রাজলক্ষ্মী দেবী—রূপবতী, বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী বলে যিনি সকলের সম্মানিতা। অবশ্য অন্য মূল কারণও বঙ্কিমই নির্দেশ করেছেন. "এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ।"

(গ) সুহৃদ-সাহচর্য॥ এখানে প্রথমে স্মরণীয় দীনবন্ধু মিত্রের কথা (১৮৫৮ যশোরে দীনবন্ধুর সঙ্গে বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎ—তারপর আমরণ তাঁরা পরমসুহৃদ)। দ্বিতীয়, বঙ্কিমের দ্বিতীয় অগ্রজ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় স্মরণীয়—'বঙ্গদর্শনে'র লেখকগোষ্ঠী জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ,—যাঁদের বঙ্কিম বাঙলা লেখার আসরে টেনে আনলেন। পরবর্তীকালের শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু থেকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পর্যন্ত অনুজ সাহিত্য-সমাজকেও এর পরে গণনা করা চলে। কিন্তু রাশভারি, আত্মকীর্ত্তি-সচেতন বঙ্কিমের তাঁরা ব্যক্তিগত বন্ধু নন, গুণমুগ্ধ সাহিত্যানুজমাত্র। বঙ্কিম তাঁদের উপদেষ্টা,—সদাশয় কিন্তু স্বতন্ত্র।

(ঘ) সাহিত্য-জীবন (১৮৫৩-১৮৯৪ খ্রী) (১) দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশপূর্ব সাহিত্য প্রয়াসকে (১৮৫৩-১৮৬৪) 'পূর্বাভাস' বলাই যথেষ্ট। (২) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে 'প্রচারে'র বিলুপ্তি (১৮৮৯) পর্যন্ত কাল একসঙ্গে ধরলে তা বঙ্কিমের 'প্রকাশকাল'—বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের মধ্যাহ্ন। (৩) 'প্রচারে'র বিলোপ থেকে বঙ্কিমের মৃত্যু (৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪) পর্যন্ত (১৮৮৯-১৮৯৪) কাল 'অস্তকাল' :—সাহিত্যকর্ম তখন ধর্মপ্রচারে পরিণত, তবু কালটা গৌরব-বর্জিত নয়। অবশ্য প্রকাশকালের মধ্যে এই বিভাগও স্বীকার্য : দুর্গেশনন্দিনী থেকে মৃণালিনী পর্যন্ত (১৮৬৫-৭২)—'আবির্ভাব' বা প্রথম পর্ব, 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব থেকে 'প্রচার'-পূর্ব কাল (১৮৭২-১৮৮৪)—'বিকাশ' বা দ্বিতীয় পর্ব। এবং 'প্রচারে'র আরম্ভ থেকে বিলুপ্তি পর্যন্ত কাল—'প্রচার-কাল বা তৃতীয় পর্ব। সর্বশেষ অবশ্য অস্তচ্ছটা বা বিদায়কাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের রসসৃষ্টি ও মনস্বিতার সম্পর্কে আরও কতকটা বিশদ পরিচয় এই প্রবন্ধ-খণ্ডের শেষ অংশে দেওয়ার চেষ্টা করব।

৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩॥ গোপাল হালদার

সূচীপত্র

লোকরহস্য

বিজ্ঞানরহস্য

কমলাকান্ত

বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড)

বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড)



লোকরহস্য

ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল

প্রথম প্রবন্ধ

একদা সুন্দরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা সমবেত হইয়াছিল। নিবিড় বনমধ্যে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে ভীমাকৃতি বহুতর ব্যাঘ্র লাঙ্গুলে ভর করিয়া, দংষ্ট্রাপ্রভায় অরণ্যপ্রদেশ আলোকময় করিয়া, সারি সারি উপবেশন করিয়াছিল। সকলে একমত হইয়া অমিতোদর নামে এক অতি প্রাচীন ব্যাঘ্রকে সভাপতি করিলেন। অমিতোদর মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণপূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

"অদ্য আমাদিগের কি শুভ দিন! অদ্য আমরা যত অরণ্যবাসী মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্রকুলতিলক সকল পরস্পরের মঙ্গল সাধনার্থ এই অরণ্যমধ্যে একত্রিত হইয়াছি। আহা! কুৎসাকারী, খলস্বভাব অন্যান্য পশুবর্গে রটনা করিয়া থাকে যে, আমরা বড় অসামাজিক, একা এক বনেই বাস করিতে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এক্ষণে সভ্যতার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, শীঘ্রই ব্যাঘ্রেরা সভ্যজাতির অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনারা দিন দিন এইরূপ জাতিহিতৈষিতা প্রকাশ-পূর্ব্বক পরম সুখে নানাবিধ পশুহনন করিতে থাকুন।" (সভামধ্যে লাঙ্গুল চট্‌চটারব।)

"এক্ষণে হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যে প্রয়োজন সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করি। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এই সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-সমাজে বিদ্যার চর্চ্চা ক্রমে লোপ পাইতেছে। আমাদিগের বিশেষ অভিলাষ হইয়াছে, আমরা বিদ্বান্‌ হইব। কেন না, আজিকালি সকলেই বিদ্বান্‌ হইতেছে। আমরাও হইব। বিদ্যার আলোচনার জন্য এই ব্যাঘ্রসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, আপনারা ইহার অনুমোদন করুন।"

সভাপতির এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, সভ্যগণ হাউমাউ শব্দে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তখন যথারীতি কয়েকটি প্রস্তাব পঠিত এবং অনুমোদিত হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল। সে সকল ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট বটে, তাহাতে শব্দবিন্যাসের ছটা বড় ভয়ঙ্কর; বক্তৃতার চোটে সুন্দরবন কাঁপিয়া গেল।

পরে সভার অন্যান্য কার্য্য হইলে, সভাপতি বলিলেন, "আপনারা জানেন যে, এই সুন্দরবনে বৃহল্লাঙ্গুল নামে এক অতি পণ্ডিত ব্যাঘ্র বাস করেন। অদ্য রাত্রে তিনি আমাদিগের অনুরোধে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

মনুষ্যের নাম শুনিয়া কোন কোন নবীন সভ্য ক্ষুধা বোধ করিলেন। কিন্তু তৎকালে পব্লিক ডিনরের সূচনা না দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় সভাপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। এবং পথিকের ভীতিবিধায়ক স্বরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন,—

"সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ জন্তু। তাহারা পক্ষবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তাহাদিগকে পাখী বলা যায় না। বরং চতুষ্পদগণের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদগণের যে যে অঙ্গ, যে যে অস্থি আছে, মনুষ্যেরও সেইরূপ আছে। অতএব মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই। কেবল ঈদৃশ প্রভেদের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে যে, আমরা মনুষ্যকে দ্বিপদ বলিয়া ঘৃণা করি।

চতুষ্পদমধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য-পশু যে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুভক্ষ্য, তাহা আপনারা বোধ হয়, সকলেই অবগত আছেন। (শুনিয়া সভ্যগণ সকলে আপন আপন মুখ চাটিলেন।) তাহারা সচরাচর অনায়াসেই মারা পড়ে। মৃগাদির ন্যায় তাহারা দ্রুত পলায়নে সক্ষম নহে, অথচ মহিষাদির ন্যায় বলবান্ বা শৃঙ্গাদি আয়ুধ-যুক্ত নহে। জগদীশ্বর এই জগৎ-সংসার ব্যাঘ্রজাতির সুখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্রের উপাদেয় ভোজ্য পশুকে পলায়নের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা পর্য্যন্ত দেন নাই। বাস্তবিক মনুষ্যজাতি যেরূপ অরক্ষিত —নখ-দন্ত-শৃঙ্গাদি বর্জ্জিত, গমনে মন্থর এবং কোমলপ্রকৃতি, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাঘ্রজাতির সেবা ভিন্ন ইহাদিগের জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না।

এই সকল কারণে, বিশেষ তাহাদিগের মাংসের কোমলতা হেতু, আমরা মনুষ্যজাতিকে বড় ভালবাসি। দৃষ্টিমাত্রেই ধরিয়া খাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারাও বড় ব্যাঘ্রভক্ত। এই কথায় যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তবে তাহার উদাহরণস্বরূপ আমার যাহা ঘটিয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বলি। আপনারা অবগত আছেন, আমি বহুকালাবধি দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছি। আমি যে দেশে প্রবাসে ছিলাম, সে দেশ এই ব্যাঘ্র-ভূমি সুন্দরবনের উত্তরে আছে। তথায় গো মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রাশয় অহিংস্র পশুগণই বাস করে। তথাকার মনুষ্য দ্বিবিধ; এক জাতি কৃষ্ণবর্ণ, এক জাতি শ্বেতবর্ণ। একদা আমি সেই দেশে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গমন করিয়াছিলাম।"

শুনিয়া মহাদংষ্ট্রানামে একজন উদ্ধতস্বভাব ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষয়-কর্ম্মটা কি?"

বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় কহিলেন, "বিষয়কর্ম্ম, আহারান্বেষণ। এখন সভ্যলোকে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে। ফলে সকলেই যে আহারান্বেষণকে বিষয়কর্ম্ম বলে, এমত নহে। সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্ত্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি; বলবানের

আহারান্বেষণ দস্যুতা ; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না ; তৎপরিবর্ত্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্য্যের নাম দস্যুতা ; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই ; এক উদর-পূজা নাম রাখিলেই বীরত্বাদি সকল বুঝাইতে পারে।

সে যাহাই হউক, যাহা বলিতেছিলাম, শ্রবণ করুন। মনুষ্যেরা বড় ব্যাঘ্রভক্ত। আমি একদা মনুষ্যবসতিমধ্যে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছেন, কয়েক বৎসর হইল, এই সুন্দরবনে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছিল।"

মহাদংষ্ট্রা পুনরায় বক্তৃতা বন্ধ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি কিরূপ জন্তু ?"

বৃহল্লাঙ্গুল কহিলেন, "তাহা আমি সবিশেষ অবগত নহি। ঐ জন্তুর আকার, হস্ত-পদাদি কিরূপ, জিঘাংসাই বা কেমন ছিল, ঐ সকল আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি, ঐ জন্তু মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত ; মনুষ্যদিগেরই হৃদয়-শোণিত পান করিত ; এবং তাহাতে বড় মোটা হইয়া মরিয়া গিয়াছে। মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্ব্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা যে সকল অস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই সকল অস্ত্রই এ কথার প্রমাণ। মনুষ্যবধই ঐ সকল অস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে। আমার বোধ হয়, মনুষ্যগণ পরস্পরের বিনাশার্থ এই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি নামক রাক্ষসের সৃজন করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আপনারা স্থির হইয়া এই মনুষ্য-বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মধ্যে মধ্যে রসভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বক্তৃতা হয় না। সভ্যজাতিদিগের এরূপ নিয়ম নহে। আমরা এক্ষণে সভ্য হইয়াছি, সকল কাজে সভ্যদিগের নিয়মানুসারে চলা ভাল।

আমি একদা সেই পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির বাসস্থান মাতলায় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গিয়াছিলাম। তথায় এক বংশমণ্ডপ-মধ্যে একটা কোমলমাংসযুক্ত নৃত্যশীল ছাগবৎস দৃষ্টি করিয়া তদাস্বাদনার্থ মণ্ডপ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ঐ মণ্ডপ ভৌতিক—পশ্চাৎ জানিয়াছি, মনুষ্যেরা উহাকে ফাঁদ বলে। আমার প্রবেশ মাত্র আপনা হইতে তাহার দ্বার রুদ্ধ হইল। কতকগুলি মনুষ্য তৎপরে সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহারা আমার দর্শন পাইয়া পরমানন্দিত হইল, এবং আহ্লাদসূচক চীৎকার, হাস্য, পরিহাসাদি করিতে লাগিল। তাহারা যে আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেহ আমার আকারের প্রশংসা করিতেছিল, কেহ আমার দন্তের, কেহ নখের, কেহ লাঙ্গুলের গুণগান করিতে লাগিল। এবং অনেকে আমার উপর প্রীত হইয়া, পত্নীর সহোদরকে যে সম্বোধন করে, আমাকে সেই প্রিয়সম্বোধন করিল। পরে তাহারা ভক্তিভাবে আমাকে মণ্ডপ-সমেত স্কন্ধে বহন করিয়া, এক শকটের উপর উঠাইল। দুই অমলশ্বেতকান্তি বলদ ঐ শকট বহন করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কিন্তু তৎকালে ভৌতিক মণ্ডপ হইতে বাহির হইবার উপায় ছিল না, এ জন্য অর্দ্ধভুক্ত ছাগে তাহা পরিতৃপ্ত করিলাম। আমি সুখে

শকটারোহণ করিয়া ছাগমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে এক নগরবাসী শ্বেতবর্ণ মনুষ্যের আবাসে উপস্থিত হইলাম। সে আমার সম্মানার্থ স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। এবং লৌহদণ্ডাদিভূষিত এক সুরম্য গৃহমধ্যে আমার আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তথায় সজীব বা সদ্য হত ছাগ মেষ গবাদির উপাদেয় মাংস শোণিতের দ্বারা আমার সেবা করিত। অন্যান্য দেশবিদেশীয় বহুতর মনুষ্য আমাকে দর্শন করিতে আসিত, আমিও বুঝিতে পারিতাম যে, উহারা আমাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইত।

আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আর ফিরিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? আহা! তোমাকে যখন মনে পড়িত, তখন আমি ছাগমাংস ত্যাগ করিতাম, মেষমাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম)—এবং সর্ব্বদা লাঙ্গুলাঘাতের দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের চিন্তা লোককে জানাইতাম। হে জন্মভূমি! যতদিন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততদিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই। দুঃখের অধিক পরিচয় আর কি দিব, পেটে যাহা ধরিত, তাহাই খাইতাম, তাহার উপর আর দুই চারি সের মাত্র মাংস খাইতাম। আর খাইতাম না।"

তখন বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়, জন্মভূমির প্রেমে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, তিনি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং দুই এক বিন্দু স্বচ্ছ ধারা পতনের চিহ্ন ভূতলে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় যুবা ব্যাঘ্র তর্ক করেন যে, সে বৃহল্লাঙ্গুলের অশ্রুপতনের চিহ্ন নহে। মনুষ্যালয়ের প্রচুর আহারের কথা স্মরণ হইয়া সেই ব্যাঘ্রের মুখে লাল পড়িয়াছিল।

লেক্চরর তখন ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরপি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "কি প্রকারে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই হউক, আর ভুলক্রমেই হউক, আমার ভৃত্য একদিন আমার মন্দির-মার্জ্জনান্তে দ্বার মুক্ত রাখিয়া গিয়াছিল। আমি সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যানরক্ষককে মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম।

এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলার কারণ এই যে, আমি বহুকাল মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া আসিয়াছি—মনুষ্যচরিত্র সবিশেষ অবগত আছি—শুনিয়া আপনারা আমার কথায় বিশেষ আস্থা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব। অন্য পর্য্যটকদিগের ন্যায় অমূলক উপন্যাস বলা আমার অভ্যাস নাই। বিশেষ মনুষ্য-সম্বন্ধে অনেক উপন্যাস আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি; আমি সে সকল কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীবী হইয়াও পর্ব্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে। ঐরূপ পর্ব্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়,

তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্ব্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি ; তবে তাহা বহুগুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।*

মনুষ্য-জন্তু উভয়াহারী। তাহারা মাংসভোজী ; এবং ফলমূলও আহার করে। বড় বড় গাছ খাইতে পারে না ; ছোট ছোট গাছ সমূলে আহার করে। মনুষ্যেরা ছোট গাছ এত ভালবাসে যে, আপনারা তাহার চাষ করিয়া ঘেরিয়া রাখে। ঐরূপ রক্ষিত ভূমিকে ক্ষেত বা বাগান বলে। এক মনুষ্যের বাগানে অন্য মনুষ্য চরিতে পায় না।

মনুষ্যেরা ফল মূল লতা গুল্মাদি ভোজন করে বটে, কিন্তু ঘাস খায় কি না, বলিতে পারি না। কখন কোন মনুষ্যকে ঘাস খাইতে দেখি নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু সংশয় আছে। শ্বেতবর্ণ মনুষ্যেরা এবং কৃষ্ণবর্ণ ধনবান্ মনুষ্যেরা বহু যত্নে আপন আপন উদ্যানে ঘাস তৈয়ার করে। আমার বিবেচনায় উহারা ঐ ঘাস খাইয়া থাকে। নহিলে ঘাসে তাহাদের এত যত্ন কেন? এরূপ আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের মুখে শুনিয়াছিলাম। সে বলিতেছিল, 'দেশটা উচ্ছন্ন গেল—যত সাহেব সুবো বড় মানুষে বসে বসে ঘাস খাইতেছে।' সুতরাং প্রধান মনুষ্যেরা যে ঘাস খায়, তাহা এক প্রকার নিশ্চয়।

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই?' আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহাবা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

মনুষ্যেরা পশু পূজা করে। আমার যে প্রকার পূজা করিয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। অশ্বদিগেরও উহারা ঐরূপ পূজা করিয়া থাকে ; অশ্বদিগকে আশ্রয় দান করে, আহার যোগায়, গাত্র ধৌত ও মার্জ্জনাদি করিয়া দেয়। বোধ হয়, অশ্ব মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ পশু বলিয়াই মনুষ্যেরা তাহার পূজা করে।

মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। গো সম্বন্ধে তাহাদের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে ; তাহারা গোরুর দুগ্ধ পান করে। ইহাতে পূর্ব্বকালের ব্যাঘ্র পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যেরা কোন কালে গোরুর বৎস ছিল। আমি তত দূর বলি না, কিন্তু এই কারণেই বোধ করি, গোরুর সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিগত সাদৃশ্য দেখা যায়।

সে যাহাই হউক, মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি, সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মানুষের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগ ও মেষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য-জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

* পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মাক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি, এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্রপণ্ডিতে এবং মনুষ্যপণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।

মনুষ্যালয়ে অনেক বানরও দেখিলাম। সে সকল বানর দ্বিবিধ; এক সলাঙ্গুল, অপর লাঙ্গুলশূন্য। সলাঙ্গুল বানরেরা প্রায় ছাদের উপর, না হয় গাছের উপর থাকে। নীচেও অনেক বানর আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বানরই উচ্চপদস্থ। বোধ হয়, বংশ-মর্য্যাদা বা জাতিগৌরব ইহার কারণ।

মনুষ্যচরিত্র অতি বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে বিবাহের যে রীতি আছে, তাহা অত্যন্ত কৌতুকাবহ। তদ্ভিন্ন তাহাদিগের রাজনীতিও অত্যন্ত মনোহর। ক্রমে ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি।"

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি অমিতোদর, দূরে একটি হরিণশিশু দেখিতে পাইয়া, চেয়ার হইতে লাফ দিয়া তদনুসরণে ধাবিত হইলেন। অমিতোদর এইরূপ দূরদর্শী বলিয়াই সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতিকে অকস্মাৎ বিদ্যালোচনায় বিমুখ দেখিয়া প্রবন্ধপাঠক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া একজন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, সভাপতি মহাশয় বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে দৌড়িয়াছেন। হরিণের পাল আসিয়াছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র মহাবিজ্ঞ সভ্যেরা লাঙ্গুলোত্থিত করিয়া, যিনি যে দিকে পারিলেন, সেই দিকে বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় ধাবিত হইলেন। লেকৃচররও এই বিদ্যার্থী-দিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে সে দিন ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা অকালে ভঙ্গ হইল।

পরে তাঁহারা অন্য একদিন সকলে পরামর্শ করিয়া আহারান্তে সভার অধিবেশন করিলেন। সে দিন নির্বিঘ্নে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ পঠিত হইল। তাহার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলে, আমরা প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

সভাপতি মহাশয়, বাঘিনীগণ, এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ!

আমি প্রথম বক্তৃতায় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, মানুষের বিবাহপ্রণালী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিব। ভদ্রের অঙ্গীকার পালনই প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আমি একবারেই আমার বিষয়ে প্রবেশ করিলাম।

বিবাহ কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই অবগত আছেন। সকলেই মধ্যে মধ্যে অবকাশ মতে বিবাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যবিবাহে কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি সভ্য পশুদিগের দারপরিগ্রহ কেবল প্রয়োজনাধীন, মনুষ্যপশুর সেরূপ নহে—তাহাদের মধ্যে অনেকেই এককালীন জন্মের মত বিবাহ করিয়া রাখে।

মনুষ্যবিবাহ দ্বিবিধ—নিত্য এবং নৈমিত্তিক। তন্মধ্যে নিত্য অথবা পৌরোহিত বিবাহই মান্য। পুরোহিতকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাই পৌরোহিত বিবাহ।

মহাদংষ্ট্রা। পুরোহিত কি?

বৃহল্লাঙ্গুল। অভিধানে লেখে, পুরোহিত চালকলাভোজী বঞ্চনাব্যবসায়ী মনুষ্য-বিশেষ। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দুষ্ট। কেন না, সকল পুরোহিত চালকলাভোজী নহে,

অনেক পুরোহিত মদ্য মাংস খাইয়া থাকেন ; অনেক পুরোহিত সর্ব্বভুক্। পক্ষান্তরে চালকলা খাইলেই পুরোহিত হয়, এমত নহে। বারাণসী নামক নগরে অনেকগুলিন ষাঁড় আছে—তাহারা চালকলা খাইয়া থাকে। তাহারা পুরোহিত নহে, তাহার কারণ তাহারা বঞ্চক নহে। বঞ্চকে যদি চালকলা খায়, তাহা হইলেই পুরোহিত হয়।

পৌরোহিত বিবাহে এইরূপ একজন পুরোহিত বরকন্যার মধ্যবর্ত্তী হইয়া বসে। বসিয়া কতকগুলা বকে। এই বক্তৃতাকে মন্ত্র বলে। তাহার অর্থ কি, আমি সবিশেষ অবগত নহি, কিন্তু আমি যেরূপ পণ্ডিত, তাহাতে ঐ সকল মন্ত্রের একপ্রকার অর্থ মনে মনে অনুভূত করিয়াছি। বোধ হয়, পুরোহিত বলে, "হে বরকন্যা! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা বিবাহ কর। তোমরা বিবাহ করিলে, আমি নিত্য চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। এই কন্যার গর্ভাধানে, সীমন্তোন্নয়নে, সূতিকাগারে, চালকলা পাইব—অতএব তোমরা বিবাহ কর। সন্তানের ষষ্ঠীপূজায়, অন্নপ্রাশনে, কর্ণবেধে, চূড়াকরণে বা উপনয়নে—অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কর। তোমরা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বদা ব্রতনিয়মে, পূজাপার্ব্বণে, যাগযজ্ঞে রত হইবে, সুতরাং আমি অনেক চালকলা পাইব, অতএব তোমরা বিবাহ কব। বিবাহ কর, কখন এ বিবাহ রহিত করিও না। যদি রহিত কর, তবে আমার চালকলার বিশেষ বিঘ্ন হইবে। তাহা হইলে এক এক চপেটাঘাতে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের এইরূপ আজ্ঞা।" বোধ হয়, এই শাসনের জন্যই পৌরোহিত বিবাহ কখন রহিত হয় না।

আমাদিগের মধ্যে যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাকে নৈমিত্তিক বিবাহ বলা যায়। মনুষ্যমধ্যে এরূপ বিবাহও সচরাচর প্রচলিত। অনেক মনুষ্য এবং মানুষী, নিত্য নৈমিত্তিক উভয়বিধ বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ প্রভেদ এই যে নিত্য বিবাহ কেহ গোপন করে না, নৈমিত্তিক বিবাহ সকলেই প্রাণপণে গোপন করে। যদি একজন মনুষ্য অন্য মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে কখন কখন তাহাকে ধরিয়া প্রহার করে। আমার বিবেচনায় পুরোহিতরাই এই অনর্থের মূল। নৈমিত্তিক বিবাহে তাহারা চালকলা পায় না—সুতরাং ইহার দমনই তাহাদের উদ্দেশ্য—তাহাদের শিক্ষামতে সকলেই নৈমিত্তিকবিবাহকারীকে ধরিয়া প্রহার করে। কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে, অনেকেই গোপনে স্বয়ং নৈমিত্তিক বিবাহ করে, অথচ পরকে নৈমিত্তিক বিবাহ করিতে দেখিলে ধরিয়া প্রহার করে!

ইহাতে আমার বিবেচনা হইতেছে যে, অনেক মনুষ্যই নৈমিত্তিক বিবাহে সম্মত, তবে পুরোহিত প্রভৃতির ভয়ে মুখ ফুটিতে পারে না। আমি মনুষ্যালয়ে বাসকালীন জানিয়া আসিয়াছি, অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্যের নৈমিত্তিক বিবাহে বিশেষ আদর। যাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য, সুতরাং পশুবৃত্ত, তাঁহারাই এ বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমার এমনও ভরসা আছে যে, কালে মনুষ্যজাতি আমাদিগের ন্যায় সুসভ্য হইলে, নৈমিত্তিক বিবাহ তাহাদের মধ্যে সমাজসম্মত হইবে। অনেক মনুষ্যপণ্ডিত তৎপক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক গ্রন্থাদি লিখিতেছেন। তাঁহারা স্বজাতিহিতৈষী, সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, সম্মানবর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগকে এই ব্যাঘ্র-সমাজের অনরারি মেম্বর নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। ভরসা করি, তাঁহারা সভাস্থ হইলে, আপনারা তাঁহাদিগকে জলযোগ করিবেন না। কেন না, তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নীতিজ্ঞ এবং লোকহিতৈষী।

মনুষ্যমধ্যে বিশেষ এক প্রকার নৈমিত্তিক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে মৌদ্রিক বিবাহ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার বিবাহ সম্পন্নার্থ মানুষ মুদ্রার দ্বারা কোন মানুষীর করতল সংস্পৃষ্ট করে। তাহা হইলেই মৌদ্রিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মহাদংষ্ট্রা। মুদ্রা কি ?

বৃহল্লাঙ্গুল। মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ। যদি আপনাদিগের কৌতূহল থাকে, তবে আমি সবিশেষে সেই মহাদেবীর গুণ কীর্ত্তন করি। মনুষ্য যত দেবতার পূজা করে, তন্মধ্যে ইহার প্রতিই তাহাদের বিশেষ ভক্তি। ইনি সাকারা। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রে ইঁহার প্রতিমা নির্ম্মিত হয়। লৌহ, টিন এবং কাষ্ঠে ইঁহার মন্দির প্রস্তুত করে। রেশম, পশম, কার্পাস, চর্ম্ম প্রভৃতিতে ইঁহার সিংহাসন রচিত হয়। মানুষগণ রাত্রিদিন ইঁহার ধ্যান করে, এবং কিসে ইঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে, সেই জন্য সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না। যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যুক্ত করে স্তব স্তুতি করিতে থাকে। যদি মুদ্রাদেবীর অধিকারী একবার তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন।

দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্ম্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে ; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি ? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি ? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান্ হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও, মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়। আমরা যদি "বড় বাঘ" বলি, তবে অমিতোদর, মহাদংষ্ট্রা প্রভৃতি প্রকাণ্ডাকার মহাব্যাঘ্রগণকে বুঝাইবে। কিন্তু মনুষ্যালয়ে "বড় মানুষ" বলিলে সেরূপ অর্থ হয় না—আট হাত বা দশ হাত মানুষ বুঝায় না, যাহার ঘরে এই দেবী বাস করেন, তাহাকেই "বড় মানুষ" বলে। যাহার ঘরে এই দেবী স্থাপিতা নহেন, সে পাঁচ হাত লম্বা হইলেও তাহাকে "ছোট লোক" বলে।

মুদ্রাদেবীর এইরূপ নানাবিধ গুণগান শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, মনুষ্যালয় হইতে ইঁহাকে আনিয়া ব্যাঘ্রালয়ে স্থাপন করিব। কিন্তু পশ্চাৎ যাহা শুনিলাম, তাহাতে বিরত হইলাম। শুনিলাম যে, মুদ্রাই মনুষ্যজাতির যত অনিষ্টের মূল। ব্যাঘ্রাদি প্রধান পশুরা কখন স্বজাতির হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্যেরা সর্ব্বদা আত্মজাতির হিংসা করিয়া থাকে। মুদ্রাপূজাই ইহার কারণ। মুদ্রার লোভে, সকল মনুষ্যেই পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টায় রত। প্রথম বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, মনুষ্যেরা সহস্রে সহস্রে প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া পরস্পরকে হনন করে। মুদ্রাই তাহার কারণ।

মুদ্রাদেবীর উত্তেজনায় সর্ব্বদাই মনুষ্যেরা পরস্পরে হত, আহত, পীড়িত, অবরুদ্ধ, অপমানিত, তিরস্কৃত করে। মনুষ্যলোকে বোধ হয়, এমত অনিষ্টই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহপ্রেরিত নহে। ইহা আমি জানিতে পারিয়া, মুদ্রাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার পূজার অভিলাষ ত্যাগ করিলাম।

কিন্তু মনুষ্যেরা ইহা বুঝে না। প্রথম বক্তৃতাতেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যেরা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী—সর্ব্বদাই পরস্পরের অমঙ্গল চেষ্টা করে। অতএব তাহারা অবিরত রূপার চাকি ও তামার চাকি সংগ্রহের চেষ্টায় কুমারের চাকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনুষ্যদিগের বিবাহতত্ত্ব যেমন কৌতুকাবহ, অন্যান্য বিষয়ও তদ্রূপ। তবে পাছে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলে, আপনাদিগের বিষয়কর্ম্মের সময় পুনরুপস্থিত হয়, এই জন্য অদ্য এইখানে সমাধা করিলাম। ভবিষ্যতে যদি অবকাশ হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।"

এইরূপে বক্তৃতা সমাধা করিয়া পণ্ডিতবর ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, বিপুল লাঙ্গুল-চট্‌চটারবমধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন দীর্ঘনখ নামে এক সুশিক্ষিত যুবা ব্যাঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হাউ মাউ শব্দে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন।

দীর্ঘনখ মহাশয় গর্জ্জনান্তে বলিলেন, "হে ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! আমি অদ্য বক্তার সদ্বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করি। কিন্তু ইহা বলাও কর্ত্তব্য যে, বক্তৃতাটি নিতান্ত মন্দ; মিথ্যাকথাপরিপূর্ণ, এবং বক্তা অতি গণ্ডমূর্খ।"

অমিতোদর। আপনি শান্ত হউন। সভ্যজাতীয়েরা অত স্পষ্ট করিয়া গালি দেয় না। প্রচ্ছন্নভাবে আপনি আরও গুরুতর গালি দিতে পারেন।

দীর্ঘনখ। "যে আজ্ঞা। বক্তা অতি সত্যবাদী, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কথা অপ্রকৃত হইলেও, দুই একটা সত্য কথা পাওয়া যায়। তিনি অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, এই বক্তৃতার মধ্যে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু আমরা যাহা পাইলাম, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তবে বক্তৃতার সকল কথায় সম্মতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিশেষ, আদৌ মনুষ্যমধ্যে বিবাহ কাহাকে বলে, বক্তা তাহাই অবগত নহেন। ব্যাঘ্রজাতির কুলরক্ষার্থ যদি কোন বাঘ কোন বাঘিনীকে আপন সহচরী করে (সহচরী, সঙ্গে চরে) তাহাকেই আমরা বিবাহ বলি। মানুষের বিবাহ সেরূপ নহে। মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং প্রভুভক্ত। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটি প্রভু চাহি। সকল মনুষ্যই এক একজন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে। যখন তাহারা কাহাকে সাক্ষী রাখিয়া প্রভু নিয়োগ করে, তখন সে বিবাহকে পৌরোহিত বিবাহ বলা যায়। সাক্ষীর নাম পুরোহিত। বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয় বিবাহমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ। সে মন্ত্র এইরূপ;—

পুরোহিত। বল, আমাকে কি বিষয়ের সাক্ষী হইতে হইবে?

বর। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই স্ত্রীলোকটিকে জন্মের মত আমার প্রভুত্বে নিযুক্ত করিলাম।

পুরো। আর কি?

বর। আর আমি জন্মের মত ইঁহার শ্রীচরণের গোলাম হইলাম। আহার যোগানের ভার আমার উপর;—খাইবার ভার উঁহার উপর।

পুরো। (কন্যার প্রতি) তুমি কি বল ?

কন্যা। আমি ইচ্ছাক্রমে এই ভৃত্যটিকে গ্রহণ করিলাম। যত দিন ইচ্ছা হইবে, চরণসেবা করিতে দিব। যে দিন ইচ্ছা না হইবে, সে দিন নাতি মারিয়া তাড়াইয়া দিব।

পুরো। শুভমস্তু।

এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে। যথা, মুদ্রাকে বক্তা মনুষ্যপূজিত দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দেবতা নহে। মুদ্রা একপ্রকার বিষচক্র। মনুষ্যেরা অত্যন্ত বিষপ্রিয়, এই জন্য সচরাচর মুদ্রাসংগ্রহজন্য যত্নবান্। মনুষ্যগণকে মুদ্রাভক্ত জানিয়া আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, 'না জানি, মুদ্রা কেমনই উপাদেয় সামগ্রী, আমাকে একদিন খাইয়া দেখিতে হইবে।' একদা বিদ্যাধরী নদীর তীরে একটা মনুষ্যকে হত করিয়া ভোজন করিবার সময়ে, তাহার বস্ত্রমধ্যে কয়েকটা মুদ্রা পাইলাম। পাইবামাত্র উদরসাৎ করিলাম। পরদিবস উদরের পীড়া উপস্থিত হইল। সুতরাং মুদ্রা যে এক প্রকার বিষ, তাহাতে সংশয় কি ?"

দীর্ঘনখ এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিলে পর অন্যান্য ব্যাঘ্র মহাশয়েরা উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। পরে সভাপতি অমিতোদর মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—

"এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিষয়কর্ম্মের সময় উপস্থিত। বিশেষ, হরিণের পাল কখন্ আইসে, তাহার স্থিরতা কি ? অতএব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কালহরণ কর্ত্তব্য নহে। বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছে—এবং বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের নিকট আমরা বড় বাধিত হইলাম। এক কথা এই বলিতে চাহি যে, আপনারা দুই দিন যে বক্তৃতা শুনিলেন, তাহাতে অবশ্য বুঝিয়া থাকিবেন যে, মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষ্যগণকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবনভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। বিশেষ, মানুষেরা সভ্য হইলে, তাহাদের মাংস আরও কিছু সুস্বাদু হইতে পারে। এবং তাহারাও আরও সহজে ধরা দিতে পারে। কেন না, সভ্য হইলেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, ব্যাঘ্রদিগের আহারার্থ শরীরদান করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এইরূপ সভ্যতাই আমরা শিখাইতে চাই। অতএব আপনারা এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য যে মনুষ্যদিগকে অগ্রে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন।"

সভাপতি মহাশয় এইরূপে বক্তৃতা সমাপন করিয়া লাঙ্গুলচট্‌চটারব মধ্যে উপবেশন করিলেন, তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানান্তর ব্যাঘ্রদিগের মহাসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা যে যথায় পারিলেন, বিষয়কর্ম্মে প্রয়াণ করিলেন।

যে ভূমিখণ্ডে সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলিন বড় বড় গাছ ছিল। কতকগুলিন বানর তদুপরি আরোহণ করিয়া বৃক্ষপত্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যাঘ্রেরা সভাভূমি ত্যাগ করিয়া গেলে, একটি বানর মুখ বাহির করিয়া অন্য বানরকে ডাকিয়া কহিল, "বলি ভায়া, ডালে আছ ?"

দ্বিতীয় বানর বলিল, "আজ্ঞে, আছি।"

প্রথম বানর। আইস, আমরা এই ব্যাঘ্রদিগের বক্তৃতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

দ্বি, বা। কেন ?

প্র, বা। এই বাঘেরা আমাদিগের চিরশত্রু। আইস, কিছু নিন্দা করিয়া শত্রুতা সাধা যাউক।

দ্বি, বা। অবশ্য কর্ত্তব্য। কাজটা আমাদিগের জাতির উচিত বটে।

প্র, বা। আচ্ছা, তবে দেখ, বাঘেরা কেহ নিকটে নাই ত?

দ্বি, বা। না। তথাপি আপনি একটু প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলুন।

প্র, বা। সেই কথাই ভাল! নইলে কি জানি, কোন্ দিন কোন্ বাঘের সম্মুখে পড়িব, আর আমাকে ভোজন করিয়া ফেলিবে।

দ্বি, বা। বলুন। কি দোষ?

প্র, বা। প্রথম, ব্যাকরণ অশুদ্ধ। আমরা বানরজাতি, ব্যাকরণে বড় পণ্ডিত। ইহাদের ব্যাকরণ আমাদের বাহুরে ব্যাকরণের মত নহে।

দ্বি, বা। তার পর?

প্র, বা। ইহাদের ভাষা বড় মন্দ।

দ্বি, বা। হাঁ, উহারা বাহুরে কথা কয় না।

প্র, বা। ঐ যে অমিতোদর বলিল, 'ব্যাঘ্রদিগের কর্ত্তব্য, অগ্রে মনুষ্যদিগকে সভ্য করিয়া পশ্চাৎ ভোজন করেন,' ইহা না বলিয়া যদি বলিত, 'অগ্রে মনুষ্যদিগকে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সভ্য করেন,' তাহা হইলে সঙ্গত হইত।

দ্বি, বা। সন্দেহ কি—নহিলে আমাদের বানর বলিবে কেন?

প্র, বা। কি প্রকারে বক্তৃতা হয়, কি কি কথা বলিতে হয়, তাহা উহারা জানে না। বক্তৃতায় কিছু কিচমিচ করিতে হয়, কিছু লম্ফঝম্ফ করিতে হয়, দুই এক বার মুখ ভেঙ্গাইতে হয়, দুই এক বার কদলী ভোজন করিতে হয়, উহাদের কর্ত্তব্য, আমাদের কাছে কিছু শিক্ষা লয়।

দ্বি, বা। আমাদিগের কাছে শিক্ষা পাইলে বানর হইত, ব্যাঘ্র হইত না।

এমত সময়ে আরো কয়েকটা বানর সাহস পাইয়া উঠিল। এক বানর বলিল, "আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলিন নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্ব্বলেখকদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানর জাতি, চিরকাল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।"

তখন একটি রূপী বানর বলিয়া উঠিল, "আমি এই সকল বক্তৃতার মধ্যে হাজার এক দোষ তালিকা করিয়া বাহির করিতে পারি। আমি হাজার এক স্থানে বুঝিতে পারি নাই। যাহা আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত, তাহা মহাদোষ বই আর কি!"

আর একটি বানর কহিল, "আমি বিশেষ কোন দোষ দেখাইতে পারি না। কিন্তু আমি বায়ান্ন রকম মুখভঙ্গী করিতে পারি; এবং অশ্লীল গালিগালাজ দিয়া আপন সভ্যতা এবং রসিকতা প্রচার করিতে পারি।"

এইরূপে বানরেরা ব্যাঘ্রদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত রহিল। দেখিয়া এক স্থূলোদর বানর বলিল যে, "আমরা যেরূপ নিন্দাবাদ করিলাম, তাহাতে বৃহল্লাঙ্গুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। আইস, আমরা কদলী ভোজন করি।"

ইংরাজস্তোত্র

(মহাভারত হইতে অনুবাদিত)

হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১ ॥

তুমি নানাগুণে বিভূষিত, সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট, বহুলসম্পদযুক্ত ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ২ ॥

তুমি হর্ত্তা—শত্রুদলের ; তুমি কর্ত্তা—আইনাদির ; তুমি বিধাতা—চাকরি প্রভৃতির । অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৩ ॥

তুমি সমরে দিব্যাস্ত্রধারী, শিকারে বল্লমধারী, বিচারাগারে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট বেত্রধারী, আহারে কাঁটা-চামচেধারী ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৪ ॥

তুমি একরূপে রাজপুরীমধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া রাজ্য কর ; আর একরূপে পণ্য-বীথিকামধ্যে বাণিজ্য কর ; আর একরূপে কাছাড়ে চার চাষ কর ; অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৫ ॥

তোমার সত্ত্বগুণ তোমার প্রণীত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ ; তোমার রজোগুণ তোমার কৃত যুদ্ধাদিতে প্রকাশ ; তোমার তমোগুণ তোমার প্রণীত ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্রাদিতে প্রকাশ ।—অতএব হে ত্রিগুণাত্মক ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৬ ॥

তুমি আছ, এই জন্যই তুমি সৎ ! তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ ; এবং তুমি উমেদারবর্গের আনন্দ ; অতএব হে সচ্চিদানন্দ ! তোমাকে আমি প্রণাম করি । ৭ ॥

তুমি ব্রহ্মা—কেন না, তুমি প্রজাপতি ; তুমি বিষ্ণু—কেন না, কমলা তোমার প্রতিই কৃপা করেন ; এবং তুমি মহেশ্বর—কেন না, তোমার গৃহিণী গৌরী । অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৮ ॥

তুমি ইন্দ্র, কামান তোমার বজ্র ; তুমি চন্দ্র, ইন্‌কম টেক্‌স তোমার কলঙ্ক ; তুমি বায়ু, রেইলওয়ে তোমার গমন ; তুমি বরুণ, সমুদ্র তোমার রাজ্য ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ৯ ॥

তুমিই দিবাকর, তোমার আলোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে ; তুমিই অগ্নি—কেন না, সব খাও ; তুমিই যম, বিশেষ আমলাবর্গের । ১০ ॥

তুমি বেদ, আর ঋক্‌যজুষাদি মানি না ; তুমি স্মৃতি—মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি ; তুমি দর্শন—ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত । অতএব হে ইংরাজ ! তোমাকে প্রণাম করি । ১১ ॥

হে শ্বেতকান্ত ! তোমার অমল-ধবল দ্বিরদ-রদশুভ্র মহাশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করিব । ১২ ॥

তোমার হরিতকপিশ পিঙ্গললোহিত কৃষ্ণশুভ্রাদি নানাবর্ণশোভিত, অতিযত্নরঞ্জিত, ভল্লুকমেদমার্জ্জিত কুন্তলাবলি দেখিয়া আমার বাসনা হইয়াছে, আমি তোমার স্তব করিব ; অতএব হে ইংরাজ ! আমি তোমাকে প্রণাম করি । ১৩ ॥

তুমি কলিকালে গৌরাঙ্গাবতার, তাহার সন্দেহ নাই। হ্যাট তোমার সেই গোপবেশের চূড়া ; পেণ্টলুন সেই ধড়া—আর হুইপ্ সেই মোহন মুরলী—অতএব হে গোপীবল্লভ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৪ ॥

হে বরদ! আমাকে বর দাও। আমি শাম্‌লা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরি দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৫ ॥

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোশামোদ করিব, তোমার প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৬ ॥

হে মানদ! আমায় টাইটল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও ;—আমাকে তোমার প্রসাদ দাও—আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৭ ॥

হে ভক্তবৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি—তোমার করস্পর্শে লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি,—তোমার স্বহস্তলিখিত দুই একখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্দ্ধা করি—অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৮ ॥

হে অন্তর্যামিন্! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি ; তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া আমি পরোপকার করি, তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি। ১৯ ॥

আমি তোমার ইচ্ছামতে ডিস্পেন্সরি করিব ; তোমার প্রীত্যর্থ স্কুল করিব ; তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব ; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২০ ॥

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত, তাহাই আমি করিব। আমি বুট পাণ্টলুন পরিব, নাকে চসমা দিব, কাঁটা চাম্‌চে ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২১ ॥

হে মিষ্টভাষিন্! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব ; পৈতৃক ধর্ম্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বন করিব ; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব ; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও! আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২২ ॥

হে সুভোজক! আমি ভাত ছাড়িয়াছি, পাঁউরুটি খাই ; নিষিদ্ধ মাংস নহিলে আমার ভোজন হয় না ; কুক্কুট আমার জলপান। অতএব হে ইংরাজ! আমাকে চরণে রাখিও, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৩ ॥

আমি বিধবার বিবাহ দিব ; কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব—কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৪ ॥

হে সর্ব্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও ;—আমার সর্ব্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৫ ॥

যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে আট্‌হোমে নিমন্ত্রণ কর ; বড় বড়

কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস কর, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। ২৬॥

আমার স্পীচ্ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও,—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি। ২৭॥

হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি। ২৮॥

বাবু

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চস্‌মাঅলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্, যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দর্শেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম;—হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু;—চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু; যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জ্জন করিবেন, উপার্জ্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট "বাবু" অর্থে কেরাণী বা বাজার-সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকটে "বাবু" শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট "বাবু" অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্, কেবল বাবুজন্ম-নির্ব্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন; কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন, তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—"তামাকু" এবং "চুরুট" নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইঁহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন।

এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইঁহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি "মদন আগুন" এবং "মনাগুন" রূপে পরিণত হইবেন। বারবিলাসিনীদিগের মতে ইঁহাদিগের কপালেও অগ্নিদেব বিরাজ করিবেন। বায়ুকেই ইঁহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্য্যের নাম রাখিবেন, "বায়ুসেবন"। চন্দ্র ইঁহাদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষ রাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য্য ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমারদিগকে ইঁহারা পূজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে "আস্তাবল"।

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি বারযোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত বিবেচনা করিবেন, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন, তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড় ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপ-গৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন, এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু। যিনি মহাদেবের তুল্য মাদকপ্রিয়, ব্রহ্মার তুল্য প্রজাসিসৃক্ষু, এবং বিষ্ণুর তুল্য লীলা-পটু, তিনিই বাবু। হে কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায়, ইঁহাদের লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারাও অনন্তশয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা, কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিতবলপরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র, ষ্টেশান মাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক্ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকিল অবতারে বধ্য মোয়াক্কল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সম্বাদপত্র এবং তীর্থ "ন্যাশানেল থিয়েটার", তিনিই বাবু। যিনি মিসনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি

খান, এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনি বাবু।

হে নরনাথ। যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

গর্দ্দভ

হে গর্দ্দভ! আমার প্রদত্ত, এই নবীন তৃণ সকল ভোজন করুন।১

আমি বহুযত্নে, গোবৎসাদির অগম্য প্রান্তর সকল হইতে নবজলকণানিষেকসুরভি তৃণাগ্রভাগ সকল আহরণ করিয়া আনিয়াছি, আপনি সুন্দর বদনমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া, মুক্তানিন্দিত দন্তে ছেদনপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাবান্ হউন।

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে; কেন না, আপনাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।

আমি পূজ্য ব্যক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা দেশে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, আপনি সর্ব্বত্রই বসিয়া আছেন, সকলেই আপনার পূজা করিতেছে। অতএব হে দীর্ঘকর্ণ! আমারও পূজা গ্রহণ করুন।

হে গর্দ্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র। যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া, স্তাবকগণে পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া, মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তাহার অগাধ গহ্বর দেখিতে পাইয়া, উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস তন্মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণতৃপ্তিসুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক।

হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আর্দ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে রামের সর্ব্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্ব্বস্ব কানাইকে দাও; তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি, তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপনপূর্ব্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া, সরস্বতীমণ্ডপমধ্যে বঙ্গীয় বালকগণকে গর্দ্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দ্দভলোকে প্রবেশ করিলে, "প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইল" বলিয়া, মহা গর্জ্জন করিয়া থাক। শুনিয়া আমরা ভয় পাই।

হে প্রকাণ্ডোদর! তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈলনিষিক্ত ললাটপ্রান্তরে চন্দনে নদী অঙ্কিত করিয়া, তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তোমারই প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা—তুমি নহিলে আর কাহারও প্রতি কমলার দয়া হয় না। তিনি তোমাকে কখনও ত্যাগ করেন না, কিন্তু তুমি তাঁহাকে বুদ্ধির গুণে সর্ব্বদাই ত্যাগ করিয়া থাক। এই জন্যই লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য কলঙ্ক। অতএব হে সুপুচ্ছ! তৃণ ভোজন কর।

তুমিই গায়ক। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারিবে কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেনরাজা ছিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?

তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুর সকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোবার গাঁটরি বহ। হে লোমশ! কোন্‌টি গুরুভার, আমায় বলিয়া দাও।

তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও; হে লোমশ! কোন্‌টি সুভক্ষ্য, অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।

হে সুন্দর! তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি। তুমি যখন গাছতলায় দাঁড়াইয়া, নববর্ষাসারসিক্ত হইতে থাক, দুই মহাকর্ণ ঊর্দ্ধোত্থিত করিয়া মুখচন্দ্র বিনত করিয়া, চক্ষু দুটি ক্ষণে মুদিত, ক্ষণে উন্মেষিত করিতে করিতে ভিজিতে থাক,—তোমার পৃষ্ঠে, মুণ্ডে এবং স্কন্ধে বসুধারা বহিতে থাকে—তখন তোমাকে আমি বড় সুন্দর দেখি। হে লোকমনোমোহন! কিছু ঘাস খাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান্; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশোগান করিতেছি; ঘাস খাইয়া সুখী কর।

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

আমরা স্ত্রীজাতি, নিরীহ ভালমানুষ বলিয়া আজি কালি আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার হইতেছে। পুরুষের এক্ষণে বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, ভর্ত্তৃগণ স্ত্রীকে আর মানে না, স্ত্রীলোকদিগের পুরাতন স্বত্ব সকল লুপ্ত হইতেছে, কেহই আর স্ত্রীর আজ্ঞার বশবর্ত্তী নহে। এই সকল বিষয়ের সুনিয়ম করিবার জন্য আমরা স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত করিয়াছি। সে সভার পরিচয় যদি সাধারণে সবিশেষ অবগত না থাকেন, তবে তাহার বিজ্ঞাপনী পশ্চাৎ প্রকাশ করিব। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ সভা হইতে একটি বিশেষ সদুপায় হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে আবেদনপত্র প্রেরণ

করিয়াছি। এবং তৎসমভিব্যাহারে ভর্তৃশাসনার্থ একটি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছি।

সকলের স্বত্ব রক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাস হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করিবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম। অনেক বাবুলোক বাঙ্গালাতে আইন ভাল বুঝিতে পারেন না, বিশেষতঃ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ সচরাচর ভাল হয় না, এবং আইন আদৌ ইংরাজিতেই প্রণীত হইয়াছিল, এবং ইহার বাঙ্গালা অনুবাদটি ভাল হয় নাই, স্থানে স্থানে ইংরাজির সঙ্গে ইহার প্রভেদ আছে, অতএব আমরা ইংরাজি বাঙ্গালা দুই পাঠাইলাম। ভরসা করি, বঙ্গদর্শনকারক একবার আমাদিগের অনুরোধে ইংরাজির প্রতি বিরাগ ত্যাগ করিয়া ইংরাজিসমেত এই আইন প্রচার করিবেন। সকলেই দেখিবেন যে, এই আইনটিতে নূতন কিছু নাই; সাবেক Lex Non Scripta কেবল লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসী।
স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভার সম্পাদিকা।

THE MATRIMONIAL PENAL CODE

CHAPTER I

Introduction

Whereas it is expedient to provide a special Penal Code for the coercion of refractory husbands and others who dispute the supreme authority of Woman, it is hereby enacted as follows :

1. This Act shall be entitled the "Matrimonial Penal Code" and shall take effect on all natives of India in the married state.

CHAPTER II

Definitions

2. A husband is a piece of moving and moveable property at the absolute disposal of a woman.

Illustrations

(a) A trunk or a workbox is not a husband, as it is not a moving, though a moveable piece of property.

দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

প্র থ ম অ ধ্যা য়

স্ত্রীদিগের অবাধ্য স্বামী প্রভৃতির সুশাসনের জন্য এক বিশেষ আইন করা উচিত, এই কারণ নিম্নে লিখিতমত আইন করা গেল।

১ ধারা। এই আইন "দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন" নামে খ্যাত হইবে। ভারতবর্ষীয় যে কোন দেশী বিবাহিত পুরুষের উপর ইহার বিধান খাটিবে।

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

সাধারণ ব্যাখ্যা

২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।

(ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

(b) Cattle are not husbands, for though capable of locomotion, they cannot be at the absolute disposal of any woman, as they often display a will of their own.

(c) Men in the married state, having no will of their own, are husbands.

3. A wife is a woman having the right of property in a husband.

Explanation

The right of property includes the right of flagellation.

4. "The married state" is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.

CHAPTER III

Of Punishments

5. The punishments to which offenders are liable under the provisions of this Code are :

First, Imprisonment.

Which may be either within the four walls of a bed-room, or within the four walls of a house.

Imprisonment is of two descriptions, namely,

(1) Rigorous, that is, accompanied by hard words.

(2) Simple.

Secondly, Transportation, that is to another bed-room.

Thirdly, Matrimonial servitude.

Fourthly, Forfeiture of Pocket-money.

6. "Capital punishment" under this Code, means that the wife shall run away to her paternal roof, or to some other friendly house, with the intention of not returning in a hurry.

7. The following punishments are also provided for minor offences.

First, Contemptuous silence on the part of the wife.

Secondly, Frowns.

Thirdly, Tears and lamentation.

Fourthly, Scolding and abuse.

(খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

(গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাঁহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

অর্থের কথা

সম্পত্তি বলিয়া যাহার উপর স্বত্বাধিকার থাকে, তাহাকে মারপিট করিবারও স্বত্বাধিকার থাকিবে।

৪ ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে।

তৃতীয় অধ্যায়

দণ্ডের কথা

৫ ধারা। এই আইনের বিধানমতে অপরাধীদিগের নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। কয়েদ।

অর্থাৎ শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ, অথবা বাটীর চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ।

কয়েদ দুই প্রকার।

(১) কঠিন তিরস্কারের সহিত।

(২) বিনা তিরস্কার।

দ্বিতীয়। শয্যান্তর প্রেরণ বা শয্যা স্থানান্তর প্রেরণ।

তৃতীয়। পত্নীর দাসত্ব।

চতুর্থ। সম্পত্তিদণ্ড, অর্থাৎ নিজখরচের টাকা বন্ধ।

৬ ধারা। এই আইনে "প্রাণদণ্ড" অর্থে বুঝাইবে যে, স্ত্রী বাপের বাড়ী, কি ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া যাইবেন, শীঘ্র আসিতে চাহিবেন না।

৭ ধারা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য নিম্নলিখিত দণ্ড হইতে পারে।

প্রথম। মান।

দ্বিতীয়। ভ্রূকুটী।

তৃতীয়। অশ্রুবর্ষণ বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

চতুর্থ। গালি ও তিরস্কার।

CHAPTER IV
General Exceptions

8. Nothing is an offence which is done by a wife.

9. Nothing is an offence which is done by a husband in obedience to the commands of a wife.

10. No person in the married state shall be entitled to plead any other circumstances as grounds of exemption from the provisions of the Matrimonial Penal Code.

CHAPTER V
Of Abetment

11. A person abets the doing of a matrimonial offence who

First, Instigates, persuades, induces, or encourages a husband to commit that offence.

Secondly, Joins him in the commission of that offence, or keeps him company during its commission.

Explanation

A man not in the married state or even a woman, may be an abettor.

Illustrations

(a) A the husband of B, and C, an unmarried man, drink together. Drinking is a matrimonial offence. C has abetted A.

(b) A the mother of B, the husband of C, persuades B to spend money in other ways than those which C approves.

As spending money in such ways is a matrimonial offence, A has abetted B.

12. When a man in the married state abets another man in the married state in a matrimonial offence, the abettor is liable to the same punishment as the principal. Provided that he can be so punished only by a competent court.

Explanation

A competent court means the wife having right of property in the offending husband.

13. Abettors who are females or male offenders not in the married state are liable to be punished only with scolding, abuse, frowns, tears and lamentations.

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ বর্জ্জিত কথা

৮ ধারা। স্ত্রীকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯ ধারা। স্ত্রীর আজ্ঞানুসারে স্বামিকৃত কোন ক্রিয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১০ ধারা। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ওজর করিয়া কোন বিবাহিত পুরুষ বলিতে পারিবেন না যে, আমি দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইনানুসারে দণ্ডনীয় নই।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধের সহায়তার বিধি

১১ ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

প্রথম। অন্য ব্যক্তিকে কোন দাম্পত্য অপরাধ করিতে প্রবৃত্তি দেয় বা উৎসাহিত বা উত্ত্যক্ত করে,

দ্বিতীয়। বা তৎসঙ্গে সেই অপরাধে লিপ্ত হয় বা সেই অপরাধ করার সময়ে তাহার সঙ্গে থাকে,

তবে বলা যায় যে, ঐ অপরাধের সহায়তা করিয়াছে।

অর্থের কথা

অবিবাহিত পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোকও দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিতে পারে।

উদাহরণ

(ক) রাম কামিনীর স্বামী। যদু অবিবাহিত পুরুষ। উভয়ে একত্রে মদ্যপান করিল। মদ্যপান একটি দাম্পত্য অপরাধ। যদু রামের সহায়তা করিয়াছে।

(খ) হরমণি, রামের মা। রাম কামিনীর স্বামী। কামিনী যেরূপে টাকা খরচ করিতে বলে, সেরূপে খরচ না করিয়া, রাম হরমণির পরামর্শে অন্য প্রকার খরচ করিল। স্ত্রীর অনভিমতে খরচ করা একটি দাম্পত্য অপরাধ। হরমণি তাহার সহায়তা করিয়াছে।

১২ ধারা। যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন দাম্পত্য অপরাধে অন্য বিবাহিত পুরুষের সহায়তা করে, তবে সে আসল অপরাধীর সঙ্গে সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু তাহার দণ্ড উপযুক্ত আদালত নহিলে হইবে না।

অর্থের কথা

ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রীর সম্পত্তি, সেই স্ত্রীকেই উপযুক্ত আদালত বলা যায়।

১৩ ধারা। স্ত্রীলোক বা অবিবাহিত পুরুষ দাম্পত্য অপরাধের সহায়তা করিলে, তিরস্কার, ভ্রূকুটী, এবং অশ্রুবর্ষণ ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় মাত্র।

CHAPTER VI

Of Offences Against The State

14. "The State" shall in this Code mean the married state only.

15. Whoever wages war against his wife or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished capitally, that is by separation, or by transportation to another bed-room and shall forfeit all his pocket-money.

16. Whoever induces friends or gains over children to side with him or otherwise prepares to wage war with the intention of waging war against the wife shall be punished by transportation to another bed-room and shall also be liable to be punished with scolding and with tears and lamentations.

17. Whoever shall render allegiance to any woman other than his wife shall be guilty of incontinence.

Explanation

(1) To show the slightest kindness to a young woman who is not the wife, is to render such young woman allegiance.

Illustration

A is the husband of B, and C is a young woman. A likes C's baby because he is a nice child and gives him buns to eat. A has rendered allegiance to C.

Explanation

(2) Wives shall be entitled to imagine offences under this section, and no husband shall be entitled to be acquitted on the ground that he has not committed the offence.

The simple accusation shall always be held to be conclusive proof of the offence.

Explanation

(3) The right of imagining offences under this section, shall be held to belong in general to old wives, and to women with old and ugly husbands ; and a young wife shall not be entitled to assume the right unless she can prove that she has a particularly cross temper, or was brought up a spoilt child or is herself supremely ugly.

18. Whoever is guilty of incontinence shall be liable to all the punishments mentioned in this Code and to other punishments not mentioned in the Code.

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্ত্রী-বিদ্রোহিতার অপরাধ

১৪ ধারা। (অনুবাদক অক্ষম)

১৫ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে, কি বিবাদ করিতে উদ্যোগ করে, কি বিবাদ করায় সহায়তা করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে (অর্থাৎ স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করিবেন) বা শয্যাগৃহ পৃথক্ হইবে এবং তাহার খরচের টাকা জব্দ হইবে।

১৬ ধারা। যে কেহ বন্ধুবর্গকে মুরব্বি ধরিয়া বা সন্তানদিগকে বশীভূত করিয়া বা অন্য প্রকারে স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাদের উদ্যোগ করে, সে শয্যা-গৃহান্তরে প্রেরিত হইবে, এবং তিরস্কার, অশ্রুবর্ষণ এবং রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

১৭ ধারা। যে কেহ আপন স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত, তাহার অপরাধের নাম লাম্পট্য।

অর্থের কথা

প্রথম। স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোন যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুমাত্র দয়া বা আনুকূল্য করিলেই লাম্পট্য গণ্য হইবে।

উদাহরণ

রাম কামিনীর স্বামী। বামা অন্য এক যুবতী। বামার শিশু সন্তানটি দেখিতে সুন্দর বলিয়া রাম তাহাকে আদর করে বা তাহার হাতে মিঠাই দেয়। রাম বামার প্রতি আসক্ত।

অর্থের কথা

দ্বিতীয়। স্বামীদিগকে নিষ্কারণে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করা, স্ত্রীলোক-দিগের অধিকার রহিল। আমি এ অপরাধ করি নাই বলিয়া কোন স্বামী খালাস পাইতে পারিবে না।

"অপরাধ করিয়াছে" বলিলেই এ অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

অর্থের কথা

তৃতীয়। নিষ্কারণে স্বামিগণকে এ অপরাধে অপরাধী বিবেচনা করিবার অধিকার, প্রাচীনা স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষরূপে বর্ত্তিবে, অথবা যাহাদিগের স্বামী কুৎসিত বা প্রাচীন, তাহাদিগের পক্ষে বর্ত্তিবে। যদি কোন যুবতী স্ত্রী এ অধিকার চাহেন, তবে তাঁহাকে অগ্রে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি নিজে বদমেজাজি বা আদুরে মেয়ে বা তিনি নিজে কদাকারা।

১৮ ধারা। যে কেহ লম্পট হইবে, সে এই আইনের লিখিত সকল প্রকার দণ্ডের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে এবং তাহার অন্য দণ্ডও হইতে পারিবে।

CHAPTER VII

Of Offences Relating to the Army and Navy

19. The army and navy shall in this Code mean the sons and the daughters and daughters-in-law.

20. Whoever abets the committing of mutiny by a son or a daughter or a daughter-in-law shall be liable to be punished by scolding and tears and lamentations.

CHAPTER VIII

Of Offences Against the Domestic Tranquility

21. An assembly of two or more husbands is designated an unlawful assembly if the common object of such husbands is,

First, To drink as defined below or to gamble or to commit any other matrimonial offence,

Secondly, To overawe by show of authority their wives from the exercise of the lawful authority of such wives,

Thirdly, To resist the execution of a wife's order.

22. Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished by imprisonment with hard words and shall also be liable to contemptuous silence or to scolding.

Of Drinking Wine and Spirits

23. Any liquid kept in a bottle and taken in a glass vessel is wine and spirits.

24. Whoever has in his possession wine and spirits as above defined is said to drink.

Explanation

He is said to drink even though he never touches the liquid himself.

25. Whoever is guilty of drinking shall be punished with imprisonment of either description within the four walls of a bed-room during the evening hours and shall also be liable to scolding.

Of Rioting

26. Whoever shall speak in an ungentle voice to his wife shall be guilty of domestic rioting.

27. Whoever is guilty of domestic rioting shall be punished by contemptuous silence or by scolding or by tears and lamentations.

সপ্তম অধ্যায়

পল্‌টন এবং নাবিকসেনা সম্বন্ধীয় অপরাধ

১৯ ধারা। এ আইনে পল্‌টন অর্থে ছেলের দল। নাবিকসেনা ঝি বউ।

২০ ধারা। যে স্বামী, পুত্র বা কন্যা বা বধূকর্তৃক গৃহিণীর প্রতি বিদ্রোহিতার সহায়তা করিবে, সে তিরস্কার ও রোদনের দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

গৃহমধ্যে শান্তিভঞ্জনের অপরাধ

২১ ধারা। দুই, কি তাহার অধিক বিবাহিত ব্যক্তির জনতা হইলে যদি জনতা-কারীদের নিম্নের লিখিত কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে "বে আইন জনতা" বলা যায়।

প্রথম। যদি মদ্যপান করা, কি অন্য প্রকার দাম্পত্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায় থাকে,

দ্বিতীয়। যদি আস্ফালন দ্বারা পত্নীদিগকে আইনমত ক্ষমতা প্রকাশ করণে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় প্রদর্শন করার অভিপ্রায় থাকে,

তৃতীয়। যদি কোন স্ত্রীর আজ্ঞামত কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবার অভিপ্রায় থাকে।

২২ ধারা। যে কেহ "বে আইন জনতার ব্যক্তি" হয়, সে কঠিন তিরস্কারের সহিত কয়েদ হইবে, অথবা মান অথবা তিরস্কারের সহিত দণ্ডনীয় হইবে।

মদ্যপানের কথা

২৩ ধারা। যে কোন জলবৎ দ্রব্য বোতলে থাকে, এবং কাচের পাত্রে পীত হয়, তাহা মদ্য।

২৪ ধারা। উক্তরূপ মদ্য যে ঘরে রাখে, সেই মদ্যপায়ী।

অর্থের কথা

সে ঐ দ্রব্য স্বহস্তে স্পর্শ না করিলেও মদ্যপায়ী।

২৫ ধারা। যে মদ্যপায়ী, সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শয্যাগৃহের চারি ভিত্তির মধ্যে কয়েদ থাকিবে, এবং তিরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

হাঙ্গামার কথা

২৬ ধারা। যে কেহ স্ত্রীর প্রতি কর্কশ স্বরে কথা কহে, সে হাঙ্গামা করে।

২৭ ধারা। যে কেহ গৃহমধ্যে হাঙ্গামা করিবে, তাহার সাজা মান বা তিরস্কার বা অশ্রুবর্ষণ ও রোদন।

বসন্ত এবং বিরহ

রামী। সখি, ঋতুরাজ বসন্ত আসিয়া ধরাতলে উদয় হইয়াছেন। আইস, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি। বিশেষ আমরা উভয়েই বিরহিণী; পূর্ব্বগামিনী বিরহিণীগণ চিরকাল বসন্তবর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন, আইস আমরাও তাই করি।

বামী। সই, ভাল বলিয়াছ। আমরা বালিকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া কেবল কুটনো কুটিয়া মরিলাম, আইস অদ্য কাব্যালোচনা করি।

রামী। সই! তবে আরম্ভ করি। সখি! ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইয়াছে। দেখ, পৃথিবী কেমন অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছেন। দেখ, চূতলতা কেমন নব মুকুলিত—

বামী। বৃক্ষে বৃক্ষে শজিনা খাড়া বিলম্বিত—

রামী। মলয় মারুত মৃদু মৃদু প্রধাবিত—

বামী। তদ্বাহিত ধূলায় দন্ত কিচ্‌কিচিত।

রামী। দূর ছুঁড়ী—ও কি! শোন্‌। ভ্রমরগণ পুষ্পের উপর গুণ গুণ করিতেছে—

বামী। মাছিগণ ভাতের উপর ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে—

রামী। বৃক্ষোপরে কোকিলগণ পঞ্চমস্বরে কুহু কুহু করিতেছে—

বামী। গাজনতলায় ঢাকিগণ অষ্টমস্বরে চড় চড় করিতেছে।

রামী। না ভাই, তোকে নিয়ে বসন্ত বর্ণনা হয় না। আমি শ্যামীকে ডাকি। আয় সই শ্যামি, আমরা বসন্ত বর্ণনা করি।

(শ্যামী আসিল)

শ্যামী। আমি ত সখি তোমাদের মত ভাল লেখা পড়া জানি না; একটু একটু জানি মাত্র, আমি সকল বুঝিতে পারিব না—আমাকে মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হবে।

রামী। আচ্ছা! দেখ সখি, বসন্ত কি অপূর্ব্ব সময়! কেমন চূতলতা সকল নব মুকুলিত—

শ্যামী। সই, আঁবের গাছই দেখিয়াছি, আঁবের লতা কোন্‌গুলা?

রামী। আঁবের লতা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু কখন চক্ষে দেখি নাই। দেখি না দেখি, চূতলতা ভিন্ন চূতবৃক্ষ কখন পড়ি নাই। তবে চূতলতাই বলিতে হইবে, চূতবৃক্ষ বলা হইবে না।

শ্যামী। তবে বল।

রামী। চূতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া—

শ্যামী। সই! এই বলিলে চূতলতা—আবার লতিকা হইল কেন?

রামী। আরও কিছু মিষ্ট হইল। চূতলতিকা নব মুকুলিত হইয়া চারিদিকে সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে—

বামী। ভাই, আঁবের বোল যে বসন্তকালে চুঁইয়ে গিয়া কড়েয়া ধরে।

শ্যামী। বলিলে কি হয়, কেমন মিষ্ট হইল দেখ দেখি।

রামী। তাহাতে ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে, শুনিয়া আমাদিগের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। আহা! সখি, সত্যই বলিয়াছ। সই, ভ্রমর কাকে বলে?

রামী। মর্ নেকি, তাও জানিস্‌নে। ভ্রমর বলে ভোম্‌রাকে।

শ্যামী। ভোম্‌রা কোন্‌গুলো ভাই?

রামী। ভোম্‌রা বলে ভিম্‌রুলকে।

শ্যামী। তা ভাই ভিম্‌রুল আঁবের বোল দেখে পাগল হয় কেন? ভিম্‌রুলের পাগলামি কেমনতর? ওরা কি আবোল তাবোল বকে?

রামী। কে বলেছে পাগল হয়?

শ্যামী। ঐ যে তুমি বলিলে "উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে।"

রামী। কোন্ শালী আর তোদের কাছে বসন্ত বর্ণনা করিবে!

শ্যামী। ভাই, রাগ কর কেন? তুমি বেশী লেখা পড়া শিখেছ, আমি কম শিখেছি—আমায় বুঝাইয়া দিলেই ত হয়। সকলেই কি তোমার মত রসিকে?

রামী। (সাহঙ্কারে) আচ্ছা, তবে শোন্। ভ্রমরগণ মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া ঝঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগের গুণ্ গুণ্ রবে আমাদের প্রাণ বাহির হইতেছে।

শ্যামী। সই, ভোম্‌রার ডাক "গুণ্ গুণ্" না "ভোঁ ভোঁ"?

রামী। কবিরা বলেন, "গুণ্ গুণ্"।

শ্যামী। তবে গুণ্ গুণ্ই বটে। তা উহাতে আমাদের প্রাণ বাহির হয় কেন? ভিম্‌রুল কামড়াইলে প্রাণ বাহির হয় জানি, কিন্তু ভিম্‌রুল ডাকিলেও কি মরিতে হইবে?

রামী। এ পর্যন্ত সকল বিরহিণীগণ গুণ্ গুণ্ রবে মরিয়া আসিতেছে, তুই কি পীর যে মর্‌বি না?

বামী। আচ্ছা ভাই, শাস্ত্রে যদি লেখে ত না হয় মরিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেবল কি ভিম্‌রুলের ডাকে মরিতে হইবে, না বোলতা মৌমাছি গুব্‌রে পোকার ডাক শুনিলেও অন্তর্জলে শুইব?

রামী। কবিরা শুধু ভ্রমরের রবেই মরিতে বলেন।

বামী। কবিদের বড় অবিচার। কেন, গুব্‌রে পোকা কি অপরাধ করেছে?

রামী। তোর মর্‌তে হয় মরিস্, এখন শোন্।

বামী। বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে।

শ্যামী। পঞ্চম স্বর কি ভাই?

রামী। কোকিলের স্বরের মত।

শ্যামী। আর কোকিলের স্বর কেমন?

রামী। পঞ্চম স্বরের মত।

শ্যামী। বুঝিয়াছি। তার পর বল।

রামী। কোকিলগণ বৃক্ষে বসিয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর অঙ্গ জ্বর জ্বর হইতেছে।

বামী। আর কুঁক্‌ড়োর পঞ্চম স্বরে অঙ্গ কেমন করে?

রামী। মরণ আর কি, কুঁকুড়োর আবার পঞ্চম স্বর কি লো?

বামী। আমার তাতেই অঙ্গ জ্বর জ্বর হয়। কুঁকূড়া ডাকিলেই মনে হয় যে, তিনি বাড়ী এলেই আমায় ঐ সর্ব্বনেশে পাখী রাঁধিয়া দিতে হবে।

রামী। তার পর মলয় সমীরণ। মৃদু মৃদু মলয় সমীরণে বিরহিণী শিহরিয়া উঠিতেছে।

শ্যামী। শীতে ?

রামী। না—বিরহে। মলয় সমীরণ অন্যের পক্ষে শীতল, কিন্তু আমাদিগের পক্ষে অগ্নিতুল্য।

বামী। সই, তা সকলেব পক্ষেই। এই চৈত্র মাসের দুপুরে রৌদ্রের বাতাস আগুনের হল্কা বলিয়া কাহার বোধ হয় না ?

রামী। ও লো, আমি সে বাতাসের কথা বলিতেছি না।

শ্যামী। বোধ হয়, তুমি উত্তুরে বাতাসের কথা বলিতেছ। উত্তুরে বাতাস যেমন ঠাণ্ডা, মলয় বাতাস তেমন নয়।

রামী। বসন্তানিলস্পর্শে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

বামী। গায়ে কাপড না থাকিলে উত্তুরে বাতাসেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

রামী। মব্ ছুঁড়ী, বসন্তকালে কি উত্তুরে বাতাস বয় যে, আমি বসন্তবর্ণনায় উত্তুরে বাতাসের কথা বলিব ?

বামী। উত্তুরে বাতাসই এখন বয়। দেখ, এখনকার যত ঝড, সব উত্তুরে। আমার বোধ হয়, বসন্তবর্ণনে উত্তুরে বাতাসের প্রসঙ্গ করাই উচিত। আইস, আমরা বঙ্গদর্শনে লিখিয়া পাঠাই যে, ভবিষ্যতে কবিগণ বসন্তবর্ণনে মলয় বাতাস ত্যাগ করিয়া উত্তুরে ঝড়ের বর্ণনা করেন।

রামী। তাহা হইলে বিরহীদের কি উপায় হইবে ? তাহারা কি লইয়া কাঁদিবে ?

শ্যামী। সখি, তবে থাক। এক্ষণে তোমার বসন্তবর্ণনা—উহুঃ উহুঃ সখি! মোলেম মোলেম, গেলেম রে! গেলেম রে! [ভূমে পতন, চক্ষু মুদিত]

রামী। কেন, কেন, সই, কি হয়েছে ? হঠাৎ অমন হলে কেন ?

শ্যামী। (চক্ষু বুজিয়া) ঐ শুনিলে না ? ঐ সেওড়া গাছে কোকিল ডাকিতেছে।

রামী। সখি, আশ্বস্তা হও, আশ্বস্তা হও, তোমার প্রাণকান্ত শীঘ্রই আসিবেন। সই, আমারও ঐরূপ যন্ত্রণা হইতেছে। নাথের সন্দর্শন ভিন্ন আমার বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছে। (চক্ষু মুছিয়া) পাড়ার সকল পুকুরের যদি জল না শুকাইত, তবে এত দিন ডুবিয়া মরিতাম। হে হৃদয়বল্লভ, জীবিতেশ্বর! হে রমণীজনমনোমোহন! হে নিশাশেষোন্মেষোন্মুখকমলকোরকোপমোত্তেজিতহৃদয়সূর্য্য! হে অতলজলদলতলন্যস্তরত্নরাজিবন্মহামূল্যপুরুষরত্ন! হে কামিনীকণ্ঠবিলম্বিতরত্নহারাধিক প্রাণাধিক! আর প্রাণ বাঁচে না। আমি অবলা, সরলা, চঞ্চলা, বিকলা, দীনা, হীনা, ক্ষীণা, পীনা, নবীনা, শ্রীহীনা,—আর প্রাণ বাঁচে না। আর কত দিন তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকিব ? যেমন সরোবরে সরোজিনী ভানুর আশা করে, যেমন কুমুদিনী কুমুদবান্ধবের আশা করিয়া থাকে, যেমন চাতক মেঘের জলের আশা করিয়া থাকে—আমি তেমনি তোমার আশা করিতেছি।

শ্যামী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) যেমন রাখাল, হারাণ গোরুর আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন বালকে ময়রার দোকান হইতে লোক ফিরিবার আশায় দাঁড়াইয়া থাকে, যেমন অশ্ব তৃণাহরক গ্রাসকটের আশা করিয়া থাকে, হে প্রাণবন্ধো! আমি তেমনি তোমার আশা করিয়া আছি। যেমন মাছ ধুইতে গেলে পরিচারিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মার্জ্জার গমন করে, তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার মন গিয়াছে। যেমন উচ্ছিষ্টাবশেষ ফেলিতে গেলে, বুভুক্ষু কুক্কুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, আমার অবশ চিত্ত তেমনি তোমার পশ্চাৎ গিয়াছে। যেমন কলুর ঘানিগাছে প্রকাণ্ডাকার বলদ ঘুরিতে থাকে, তেমনি আশা নামে আমার প্রকাণ্ড বলদ, তোমার প্রণয়রূপ ঘানিগাছে ঘুরিতেছে। যেমন লোহার চাটুতে তপ্ত তৈলে কৈমাছ ভাজে, তেমনি এই বিরহচাটুতে বসন্তরূপ তপ্ত তৈলে আমার হৃদয়রূপ কৈমাছকে অহরহ ভাজিতেছে। যেমন এই বসন্তকালের তাপে শজিনা খাড়া ফাটিতেছে, তোমার বিরহসন্তাপে তেমনি আমার হৃদয়-খাড়া ফাটিতেছে। যেমন এক লাঙ্গলে যোড়া গোরু যুড়িয়া ক্ষেত্রকে চাসা ক্ষতবিক্ষত করে, তেমনি এক প্রেমলাঙ্গলে বিরহ এবং বারস্ত্রীভক্তিরূপ যোড়া গোরু যুড়িয়া আমার স্বামী-চাসা আমার হৃদয়ক্ষেত্রকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছেন। কথায় আর কি বলিব। বিরহের জ্বালায় আমার ডালে নুণ হয় না, পানে চূণ হয় না, ঝোলে ঝাল হয় না, ক্ষীরে মিষ্ট হয় না। সখি, বিরহের দুঃখ যে দিন মনে হয়, সে দিন আমি তিন বেলা বই খাইতে পারি না; আমার দুধের বাটি অম্‌নি পড়িয়া থাকে। (চক্ষু মুছিয়া) সখি, তোমার বসন্তবর্ণনা সমাপ্ত কর, দুঃখের কথায় আর কাজ নাই।

রামী। আমার বসন্তবর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ, এই চারিটির কথাই বলিয়াছি, আর বাকি কি?

বামী। দড়ি আর কলসী।

সুবর্ণগোলক

কৈলাসশিখরে, নবমুকুলশোভিত দেবদারুতলায় শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে বসিয়া হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছিলেন। বাজি একটি স্বর্ণগোলক। মহাদেবের খেলায় দোষ এই—আড়ি মারিতে পারেন না—তাহা পারিলে সমুদ্রমন্থনের সময়ে বিষের ভাগটা তাঁহার ঘাড়ে পড়িত না। গৌরী আড়ি মারিতে পটু—প্রমাণ, পৃথিবীতে তাঁহার তিন দিন পূজা। আর খেলায় যত হউক না হউক, কান্নাইয়ে অদ্বিতীয়া, কেন না, তিনিই আদ্যাশক্তি। মহাদেবের ভাল দান পড়িলে কাঁদিয়া হাট বাধান—আপনার যদি পড়ে পাঁচ দুই সাত, তবে হাঁকেন পোয়া বারো। হাঁকিয়া তিন চক্ষে মহাদেবের প্রতি কটাক্ষ করেন—যে কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, তাহার গুণে মহাদেব দান দেখিয়াও দেখিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, দেবাদিদেবের হার হইল। ইহাই রীতি।

তখন মহাদেব পার্ব্বতীকে স্বীকৃত কাঞ্চনগোলক প্রদান করিলেন। উমা তাহা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। দেখিয়া, পঞ্চানন ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন, "আমার প্রদত্ত গোলক ত্যাগ করিলে কেন?"

উমা কহিলেন, "প্রভো, আপনার প্রদত্ত গোলক অবশ্য কোন অপূর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনুষ্যের হিতার্থে তাহা প্রেরণ করিয়াছি।"

গিরিশ বলিলেন, "ভদ্রে! প্রজাপতি, বিষ্ণু, এবং আমি, এই তিন জনে যে সকল নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেছি, তাহার ব্যতিক্রমে কখন মঙ্গল হয় না। যে মঙ্গল হইবার তাহা সেই সকল নিয়মাবলির বলেই ঘটিবে। কাঞ্চনগোলকের প্রয়োজন নাই। যদি, ইহার কোন মঙ্গলপ্রদ গুণ হয়, তবে নিয়মভঙ্গদোষে লোকের অনিষ্ট হইবে। তবে তোমার অনুরোধে উহাকে একটি বিশেষ গুণযুক্ত করিলাম। বসিয়া উহার কার্য্য দর্শন কর।

কালীকান্ত বসু বড় বাবু। বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, দেখিতে সুন্দর পুরুষ, কয় বৎসর হইল, পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী কামসুন্দরীর বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। তাঁহার পত্নী তাহার পিতৃভবনে ছিল। কালীকান্তবাবু স্ত্রীর সম্ভাষণে শ্বশুর-বাড়ী যাইতেছিলেন। শ্বশুর বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি—গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রামে বাস। কালীকান্ত ঘাটে নৌকা লাগাইয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন, সঙ্গে রামা চাকর একটা পোর্টমাণ্টো বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে কালীকান্তবাবু দেখিলেন, একটি স্বর্ণগোলক পড়িয়া আছে। বিস্মিত হইয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন। দেখিলেন, সুবর্ণ বটে। প্রীত হইয়া তাহা ভৃত্য রামাকে রাখিতে দিলেন; বলিলেন, "এটা সোণার দেখিতেছি। কেহ হারাইয়া থাকিবে। কেহ খোঁজ করে, বাহির করিয়া দিব। নহিলে বাড়ী লইয়া যাইব। এখন রাখ।"

রামা বস্ত্রমধ্যে গোলকটি লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে, পথে পোর্টমাণ্টো নামাইল; পরে কালীকান্তবাবুর হস্ত হইতে গোলকটি গ্রহণ করিয়া বস্ত্রমধ্যে লুকাইল।

কিন্তু রামা আর পোর্টমাণ্টো মাথায় তুলিল না। কালীকান্তবাবু স্বয়ং তাহা উঠাইয়া মাথায় করিলেন। রামা অগ্রসর হইয়া চলিল, বাবু মোট মাথায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন রামা বলিল, "ওরে রামা।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞা?"

রামা বলিল, "তুই বড় বেআদব, দেখিস্ যেন আমার শ্বশুরবাড়ী গিয়া বেআদবি করিস্ না। তাহারা ভদ্রলোক।"

বাবু বলিলেন, "আজ্ঞে তা কি পারি? আপনি হচ্ছেন মুনিব—আপনার কাছে কি বেআদবি করিতে পারি?"

কৈলাসে গৌরী বলিলেন, "প্রভো, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার স্বর্ণগোলকের কি গুন এ?"

মহাদেব বলিলেন, "গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। আমি যদি নন্দীর হাতে এই গোলক দিই, তবে নন্দী ভাবিবে, আমি মহাদেব, আমাকে ভাবিবে নন্দী; আমি ভাবিব, আমি নন্দী, নন্দীকে ভাবিব মহাদেব। রামা ভাবিতেছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবিতেছে, এ রামা চাকর। কালীকান্ত ভাবিতেছে, আমি রামা খানসামা, রামাকে ভাবিতেছে, কালীকান্তবাবু।"

কালীকান্তবাবু যখন শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর অন্তঃপুরে। কিন্তু

বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠিল। দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বলিতেছে, "আরে ও খানসামাজি, তোম হুঁয়া মৎ বইঠিও—তোম হামারা পাশ আও।" শুনিয়া রামা গরম হইয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিতেছে, "যা বেটা মেড়ুয়াবাদী যা—তোর আপনার কাজ করগে।"

দ্বারবান্ পোর্টমাণ্টো নামাইয়া নিল। কালীকান্ত বলিল, "দরওয়ানজি, বাবুকে অমন করিয়া অপমান করিও না। উনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

দ্বারবান্ জামাইবাবুকে চিনিত, খানসামাকে চিনিত না। কালীকান্তের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিল, যেখানে জামাইবাবুই ইহাকে বাবু বলিতেছেন, সেখানে ইনি কোন ছদ্মবেশী বড় লোক হইবেন। দ্বারবান্ তখন ভক্তিভাবে রামাকে যুক্তকরে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, "গোলামকি কসুর মাপ কিজিয়ে!" রামা কহিল, "আচ্ছা, তামাকু ভেজ দেও!"

শ্বশুরবাড়ীর খানসামা উদ্ধব, অতি প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য। সেই বাঁধা হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিল। রামা, তাকিয়ায় হেলান দিয়া তামাকু খাইতে লাগিল। কালীকান্ত চাকরদের ঘরে গিয়া, কলিকায় তামাকু খাইতে লাগিল। উদ্ধব বিস্মিত হইয়া কহিল, "দাদা ঠাকুর, এ কি এ?" কালীকান্ত কহিল, "ওঁর সাক্ষাতে কি তামাকু খাইতে পারি?"

উদ্ধব গিয়া অন্তঃপুরে কর্ত্তাকে সংবাদ দিল, "জামাইবাবু আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কে ছদ্মবেশী মহাশয় এসেছেন—জামাইবাবু তাঁকে বড় মানেন, তাঁর সাক্ষাতে তামাকু পর্য্যন্ত খান না।"

কর্ত্তা নীলরতনবাবু শীঘ্র বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কালীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে একটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সরিয়া গেল। রামা আসিয়া নীলরতনের পায়ের ধুলা লইয়া কোলাকুলি করিল। নীলরতন ভাবিল, "সঙ্গের লোকটা সভ্যভব্য বটে—তবে জামাই বাবাজিকে কেমন কেমন দেখিতেছি।"

নীলরতনবাবু রামাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে অন্তঃপুর হইতে জলযোগের স্থান হইয়াছে বলিয়া পরিচারিকা কালীকান্তকে ডাকিতে আসিল। কালীকান্ত বলিল, "বাপ রে, আমি কি বাবুর আগে জল খেতে পারি! আগে বাবুকে জল খাওয়াও। তার পর আমার হবে এখন। আমি, মাঠাকুরুণ, আপনাদের খাচ্চিই ত।"

"মাঠাকুরুণ" শুনিয়া পরিচারিকা মনে করিল, "জামাইবাবু আমাকে একজন শাশুড়ী টাশুড়ী মনে করিয়াছেন—না করবেন কেন; আমাকে ভাল মানুষের মেয়ে বই ত আর ছোট লোকের মেয়ের মত দেখায় না। ওঁরা দশটা দেখেছেন—মানুষ চিন্‌তে পারেন—কেবল এই বাড়ীর পোড়া লোকেই মানুষ চেনে না।" অতএব বিন্দী চাকরাণী জামাই-বাবুর উপর বড় খুসী হইয়া অন্তঃপুরে গিয়া বলিল, "জামাইবাবুর বিবেচনা ভাল—সঙ্গের মানুষটি না খেলে কি তিনি খেতে পারেন—তা আগে তাঁকে জল খাওয়াও, তবে জামাই খাবেন।"

বাড়ীর গৃহিণী মনে ভাবিলেন, "সে উপরি লোক, তাহাকে বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান হইতে পারে না। জামাইকেও বাহিরে খাওয়ান হইতে পারে না। তা,

তার যায়গা হউক বাহিরে, আর জামাইয়ের যায়গা হউক ভিতরে।" গৃহিণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। রামা বাহিরে জলযোগের উদ্যোগ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইল, ভাবিল, "এ কি অলৌকিকতা?" এদিকে দাসী কালীকান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল। ঘরের ভিতর স্থান হইয়াছে, কিন্তু কালীকান্ত উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ঘরের ভিতর কেন? আমাকে এইখানে হাতে দুটো ছোলা গুড় দাও, খেয়ে একটু জল খাই।" শুনিয়া শালীরা বলিল, "বোসজা মশাই যে, এবার অনেক রকম রসিকতা শিখে এয়েছ দেখতে পাই।" কালীকান্ত কাতর হইয়া বলিল, "আজ্ঞে, আমাকে ঠাট্টা করেন কেন, আমি কি আপনাদের তামাসার যোগ্য?" একজন প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি বলিল, "আমাদের তামাসার যোগ্য কেন?—যার তামাসার যোগ্য, তার কাছে চল।" এই বলিয়া কালীকান্তের হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া আসিল।

সেখানে কালীকান্তের ভার্য্যা কামসুন্দরী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীকান্ত তাহাকে দেখিয়া প্রভুপত্নী মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কামসুন্দরী দেখিয়া চন্দ্রবদনে মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "ওকি ও রঙ্গ—এ আবার কোন্ ঠাট শিখিয়া আসিয়াছ?" শুনিয়া কালীকান্ত কাতর হইয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমার সঙ্গে অমন সব কথা কেন—আমি আপনার চাকর—আপনি মুনিব!"

রসিকা কামসুন্দরী বলিল, "তুমি চাকর, আমি মুনিব, সে আজ না কাল? যত দিন আমার বয়স আছে, তত দিন এই সম্পর্কই থাকিবে। এখন জল খাও।"

কালীকান্ত মনে করিল, "বাবা, এঁর কথার ভাব যে কেমন কেমন। আমাদের বাবু যে একটা গেছো মেয়ের হাতে পড়েছেন দেখতে পাই। তা আমার সরাই ভাল।" এই ভাবিয়া কালীকান্ত পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, দেখিয়া কামসুন্দরী আসিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র ধরিল; বলিল, "ওরে আমার সোণার চাঁদ! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! আমার কাছ থেকে আর পলাতে হয় না।" এই বলিয়া কামসুন্দরী স্বামীকে আসনের দিকে টানিতে লাগিল।

কালীকান্ত আন্তরিক কাতরতার সহিত হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই বৌঠাকুরাণি, আপনার সাত দোহাই—আমাকে ছাড়িয়া দিন—আপনি আমার স্বভাব জানেন না—আমি সে চরিত্রের লোক নই।" কামসুন্দরী হাসিয়া বলিল, "তুমি যে চরিত্রের লোক, আমি বেশ জানি—এখন জল খাও।"

কালীকান্ত বলিল, "যদি আপনার কাছে কেহ আমার এমন নিন্দা করিয়া থাকে, তবে সে ঠক—ঠকাম করিয়াছে। আপনার কাছে হাতযোড় করিতেছি, আপনি আমার গুরুজন, আমায় ছাড়িয়া দিন।"

কামসুন্দরী রসিকতাপ্রিয়; মনে করিল যে, এ একতর নূতন রসিকতা বটে। বলিল, "প্রাণাধিক, তুমি কত রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছ, তাহা বুঝা যাইবে।" এই বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া আসনে বসাইবার জন্য টানিতে লাগিল।

হস্তধারণ মাত্র কালীকান্ত সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া "বাবা রে, গেলাম রে, এগো রে, আমায় মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। চীৎকার শুনিয়া গৃহস্থ সকলে ভীত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। মা, ভগিনী, পিসী প্রভৃতিকে দেখিয়া

কামসুন্দরী স্বামীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কালীকান্ত অবসর পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গৃহিণী কামসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কামি—জামাই অমন করে উঠ্‌লো কেন? তুই কি মেরেছিস্?"

বিস্মিতা কামসুন্দরী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া কহিল, "মারিব কেন? আমি মারিব কেন—আমার যেমন পোড়া কপাল!" ক্রমে ক্রমে সুর কাঁদনিতে চড়িতে লাগিল—"আমার যেমন পোড়া কপাল—কোন্ আবাগী আমার সর্ব্বনাশ করেছে—কে ওষুধ করেছে—" বলিতে বলিতে কামসুন্দরী কাঁদিয়া হাট লাগাইল।

সকলেই বলিল, "হাঁ তুই মেরেছিস্; নহিলে অমন করে কাতরাবে কেন?" এই বলিয়া সকলে, কামকে "পাপিষ্ঠা" "ডাইনী" "রাক্ষসী" ইত্যাদি কথায় ভৎ'সনা করিতে লাগিল। কামসুন্দরী বিনাপরাধে নিন্দিতা ও ভর্ৎসিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে গিয়া দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে কালীকান্ত বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। নীলরতনবাবু স্বয়ং এবং দ্বারবান্ ও উদ্ধব, সকলে পড়িয়া যে যেখানে পাইতেছে, সে সেইখানে রামাকে প্রহার করিতেছে; কিল, লাতি, চড়, চাপড়ের বৃষ্টির মধ্যে রামা চাকর কেবল বলিতেছে, "ছেড়ে দে রে, বাবা রে, জামাই মারে, এমন কখন শুনি নাই, আমার কি—তোদেরই মেয়েকে একাদশী করতে হবে।" নিকটে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ চাকরাণী হাসিতেছে, সে সর্ব্বদা কালীকান্তবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সে রামা চাকরকে চিনিত, সেই বলিয়া দিয়াছে। কালীকান্তবাবু মারপিট দেখিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠানময় বেড়াইতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ হইল! বাবুকে মারিয়া ফেলিল।" ইহা দেখিয়া নীলরতনবাবু আরও কোপাবিষ্ট হইয়া রামাকে বলিতে লাগিলেন, "তুই বেটাই জামাইকে কি খাওয়াইয়া পাগল করিয়া দিয়াছিস্—মার বেটাকে জুতো।" এই কথা বলায়, যেমন শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির উপর বৃষ্টি চাপিয়া আইসে, তেমনি নির্দ্দোষী রামার উপর প্রহারবৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মারপিটের চোটে বস্ত্রমধ্য হইতে লুকান স্বর্ণগোলকটি পড়িয়া গেল। দেখিয়া তরঙ্গ চাকরাণী তাহা কুড়াইয়া লইয়া নীলরতনবাবুর হস্তে দিল। বলিল, "ও মিন্সে চোর! দেখুন, ও একটা সোনার তাল চুরি করিয়া রাখিয়াছে।" "দেখি" বলিয়া নীলরতনবাবু স্বর্ণগোলক হস্তে লইলেন,—অমনি তিনি রামাকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া দাঁড়াইয়া কোঁচার কাপড় খুলিয়া মাথায় দিলেন; তরঙ্গও মাথার কাপড় খুলিয়া, কোঁচা করিয়া পরিয়া, পাদুকা হস্তে রামাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল।

উদ্ধব তরঙ্গকে বলিল, "তুই মাগি আবার এর ভিতর এলি কেন?"

তরঙ্গ বলিল, "কাকে মাগি বলিতেছিস্?"

উদ্ধব বলিল, "তোকে।"

"আমাকে ঠাট্টা?" এই বলিয়া তরঙ্গ মহাক্রোধে হস্তের পাদুকার দ্বারা উদ্ধবকে প্রহার করিল। উদ্ধবও ক্রুদ্ধ হইয়া, স্ত্রীলোককে মারিতে না পারিয়া, নীলরতনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখুন দেখি কর্ত্তা মহাশয়, মাগির কত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে জুতা মারে!" কর্ত্তা তখন একটুখানি ঘোমটা টানিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া,

মৃদুস্বরে কহিলেন, "তা মেরেছেন মেরেছেন, তুমি রাগ করিও না। মুনিব—মারতে পারেন।"

শুনিয়া উদ্ধব আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "ও আবার কিসের মুনিব—ওও চাকর, আমিও চাকর! আপনি এমনি আজ্ঞা করেন! আমি আপনারই চাকর, ওর চাকর কেন হব? আমি এমন চাকরি করি না।"

শুনিয়া কর্ত্তা আবার একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! বুড়ো বয়সে মিন্সের রস দেখ! আমার চাকর আবার তুমি কিসে হতে গেলে?"

উদ্ধব অবাক্ হইল, মনে করিল, "আজ কি পাগলের পাড়া পড়িয়াছে নাকি?" উদ্ধব বিস্মিত হইয়া রামাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে বাড়ীর গোরক্ষক গোবৰ্দ্ধন ঘোষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তরঙ্গের স্বামী। সে তরঙ্গের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল—তরঙ্গ তাহাকে গ্রাহ্যও করিল না। এদিগে কর্ত্তামহাশয় গোবৰ্দ্ধনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইলেন। গোবৰ্দ্ধনকে আড়ে আড়ে দেখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "তুমি উহার ভিতর যাইও না।" গোবৰ্দ্ধন তরঙ্গের আচরণ দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিল—সে কথা তাহার কানে গেল না; সে তরঙ্গের চুল ধরিতে গেল। "নচ্ছার মাগি, তোর হায়া নেই" এই বলিয়া গোবৰ্দ্ধন অগ্রসর হইতেছিল, দেখিয়া তরঙ্গ বলিল, "গোবরা, তুইও কি পাগল হয়েছিস না কি? যা, গোরুর যাব দিগে যা।" শুনিয়া গোবৰ্দ্ধন, তরঙ্গের কেশাকর্ষণ করিয়া উত্তম মধ্যম আরম্ভ করিল। দেখিয়া নীলরতনবাবু বলিলেন, "যা! পোড়াকপালে মিন্সে কর্ত্তাকে ঠেঙ্গিয়া খুন করলে।" এদিকে তরঙ্গও ক্রুদ্ধ হইয়া "আমার গায়ে হাত তুলিস" বলিয়া গোবৰ্দ্ধনকে মারিতে আরম্ভ করিল। তখন একটা বড় গোলযোগ হইয়া উঠিল। শুনিয়া পাড়ার প্রতিবাসী রাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম মুখোপাধ্যায় একটা সুবর্ণগোলক পড়িয়া আছে দেখিয়া গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহাশয়, এটা কি?"

কৈলাসে পাৰ্ব্বতী বলিলেন, "প্রভো! আপনার গোলক সম্বরণ করুন—ঐ দেখুন গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামের বৃদ্ধা ভার্য্যাকে পত্নী সম্বোধনে কৌতুক করিতেছে। আর রাম মুখোপাধ্যায়ের পরিচারিকা তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিতেছে। এদিগে বৃদ্ধ রাম মুখোপাধ্যায়, আপনাকে যুবা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়া, তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে টপ্পা শুনাইতেছে। এ গোলক আর মুহূৰ্ত্তকাল পৃথিবীতে থাকিলে গৃহে গৃহে বিশৃঙ্খলা হইবে। অতএব আপনি ইহা সম্বরণ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক,

তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম। এক্ষণে গোলক সম্বৃত করিলাম। আমার ইচ্ছায় সকলেই পুনর্ব্বার স্ব স্ব প্রকৃতিস্থ হইবে, এবং যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও স্মরণ থাকিবে না। তবে, লোকহিতার্থে আমার বরে বঙ্গদর্শন এই কথা পৃথিবীমধ্যে প্রচারিত করিবে।"

রামায়ণের সমালোচন

কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত

আমি রামায়ণ গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। অনেক সময়ে রচনা প্রায় নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কবিদিগের তুল্য। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। গ্রন্থকার যে আর কিছুদিন যত্ন করিলে একজন সুকবি হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই কাব্যগ্রন্থখানির স্থূল তাৎপর্য্য, বানরদিগের মাহাত্ম্যবর্ণন। বানরেরা বোধ হয়, আধুনিক Bonerwal নামা হিমাচল প্রদেশবাসী অনার্য্য জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ। অনার্য্য বানরগণকর্ত্তৃক লঙ্কাজয় ও রাক্ষসদিগের সবংশে নিধন, ইহার বর্ণনীয় বিষয়। তখন আর্য্যেরা অসভ্য ও অনার্য্যেরা সভ্য ছিল।

রামায়ণে কিছু কিছু নীতিগর্ভ কথা আছে। বুদ্ধিহীনতার যে কত দোষ, তাহা কবি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক নির্ব্বোধ প্রাচীন রাজার চারিটি ভার্য্যা ছিল। বহুবিবাহের বিষময় ফল সহজেই উৎপন্ন হইল। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের উন্নতির জন্য, অসভ্য বৃদ্ধকে ভুলাইয়া ছলক্রমে সপত্নীগর্ভজাত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ আলস্যবশতঃ আপন স্বত্বাধিকার বজায় রাখিবার কোন যত্ন না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সহিত মহাতেজস্বী তুর্কবংশীয় ঔরঙ্গজেবের তুলনা কর; মুসলমান কেন এতকাল হিন্দুর উপর প্রভুত্ব করিয়াছে বুঝিতে পারিবে। রাম গমনকালে আপনার যুবতী ভার্য্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। তাহাতে যাহা ঘটিবার ঘটিল।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই অসতী, এই সীতার ব্যবহারই তাহার উত্তম প্রমাণ। সীতা যেমন গৃহের বাহির হইল, অমনই অন্য পুরুষ ভজনা করিল। রামকে ত্যাগ করিয়া রাবণের সঙ্গে লঙ্কায় রাজ্যভোগ করিতে গেল। নির্ব্বোধ রাম পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। হিন্দুরা এই জন্যই স্ত্রীলোকদিগকে গৃহের বাহির করে না।

হিন্দুস্বভাবের জঘন্যতার লক্ষণ আর একটি উদাহরণ। তাহার চরিত্র এরূপে চিত্রিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা লক্ষ্মণকে কর্ম্মক্ষম বোধ হয়। অন্যজাতীয় হইলে সে একজন বড় লোক হইতে পারিত, কিন্তু তাহার এক দিনের জন্যও সে দিকে মন যায় নাই। সে কেবল রামের পিছু পিছু বেড়াইল, আপনার উন্নতির কোন চেষ্টা করিল না। ইহা কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ নিশ্চেষ্টতার ফল।

আর একটি অসভ্য মূর্খ ভরত। আপন হাতে রাজ্য পাইয়া ভাইকে ফিরাইয়া দিল। ফলতঃ রামায়ণ অকর্ম্মা লোকের ইতিহাসেই পূর্ণ। ইহা গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। রাম পত্নীকে হারাইলে অনার্য্য (বানর) জাতি তাহার কাতরতা দেখিয়া দয়া করিয়া রাবণকে সবংশে মারিয়া সীতা কাড়িয়া আনিয়া রামকে দিল, কিন্তু বর্ব্বর জাতির

নৃশংসতা কোথায় যাইবে ? রাম স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া তাহাকে একদিন পুড়াইয়া মারিতে গেল। দৈবে সে দিন সেটার রক্ষা হইল। পরে তাহাকে দেশে আনিয়া দুই চারি দিন মাত্র সুখে ছিল। পরে বর্ব্বরজাতির স্বভাবসুলভ ক্রোধবশতঃ পরের কথা শুনিয়া স্ত্রীটাকে তাড়াইয়া দিল। কয়েক বৎসর পরে সীতা খাইতে না পাইয়া রামের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাম তাহাকে দেখিয়া রাগ করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিল। অসভ্য জাতির মধ্যে এইরূপই ঘটে। রামায়ণের স্থূল তাৎপর্য্য এই।

ইহার প্রণেতা কে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। কিম্বদন্তী আছে যে, ইহা বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি নামে কোন গ্রন্থকার ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সংশয়। বল্মীক হইতে বাল্মীকি শব্দের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, অতএব আমার বিবেচনায় কোন বল্মীক-মধ্যে এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় দেখা যাউক।

রামায়ণ নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। ইহা কৃত্তিবাস প্রণীত। উভয় গ্রন্থে অনেক সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাল্মীকি রামায়ণ কৃত্তিবাস হইতে সঙ্কলিত, কি কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে ; ইহা স্বীকার করি। কিন্তু রামায়ণ নামটিই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃতে কোন অর্থ হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় সদর্থ হয়। বোধ হয়, "রামায়ণ" শব্দটি "রামা যবন" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। কেবল "ব"কার লুপ্ত হইয়াছে। রামা যবন বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস প্রথম ইহার রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেহ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া বল্মীকমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গ্রন্থ বল্মীকমধ্যে প্রাপ্ত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।

রামায়ণ গ্রন্থখানির আমরা কিছু প্রশংসা করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না। উহাতে অনেক গুরুতর দোষ আছে। আদ্যোপান্ত অশ্লীলতাঘটিত। সীতার বিবাহ, রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ, এ সকল অশ্লীলতাঘটিত না ত কি ? রামায়ণের করুণরসের অতি বিরল প্রচার। বানরকর্ত্তৃক সমুদ্রবন্ধন, কেবল এইটিই রামায়ণের মধ্যে করুণরসাশ্রিত বিষয়। লক্ষ্মণভোজনে কিঞ্চিৎ বীররস আছে। বশিষ্ঠাদি ঋষি-দিগের কিছু হাস্যরস আছে। ঋষিগণ বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মের কথা লইয়া অনেক হাস্য পরিহাস করিতেন।

রামায়ণের ভাষা যদিও প্রাঞ্জল এবং বিশদ বটে, তথাপি অত্যন্ত অশুদ্ধ বলিতে হইবে। রামায়ণের একটি কাণ্ডে যোদ্ধাদিগের কোন কথা না থাকায় তাহার নাম হইয়াছে "অযোদ্ধাকাণ্ড"। গ্রন্থকার তাহা "অযোদ্ধাকাণ্ড" না লিখিয়া "অযোধ্যাকাণ্ড" লিখিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ অশুদ্ধ সংস্কৃত প্রায় দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে অধিকারী।

বর্ষ সমালোচন

সম্বাদপত্রের প্রথা আছে, নব বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন সম্বাদপত্র নহে, সুতরাং বঙ্গদর্শন বর্ষসমালোচনে বাধ্য নহে। কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না ? যেমন অনেকে রাজা না হইয়াও রাজকায়দায় চলেন,

যেমন অনেকে কালা বাঙ্গালি হইয়াও সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেন্টেলুন আঁটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা হইয়াও, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্বাদপত্রের অধিকার গ্রহণ করিব, ইচ্ছা করিয়াছি।

কিন্তু মনুষ্যজাতির এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই সাধে তখন বিঘ্ন ঘটে। নূতন বৎসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমরা লিখিতেছি, অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন! সর্ব্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বঙ্গদর্শন রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মানে না—অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। অতএব আমরা মনের সাধ মনে না মিটাইয়া, সে সাধে বিষাদ ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ সম্বরণ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের সমালোচন করিব। অতএব হে গত বর্ষ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন করিব।

গত বৎসরে রাজকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিবস ছিল, একদিনও কম হয় নাই। প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই। রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে। অনেকে বলেন যে, এ বৎসরে গোটাকত দিন কমাইয়া দিলে ভাল হইত; আমরা এ কথার অনুমোদন করি না; দিন কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সম্বাদপত্র-লেখকদিগের শ্রমলাঘব; সাধারণের কোন লাভ নাই; (আমরা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি কেহ ছাড়িবে না।) তবে গ্রীষ্মকালটি একেবারে উঠাইয়া দিলে ভাল হয় বটে। আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বার মাসই শীতকাল থাকে, এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বৎসর পরমায়ু চুরি গিয়াছে। কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে। যদি পরমায়ু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়িল কি প্রকারে? নিন্দক সম্প্রদায়ই এমত অযথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে।

এ বৎসর যে সুবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বৎসর অনেকেরই সন্তান জন্মিয়াছে। টিষ্টিমেন্টেল ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও পুত্র হইয়াছে, কাহারও কন্যা হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভস্রাব হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ বৎসর কতকগুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মরিয়াছে। শুনিয়াছি যে, এদেশীয় কোন মহাসভা পার্লিমেন্টে আবেদন করিবেন যে, এই পুণ্যভূম ভারতরাজ্যে মনুষ্য না মরিতে পায়। তাঁহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, যদি কাহারও নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিষে জানাইয়া অনুমতি লইয়া মরিবে।

এ বৎসর ফাইন্যান্‌সিয়ল ডিপার্টমেন্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র—আমরা শ্রুত হইয়াছি যে, গবর্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা বিস্ময়কর হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইহাতে গবর্ণমেন্টের টাকা, হয় কিছু উদ্বর্ত্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, নয় ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে। আগামী বৎসর (৭৬ শালে) টেক্স

বসিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, কিন্তু ভরসা করি, ৭৭ শালের এপ্রিল মাসে আমরা এ কথা নিশ্চিত বলিতে পারিব।

এবার বিচারালয় সকলের কার্য্যের আমরা বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। সত্য বটে যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে বা হইবে, এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহারা নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন বিচার হয় নাই। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না; যেখানে সাধারণ বিচারালয়, সেখানে নালিশ করুক বা না করুক, বিচার চাই। কেহ রৌদ্র চাহুক বা না চাহুক, সূর্য্যদেব সর্ব্বত্র রৌদ্র করিয়া থাকেন, কেহ বৃষ্টি চাহুক বা না চাহুক, মেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কেহ বিচার চাহুক বা না চাহুক, বিচারকের উচিত, গৃহে গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আসেন। যদি কেহ বলেন যে, বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের সম্মার্জ্জনী সকল অকস্মাৎ বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে, গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ সম্মার্জ্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না—সম্মার্জ্জনীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর হাকিমদিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হইয়া থাকে। যেমন ময়ূর সর্পপ্রিয়, ইঁহারাও তেমনি সম্মার্জ্জনীপ্রিয়—দেখিলেই প্রায় ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা এমনও শুনিয়াছি যে, গবর্ণমেন্টের কোন কর্ম্মচারী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেমন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারের জন্য "অর্ডর অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" সংস্থাপিত করা হইয়াছে, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের জন্য "অর্ডর অব দি ক্রমৃষ্টিক্" সংস্থাপিত করা হউক। এবং বিশেষ বিশেষ গুণবান্ ডিপুটি এবং সবজজ প্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া লাকলাইনের দড়িতে এই মহারত্নটিকে বাঁধিয়া তাঁহাদিগের গলদেশে লম্বমান করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহাদের চাপকান চেন চাদরবিভূষিত সদাকম্পমান্ বক্ষে ইহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। রাজপ্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইলে ইহা যে সাদরে গৃহীত হইবে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আমাদের কেবল আশঙ্কা এই যে, এত উমেদওয়ার যুটিবে যে, ঝাঁটার সঙ্কুলান করা ভার হইবে।

গত বৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। ইহা মেঘদিগের পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে গবর্ণমেন্টে এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যাহাতে সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হয়, এমন কোন উপায় উদ্ভূত হউক। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার সদুপায় নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত। কোন কোন মান্য সহযোগী বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ইহাতেও সুবিধা হইবে না—কেন না, বঙ্গদেশের মেঘসকল অত্যন্ত সৌদামিনীপ্রিয়—সৌদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশদেশান্তরে যাইতে স্বীকার করিবে না। আমরা প্রস্তাব করি যে, মেঘ সকল এবালিশ করিয়া দিয়া, ভিস্তীর বন্দোবস্ত করা হউক। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে একজন চাপরাশী বা সুযোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশখণ্ডে বাঁধিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিস্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া, পারে ত নামিয়া আসিবে। ভাল হয় না?

আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশহিতৈষিণী নন—নহিলে ভিস্তীর প্রয়োজন

হইত না। তাঁহারা যদি প্রাত্যহিক সাংসারিক কান্নাটা মাঠে গিয়া কাঁদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয় ও মেঘ ডিপার্টমেণ্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গলার্থ বলি যে, আকাশবৃষ্টির পরিবর্ত্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে গেলে, একটু পাকা রকম পুলিষের বন্দবস্ত করা চাই। মেঘের বিদ্যুতে অধিক প্রাণী নাশ হয় না ; কিন্তু রমণীনয়নমেঘের কটাক্ষ-বিদ্যুতে, মাঠের মাঝখানে, চাষা-ভূষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না—পুলিষ থাকা ভাল।

শুনিলাম, শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা কাণমাপা কাটি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি মাপিয়া দেখিব—নহিলে তাঁহাদিগের নিকট পড়িব না। আমরা ভরসা করি, মাপকাটি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই।

যাহা হউক, দুর্বৎসর হউক, সুবৎসর হউক, তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা স্থির জানিতে পারিতেছি—তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

প্রথম, বৎসরটি চলিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে মতান্তর নাই।

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে না। ফিরাইবার জন্য কেহ কোন উদ্যোগ পাইবেন না। নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক ! আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস জল। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কোন "স্পেশিয়ালের" পত্র

যুবরাজের সঙ্গে যে সকল "স্পেশিয়াল" আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সে বিলাতীয় সম্বাদপত্রের নামের জন্য যদি কেহ আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করেন, তবে আমরা লাচার হইব। সম্বাদপত্রের নাম আমরা জানি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ নাই। পত্রখানির মর্ম্ম এই—

যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেরূপ দেখিলাম, তাহা এই অবকাশে বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যায়িত করিব ইচ্ছা আছে। আমি এদেশ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেরূপ ঠিক সম্বাদ পাইবেন, এমন অন্যের কাছে পাইবেন না। এদেশের নাম "বেঙ্গল"। এ নাম কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না। কিন্তু দেশী লোকে এদেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে ? তাহারা বলে, পূর্ব্বে ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বলিত, তৎপ্রদেশের লোককে এখনও "বাঙ্গাল" বলে, এজন্য এদেশের নাম "বাঙ্গালা"। কিন্তু এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে—ইহার নাম "বেঙ্গল"—তাহা আপনারা সকলেই জানেন। অতএব এ কথা কেবল প্রবঞ্চনা মাত্র। আমার বোধ হয়, বেঞ্জামিন গল (Benjamin Gall) সংক্ষেপতঃ বেন্ গল্ নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত এবং অধিকৃত করিয়া আপন নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

রাজধানীর নাম "কালকাটা" (Calcutta) "কাল" এবং "কাটা" এই দুইটি বাঙ্গালা শব্দে এই নামের উৎপত্তি। এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, এই জন্যই ইহার নাম "কালকাটা"।

এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছিল; কেন না, সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত কেশ; নরতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাফ্রি। আর যাহারা কিঞ্চিৎ গৌরবর্ণ, বোধ হয় তাহারা উপরিকথিত বেন্ গল্ সাহেবের বংশসম্ভূত।

দেখিলাম, অধিকাংশ বাঙ্গালি মাঞ্চেষ্টরের তন্তুপ্রসূত বস্ত্র পরিধান করে। অতএব স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংস্রবে আসিবার পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত। এক্ষণে মাঞ্চেষ্টরের অনুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া বাঁচিতেছে। ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, কি প্রকারে বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, তাহা এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেহ কেহ আমাদিগের মত পেণ্ট্লন পরে, কেহ কেহ তুর্কীদিগের মত পায়জামা পরে, এবং কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বস্ত্রগুলি কেবল কোমরে জড়াইয়া রাখে।

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে এক শত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তাহা ইংরেজই জানে। বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে।

দুঃখের বিষয় যে, আমি কয়দিনে বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি নাই, তবে কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেস্তান্ এবং বোস্তান্ নামে যে দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক আছে, তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যুধিষ্ঠির নামে রাজা, রাবণ নামে আর একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল। মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেন। পরিশেষে তাঁহার পিতা, কৃষ্ণের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করেন।

আমি কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি। বাঙ্গালিরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, ডিষমিষকে ডিষমিষ, রেলকে রেল, ডোরকে ডোর, ডবলকে ডবল, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র।

ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই হইল, তবে ইংরেজরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিল কি না? দেখ, আমাদিগের খৃষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের* মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক তৎপ্রণীত ভগবদ্গীতা বাইবেল হইতে অনুবাদিত। সুতরাং বাইবেলের পূর্ব্বে যে ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইহা

* **Dr. Lorinzer &c.**

একপ্রকার স্থির। তাহার পরে কবে ইহাদিগের ভাষা হইল, বলা যায় না। বোধ করি, পণ্ডিতবর মক্ষমূলর মনোযোগ করিলে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। যে পণ্ডিত মীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের পূর্ব্বে আর্য্যেরা লিখিতে জানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম।

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্স হইতে মক্ষমূলর পর্য্যন্ত প্রাচ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা আছে। কিন্তু এদেশে আসিয়া আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই। সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাষা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই। বোধ হয়, এটি সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির কারসাজি। তাঁহারা পশারের জন্য এ ভাষাটি সৃষ্টি করিয়াছেন।*

যাহা হৌক, উহাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা শুনিয়াছ যে, হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু তাহা নহে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আছে, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিতেছি।

১। ব্রাহ্মণ, ২। কায়স্থ, ৩। শূদ্র, ৪। কুলীন, ৫। বংশজ, ৬। বৈষ্ণব, ৭। শাক্ত, ৮। রায়, ৯। ঘোষাল, ১০। টেগোর, ১১। মোল্লা, ১২। ফরাজি, ১৩। রামায়ণ, ১৪। মহাভারত, ১৫। আসাম গোয়ালপাড়া, ১৬। পারিয়া ডগস্।

বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র। আমি অনেকগুলিন বাঙ্গালিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি কোন্ জাতি? সকলেই বলিল, তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিল না; কেন না, আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের গ্রন্থে † পড়িয়াছি যে, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রাহ্মণ। দেখা যাইতেছে যে, "Mitra" শব্দ "Mitre" শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিতজাতীয়ই বুঝায়।

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজভক্ত। যেরূপ লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃশ রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে পরদানশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, তবে সর্ব্বত্র নয়। ‡ যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়াও সেরূপ করে; যখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে

* সাবধান, কেহ হাসিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডুগাল্‌ড ষ্টুয়ার্ট যথার্থই এই মতাবলম্বী ছিলেন।

† *Chips from a German Workshop.*

‡ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের কেহ কেহ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি না। আমি বাঙ্গালির কন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমারও ফৌলিংপিস্‌টিকে দুই একখানা সোণার গহনা পরাইব—দেখি, পাখী ঘুরিয়া আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কি না।

তবু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও বড় সুপটু। হিন্দু সাহিত্যোক্ত পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত পুষ্পশরে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আমি জানি না ; যদি থাকে, তবে বাঙ্গালির মেয়েকে দুরাকাঙ্ক্ষিণী বলিতে হইবে। শুনিয়াছি, কোন বাঙ্গালি কবি নাকি লিখিয়াছিলেন "কি ছার মিছার ধনু, ধরে ফুলবাণ" ; এখন কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিতে হইবে, "কি ছার মিছার ফুল, মারে ফুলবাণ"। যাহা হউক, ফুলবাণ সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইংরেজ টেকা ভার হইবে—আমার সর্ব্বদা ভয় করে, আমি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, দু-টাকার লোভে সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—কে জানে কখন বঙ্গকুলকামিনী-প্রেরিত কুসুমশর আসিয়া, এই ছেঁড়া তাম্বু ফুটা করিয়া, আমার হৃদয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি ধপাস্ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব! হায়! তখন আমার কি হইবে! কে মুখে জল দিবে!

আমি এমত বলি না যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংপিস, অথবা সকলেই এরূপ পুষ্পক্ষেপণী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত হইয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহারা নাকি ভর্ত্তৃনিয়োগানুসারেই এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত। এই ভর্ত্তৃগণ দেশীয় শাস্ত্রানুসারেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে,

আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।

ইহার অর্থ এই. হে পদ্মপলাশলোচনে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর।

BRANSONISM*

জন ডিক্‌সন সাহেবকে ফৌজদারী আদালতে ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব বড় কালো, তা হলে হয় কি, সাহেব ত বটে—পাড়াগেঁয়ে কাছারিতে বিচার দেখিতে অনেক রঙ্গদার লোক ছুটিয়া গেল। বিচার একটা দেশী ডিপুটির কাছে হইবে। তাহাতে সাহেবের কিছু কষ্ট ; তবে মনে মনে ভরসা আছে যে, বাঙ্গালিটা ভয়ে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। ডিপুটি মহাশয়ের রকম দেখিয়াও তাই বোধ হয়, একটা তেকেলে বুড়ো—নিরীহ রকম ভাল মানুষ ; জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে কনষ্টেবল মহাশয়েরা কতকটা ভয়ে ভয়ে সাহেব মহাশয়কে ডকস্থ করিলেন। সাহেব ডকস্থ হইয়াই একটু গরম হইয়া হাকিমের পানে চাহিয়া চোখ ঘুরাইয়া একটু বাঁকা বাঁকা বুলিতে বলিলেন, "সে হামাকে টোমরা হেখানে কেন আনিলো ?"

* Ilbert বিল সম্বন্ধীয় বিবাদকালে ইহা লিখিত হয়।

হাকিম বলিল, "কি জানি সাহেব! কেন আনিলো—তুমি কি করেছ?"

সাহেব। যা করে না কেন, টোমার সাতে হামার কোন বাট হোবে না।

হাকিম। কেন সাহেব?

সাহেব। টুমি কালা বাঙ্গালি আছে।

হাকিম। তার পর?

সাহেব। হামি সাহেব আছে।

হাকিম। তা ত দেখ্‌ছি—তাতে কি হলো?

সাহেব। তোমার—কি বলে? সেটা লেই।

হাকিম। তবু ভাল—মাতৃভাষা ধরেছ, এতক্ষণ বাঁকা বাঁকা বুলি ধরেছিলে কেন? কি নেই?

সাহেব। সেই ঝাতে মোকদ্দমা করে—সে টুমি জানে না?

হাকিম। সাহেব, আমি ভাল মানুষ—তোমায় এখনও কিছু বলি নাই—কিন্তু আর "তুমি" "তুমি" করিও না—জরিমানা করিব।

সাহেব। টুমি মোর জরিমানা করিতে পারে না—হামি সাহেব আছে—তোমার সেই সেটা—কি বলে—সেটা লেই।

হাকিম। কি নেই সাহেব?

সাহেব। সেই যে—জুষ্টিকেশন।

হাকিম। ওহো—Jurisdiction? বটে। তুমি কি বিলাতী সাহেব?

সা হামি সাহেব আছে।

হা রংটা এত কাল কেন?

সা মুই কোয়লার কাম করেছিল।

হা তোমার বাপের নাম কি?

সা বাপের নামে কোটের কি কাম আছে?

হা বলি সেটা জানা আছে কি?

সা হামার বাপ বড় আদমি ছেলো—লেকেন লামটা এখন মনে পড়্‌ছে না।

হাকিম। মনে কর না হয়। তোমার নামটা কি?

সাহেব। আমার নাম জান সাহেব—জান ডিক্‌সন্।

হা। বাপের নাম ডিক্‌সন্ নয়?

সা। হোবে—ডিক্‌সন্ হোতে পারে—লেকেন—

বাদীর মোক্তার এই সময়ে বলিল, "হুজুর, ওর বাপের নাম গোবর্দ্ধন সাহেব।"

সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "গোবর্দ্ধন হইলো ত কি হইলো—তোমার বাপের নাম যে রামকান্ত—তোমার বাপ চূড়া বেচিত—আমার বাপ বড় আদমি ছেলো।"

হাকিম। তোমার বাপ কি করিত?

সাহেব। বড় লোকের সাদি দিত।

হাকিম। সে আবার কি? ঘটকালি করিত না কি?

মোক্তার। আজ্ঞে না—বিবাহের বাজনার জয়ঢাক ঘাড়ে করিত।

অনেকে হাসিল। হাকিম জুরিস্‌ডিক্‌সনের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত

হইলেন। ফরিয়াদীকে তলব করায় রূপার পৈছা হাতে নধর কালো কোলো একজন স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহাকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইল, আর সে যেরূপ উত্তর দিল, নিম্নে লিখিতেছি ;—

প্রশ্ন। তোমার নাম কি ?

উত্তর। রঙ্গিণী জেলেনী।

প্রশ্ন। তুমি কি কর ?

উত্তর। বিল খালে মাছ ধরে বেচি।

আসামী সাহেব কহিল, "ঝুটা বাত। ও সুঁটকি মাছ বেচে।"

জেলেনী বলিল, "তাও বেচি। তাইতেই ত তুমি মরেছ।"

প্রশ্ন। তোমার কিসের নালিশ ?

উত্তর। চুরির নালিশ।

প্রশ্ন। কে চুরি করেছে ?

উত্তর। (সাহেবকে দেখাইয়া) এই বাগ্দীর ছেলে।

সাহেব। মুই সাহেব আছে—মুই বাগ্দী নই।

প্রশ্ন। কি চুরি করেছে ?

উত্তর। এই ত বলিলাম—এক মুঠা সুঁটকি মাছ।

প্রশ্ন। কি রকমে চুরি করিল ?

উত্তর। আমি ডালা পাতিয়া তাতে সুঁটকি মাছ সাজাইয়া বেচিতেছিলাম—একজন খদ্দের এলো—তা তার পানে ফিরে কথা কইতেছিলাম—এমন সময়ে সাহেব ডালা থেকে এক মুঠা মাছ তুলে নিয়ে পাকেটে পুরিল।

প্রশ্ন। তার পর, তুমি টের পেলে কেমন ক'রে ?

উত্তর। পাকেটের যে আধখানা বই ছিল না—তা সাহেবের মনে ছিল না। সুঁটকি মাছ সব ফুটো দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া সাহেব রাগ করিয়া বলিল, "না বাবুজি! ওর চুপড়িটাই ফুটো, তোই মাছ বেরইয়ে পড়েছিল।"

জেলেনী বলিল, "ওর পাকেটে দুই চারিটা মাছ পাওয়া গিয়াছিল।"

সাহেব বলিল, "সে মুই দাম দেবে ব'লে নিয়েছেলো।"

সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ হইল যে, ডিক্‌সন সাহেব সুঁটকি মাছ চুরি করিয়াছেন। তখন হাকিম, সাহেবের জবাব লিখিতে বসিলেন। সাহেব জবাবে কেবল এই কথা বলিলেন যে, কালা বাঙ্গালির আমার উপর "জুষ্টিকেশন লেই।" সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাকিম তাহাকে এক হপ্তা কয়েদের হুকুম দিলেন। দুই চারি দিন পরে এই কথাটা কলিকাতার একখানা ইংরেজি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাণে গেল। পর দিন প্রভাতে সেই পত্রের সম্পাদকীয় উক্তিমধ্যে নিম্নোদ্ধৃত লীডর দেখা গেল।

"The Wisdom of a Native Magistrate.—A story of lamentable failure of justice and race antipathy has reached us from the Mofussil. John Dickson, an English gentleman of good birth though at present rather in straightened circumstances had fallen under

the displeasure of a clique of designing natives headed by one Rungini Jeliani, a person, as we are assured on good authority, of great wealth, and considerable influence in native society. He was hauled up before a native Magistrate on a charge of some petty larceny which, if the trial had taken place before a European Magistrate, would have been at once thrown out as preposterous, when preferred against a European of Mr. Dickson's position and character. But Baboo Jaladhar Gangooly, the ebony-coloured Daniel before whose awful tribunal, Mr. Dickson had the misfortune to be dragged, was incapable of understanding that petty larcenies, however congenial to sharp intellects of his own country, have never been known to be perpetrated by men born and bred on English soil, and the poor man was convicted on evidence the trumpery character of which, was probably as well known to the magistrate as to the prosecutors themselves. The poor man pleaded his birth, and his rights as a European British subject, to be tried by a magistrate of his own race, but the plea was negatived for reasons we neither know nor are able to conjecture. Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel and nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet! Meanwhile we leave our readers to conjecture from a study of the names *Jaladhar* and *Jaliani* whether the tie of kindred which obviously exists between prosecutor and magistrate has had no influence in producing this extraordinary decision."

এই লীডর বাহির হইলে পর উহা পড়িয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব জলধরবাবুকে চাপরাশি পাঠাইয়া তলব করিয়া আনিলেন। গরিব ব্রাহ্মণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি সেলাম না করিতে করিতে সাহেব গরম হইয়া বলিলেন, "What do you mean, Babu, by convicting a European British subject?"

ডিপুটি। What European British subject, Sir?

মাজিষ্ট্রেট। Read here, I suppose you can do that. I am going to report you to the Government for this piece of folly.

এই বলিয়া সাহেব কাগজখানা বাবুর কাছে ফেলিয়া দিলেন, বাবু কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন, "Do you now understand?"

Deputy. Yes, Sir, but this man was not a European British subject.

Magistrate. How do you know that ?

Deputy. He was very dark.

Magistrate. Do you find it laid down in the Law that a fair skin is the only evidence by which a man shall be adjudged to be a European subject ?

Deputy. No, Sir.

Magistrate. Well, what other evidence did you take ?

এখন ডিপুটিবাবুটি বহুকালের ডিপুটি—জানিতেন যে, তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ্। অতএব সুচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্ত্তব্য,—তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it."

এখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিতান্ত বোকা নহেন, ভিতরে ভিতরে একটু রঙ্গদার। এই কথা শুনিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "Very sorry for what ?"

Deputy. For convicting a European British subject.

Magistrate. Why so ?

Deputy. Because it is very wrong for a native to convict a European British snbject.

Magistrate. Why very wrong ?

ডিপুটিটি সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে বেচিতে পারে। অমনি উত্তর দিল, "Very wrong, because a European British subject cannot commit a crime and a native cannot judge honestly."

Magistrate. Do you admit that ?

Deputy. I do not see why I should not. I try to do my duty to the best of my ability, but I speak of my countrymen generally.

Magistrate. You don't think your countrymen ought to try Europeans ?

Deputy. Most certainly they should not. The glorious British Empire will come to an end if they do.

Magistrate. Well, Babu, I am glad to see you are so sensible. I wish all your countrymen were equally so ; at least that all native magistrates were like you.

Deputy. Oh Sir ! how can you expect it, when there are men at the top of our service who think differently.

Magistrate. Are you not yourself near the top ? You must have served long.

Deputy Unfortunately my claims to promotion have always been overlooked. I thought of speaking to you, Sir, on the subject

Magistrate. You certainly deserve promotion. I will write to the Commissioner and see what can be done for you.

ডিপুটি তখন দুই হাতে সেলাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে জয়েণ্ট সাহেব, বড় সাহেবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি বাহির হইয়া গেল জয়েণ্ট দেখিলেন। জয়েণ্ট বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What could you have been saying to this fellow ?"

Magistrate. Oh ! He is very amusing.

Joint. How so ?

Magistrate. He is both fool and knave. He thinks of pleasing me by traducing his own countrymen.

Joint. And did you tell him your mind ?

Magistrate. O no ! I promised him promotion, which I will try to get for him. He has at least the merit of not being conceited. A conceited native is perfectly useless as a subordinate, and I prefer encouraging men to make a moderate estimate of their own merits.

এ দিকে, ডিপুটি ফিরিয়া আসিলে পর, আর এক ডিপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দোশরা ডিপুটি জলধরকে বলিলেন, "সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন না কি ?"

জলধর। হাঁ। কি পাপে পড়েছি !

২রা ডিপুটি। কেন ?

জলধর। সে দিনকার সেই বাগ্দী বেটাকে কয়েদ দিয়াছিলাম বলিয়া, সাহেব বলে, গবর্ণমেণ্টে আমার নামে রিপোর্ট করিবে।

২রা ডিপুটি। তার পর ?

জলধর। তার পর আর কি ? প্রমোশ্যনের রিপোর্ট করিয়ে এলেম।

২রা ডিপুটি। সে কি ? কি মন্ত্রে ?

জলধর। মন্ত্র আর কি ? দুটো মনরাখা কথা।

হনুমদ্বাবুসংবাদ

একদা প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কদলীকুঞ্জে শ্রীমান্ হনুমান বায়ু সেবনার্থ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার পরম রমণীয় লাঙ্গুলবল্লী চক্রে চক্রে কুণ্ডলীকৃত হইয়া কখন পৃষ্ঠে, কখন স্কন্ধে, কখন বৃক্ষশাখায় শোভিত হইতেছিল। চারি পাশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁঠালি প্রভৃতি নানাজাতীয় সুপক্ক এবং অপক্ক রম্ভা বৃক্ষ হইতে থরে থরে, কাঁদিতে কাঁদিতে শোভা পাইয়া সুগন্ধে দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। বীরবর, কখন কোন গাছ হইতে এক আধটা পাড়িয়া, কখন আঘ্রাণ, কখন চুম্বন, কখন লেহন এবং কদাচিৎ চর্ব্বণ করিয়া কদলীজাতীয়

ফলমাত্রের অনন্ত মাধুর্য্য সম্বন্ধে বহুতর মানসিক প্রশংসা করিতেছেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বুট, কোট, পেন্টালন, চেন, চসমা, চুরট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত। হনূমান্‌চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে, নিশ্চয় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে এ আসিতেছে। এরূপ পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী ও স্বজাতি, অতএব ইহাকে আমি অবশ্য আদর করিব।"

এই ভাবিয়া, মহাত্মা পবনাত্মজ এক সরস চম্পককদলীবৃক্ষ হইতে উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ এক গুচ্ছ সুপক্ব কদলী উন্মোচন করিয়া আঘ্রাণ করিলেন। এবং তাহার ঘ্রাণে পরিতুষ্ট হইয়া অতিথিসৎকারে তৎপ্রয়োগ মনে মনে স্থির করিলেন। ইত্যবসরে সেই টুপিকোট-পরিবৃত মোহন মূর্ত্তি বীরবরের সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিল। বলিল, Good morning Mr Hanuman! how do you do? So glad to see you! Ah! I see you are at break-fast already."

হনূমান্ কহিলেন, "কিমিদং? কিং বদসি?"

বাবু। What's that? I suppose that is the Kishkinda patois? It is a glorious country—is it not? "There is a land of every land the pride."—and so on, as you know.

হনূ। কস্ত্বং! কস্মাজ্জনপদাৎ আগতোসি?

বাবু। (জনান্তিকে) It seems most barbarous gibberish—that precious lingo of his; but I suppose I must put up with it. (প্রকাশ্যে) My dear Mr. Monkey, I am ashamed to confess that I am not quite familiar with your beautiful vernacular. I dare say it is a very polished language. I presume you can talk a little English.

তখন সেই মহাবীর পবননন্দন সহসা মহাচক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া বৃহৎ লাঙ্গুলপাশ বিস্তারণপূর্ব্বক তাহা বাবুজি মহাশয়ের গলদেশে অর্পিত করিলেন। এবং কুণ্ডলী করিয়া জড়াইতে লাগিলেন। তখন বাবু মহাশয় হাঁ করিয়া ফেলিলেন, মুখের চুরট পড়িয়া গেল। বলিলেন, "I say—this seems somewhat—"

লেজের আর এক পেঁচ।

"Somewhat unmannerly—to say the least—"

আর এক পেঁচ।

"Dear Mr. Hanuman—you will hurt me."

আর এক পেঁচ।

"Kind—good Mr. Hahneman."

হনূমান্ তখন বাবু মহাশয়কে লেজে করিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিলেন, বাবুর টুপি, চসমা, এবং চাবুক পড়িয়া গেল; কোট-পকেট হইতে ঘড়ি বাহির হইয়া চেনে ঝুলিতে লাগিল। তখন বাবুর মুখ শুকাইল—ডাকিলেন, "ও হনূমান্ মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর! গরিবের প্রাণ যায়।"

তখন হনূমান, বাবুর প্রতি সদয় হইয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক লাঙ্গুলপাশ

হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিলেন। অবসর পাইয়া বাবু টুপি, চসমা, চাবুক কুড়াইয়া পরিলেন। হনূমান্ বলিলেন, "মহাশয়! দুঃখিত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিষ্কিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে-রকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি। এক্ষণে—"

বাবু। এক্ষণে কি ?

হনূ। এক্ষণে বুঝিয়াছি যে, আপনার জন্ম বঙ্গদেশীয় কোন মহিলার গর্ব্ভে। এখন আপনি ক্লান্ত আছেন—একটা কদলী ভোজন করিবেন ?

এখন বাবুজির যেরূপ জিব শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে একটু সরস কদলী ভোজন অতিশয় আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল—তিনি তখন প্রীত হইয়া উত্তর করিলেন, "With the greatest pleasure."

হনূ। আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্ত্তাকু অনুসন্ধানে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি ; এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনানুমতিতে রামানুচর-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি। অতএব আমি বাঙ্গালা উত্তম বুঝি। অতএব মাতৃভাষাতেই আমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বাবু। তার আশ্চর্য্য কি ? আপনি কলা দিতে চাহিতেছেন ? আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত আপনার কদলী ভক্ষণ করিব।

হনূমান্ তখন বাবু মহাশয়কে এক ছড়া কলা ফেলিয়া দিলেন। সে দেবদুর্ল্লভ কদলী খাইয়া বাবু অতিশয় প্রীত হইলেন। হনূমান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কলা ?"

বাবু। অতি মিষ্ট—delicious !

হনূ। হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ ! মাতৃভাষায় কথা কও।

বাবু। ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে Excuse করুন—

হনূ। তাই বা কাকে বলে ?

বাবু। আমাকে মাপ করুন—আমি বড়—কি বলব ?—ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাঙ্গালা কি ?

হনূ। বৎস ! তোমার কথোপকথনে আমি প্রীত হইয়াছি। তুমি আরও কলা খাইতে পার। যত ইচ্ছা তত খাইতে পার। গাছে আছে, পাড়িয়া দিতেছি। আর আমা হইতে তোমার যদি কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তবে তাহাও আমাকে বল, আমি তৎসাধনে তৎপর হইব।

বাবু। ধন্যবাদ, হে আমার প্রিয় বানর মহাশয় ! এক্ষণে আপনার প্রতি আমি অতিশয় বাধ্য বোধ করিব, আপনি যদি দয়ালুরূপে আমাকে একটি বিষয় বুঝাইয়া দেন।

হনূ। কি বিষয়, হে বিদ্বন্ ?

বাবু। সেই বিষয়, হনুমন্, যাহার অনুরোধে আপনার এখানে আসিয়াছি। আপনি রামরাজ্য দেখিয়াছেন। রামরাজ্যের মত রাজ্য নাকি কখন হয় নাই—কেহ কেহ বলেন, সে সকল গল্প মাত্র, fable—

হনূ। (চক্ষু, আরক্ত, এবং দ্রংষ্ট্রা বিমুক্ত) রামরাজ্য গল্প ! বেটা, তবে আমিও গল্প ? তবে আমার এ লাঙ্গুলও একটা গল্প ? দেখ্, তবে কেমন গল্প !

এই বলিয়া মহাক্রোধে হনুমান্ সেই অনন্ত কুণ্ডলীকৃত মহালাঙ্গুল আবার বাবু বেচারার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তখন বাবু বিশুষ্কবদনে বলিলেন, "থাম থাম, হে মহালাঙ্গুল, তুমিও গল্প নও—তোমার লাঙ্গুল ত নহেই—সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি। কাজে কাজেই তোমার রামরাজ্যও গল্প নহে—The proof of the pudding is in the eating thereof—কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড় ? আমার ইংরেজ রাজ্যে একটা নূতন জিনিস হইতেছে—তোমার রামরাজ্যে তা ছিল কি ?

হনু। জিনিসটা কি ? সুপক্ক কদলী ?

বাবু। তা না। Local self-government.

হনু। সে কি ?

বাবু। স্থানীয় আত্মশাসন। ছিল তোমাদের ?

হনু। ছিল না ত কি ? স্থানীয় আত্মশাসন ত স্থানবিশেষে আত্মশাসন ; তাহা আমরা সর্ব্বদাই করিতাম। আমার আত্মশাসন ছিল লাঙ্গুলে। লাঙ্গুলে আমি আত্মশাসন না করিলে ত্রেতাযুগের অর্দ্ধেক লোক সমুদ্রে চুবানি খেয়ে মরিত। যখনই আমার লেজ সড়্ সড়্ করিত, ইচ্ছা হইত অমুকের গলায় দিই ; তখনই আমি লাঙ্গুল স্থানে আত্মশাসন করিতাম—লেজটাকে পদদ্বয়মধ্যে লুক্কায়িত করিতাম। এমন কি, যে দিন স্বয়ং রামচন্দ্র সীতা দেবীকে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বলেন, সে দিন আমার এই স্থানীয় আত্মশাসন না থাকিলে—এই লাঙ্গুল রামচন্দ্রের গলাতেই যাইত—আমার স্থানীয় আত্মশাসনগুণে লেজ পদদ্বয়মধ্যে বিন্যস্ত হইল। আরও আমরা যখন লঙ্কা অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখন আহারাভাবে আমাদের সকলেরই আত্মশাসন উদরে নিহিত হইয়া সে অঞ্চলে স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

বাবু। মহাশয়ের বুঝিবার ভুল হইতেছে—সেরূপ আত্মশাসনের কথা বলিতেছি না।

হনু। শোনই না, স্থানীয় আত্মশাসন বড় ভাল। যথা—স্ত্রীলোকের আত্মশাসন রসনায় হইলে উত্তমস্থানীয় আত্মশাসন হইল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আত্মশাসন শুনিয়াছি না কি ছানা সন্দেশের হাঁড়িতে স্থানীয় হইলেই বড় ভাল হয়। তোমাদের আত্মশাসন—

বাবু। কোথায় ? পৃষ্ঠে ?

হনু। না। তোমাদের পৃষ্ঠ শাসনান্তরের ক্ষেত্র বটে—কিন্তু তোমাদের আত্ম-শাসনের যথার্থ ক্ষেত্র তোমাদের চক্ষু দুইটি।

বাবু। সে কি রকম ?

হনু। তোমাদের কান্না পাইলেও তোমরা কাঁদ না। সে ভাল। রাত্রিদিন ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করিলে, প্রভুগণ জ্বালাতন হইবার সম্ভাবনা।

বাবু। সে যাহাই হউক, আমি সে অর্থে স্থানীয় আত্মশাসনের কথা বলিতে-ছিলাম না।

হনু। তবে কি অর্থে ?

বাবু। শাসন কাহাকে বলে, জানেন ত ?

হনু। অবশ্য। তোমাকে চড় মারিলে তুমি শাসিত হইলে। এই ত শাসন ?

বাবু। তা নয়, রাজশাসন জানেন না ?

হনূ। তা জানি। কিন্তু সে অর্থে, তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে?

বাবু। (স্বগত) একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি! (প্রকাশ্যে) যদি রাজা দয়া করিয়া আপনার কাজ আমাদের কিছু ছাড়িয়া দেন?

হনূ। তা হলে সে রাজারই লাভ। তিনি আপনার কাজ পরের ঘাড়ে দিয়া পাটরাণী নিয়ে রঙ্গ করুন, আর আমরা তাঁর খাটুনি খেটে মরি! এই বুঝি তোমাদের রামরাজ্য? হা রাম!

বাবু। কথাটা এখনও আপনার বোঝা হয় নাই। Freedom—liberty কাহাকে বলে জানেন?

হনূ। কিষ্কিন্ধ্যার কলেজে ওসব শেখায় না।

বাবু। Freedom বলে স্বাধীনতাকে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানেন ত?

হনূ। আমি বনের পশু, স্বাধীনতা জানি না ত কি তুমি জান?

বাবু। ভাল। তা যে পরিমাণে মনুষ্য স্বাধীন হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

হনূ। অর্থাৎ যে পরিমাণে মনুষ্য পশুভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই পরিমাণে মনুষ্য সুখী।

বাবু। মহাশয়! রাগ করিবেন না। কিন্তু এ কথাগুলা নিতান্ত হনূমানের মত হইতেছে।

হনূ। আমি ত তাহাই, বাবুর মত কথাগুলি কি শুনি।

বাবু। স্বাধীনতাশূন্য মনুষ্যজন্মই পশুজন্ম। পরাধীনেরা গো মহিষাদির ন্যায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন—**free-born.**

হনূ। আমাদের মত।

বাবু। আত্মশাসন সেই স্বাধীনের লক্ষণ।

হনূ। আমরাও সেই লক্ষণবিশিষ্ট। আমাদের মধ্যে আত্মশাসন ভিন্ন রাজশাসন নাই। আমরা পৃথিবীমধ্যে স্বাধীন জাতি। তোমরা কি আমাদের মত হইতে চাও?

বাবু। ছি! ছি! বুঝিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।

হনূ। ঠিক কথা ভাই! আইস, দুই জনে কদলী ভোজন করি।

গ্রাম্যকথা

প্রথম সংখ্যা—পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি ছাতি মাথায়, গ্রাম্য পথ দিয়া হাঁটিতেছি। বৃষ্টিটা একটু চাপিয়া আসিল। তখন পথের ধারে একখানা আটচালা দেখিয়া, তাহার পরচালার নীচে আশ্রয় লইলাম। দেখিলাম, ভিতরে কতকগুলি ছেলে বই হাতে বসিয়া পড়িতেছে। একজন পণ্ডিত মহাশয় বাঙ্গালা পড়াইতেছেন। কাণ পাতিয়া একটু পড়ানটা শুনিলাম। দেখিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাকরণের উপর বড় অনুরাগ। একটু উদাহরণ দিতেছি। পণ্ডিত মহাশয় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে কি হয়?"

ছাত্রটি কিছু মোটা-বুদ্ধি, নাম শুনিলাম, "ভোঁদা।" ভোঁদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আজ্ঞা, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে ভুক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয়, ছাত্রের মূর্খতা দেখিয়া চটিয়া উঠিলেন এবং তাহাকে "মূর্খ! "গর্দ্দভ!" প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত বাক্যে অসংস্কৃত করিলেন। ছাত্রও কিছু গরম হইয়া উঠিল, বলিল, "কেন পণ্ডিত মহাশয়! ভুক্ত শব্দ কি নাই?"

পণ্ডিত। থাকিবে না কেন? ভুক্ত কিসে হয়, তা কি জানিস্ না?

ছাত্র। তা জানিব না কেন? ভাল করিয়া চিবিয়া গিলিয়া ফেলিলেই ভুক্ত হয়।

পণ্ডিত। বেল্লিক! বানর! তাই কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?

তখন ভোঁদার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ছাত্র রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, রাম, তুমিই বল দেখি, ভুক্ত শব্দ কি প্রকারে হয়?

রাম বলিল, "আজ্ঞা, ভুজ ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া ভুক্ত হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় ভোঁদাকে বলিলেন, "শুন্‌লি রে ভোঁদা? তোর কিছু হবে না।"

ভোঁদা রাগিয়া বলিল, "না হয় না হোক্—আপনার যেমন পক্ষপাত!"

পণ্ডিত। পক্ষপাত আবার কি রে, হনূমান্!

ভোঁদা। ওর কপালে "ভুজো", আমার কপালে "ভূ"?

ছাত্র যে সুচর্ব্বণীয় "ভুজো" এবং অদৃষ্টের তারতম্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন না। রাগ করিয়া ভোঁদাকে এক ঘা প্রহার করিলেন, এবং আদেশ করিলেন, "এখন বল্, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি হয়?"

ভোঁদা। (চোখে জল) আজ্ঞে, তা জানি না।

পণ্ডিত। জানিস্ নে? ভূত কিসে হয়, জানিস্ নে?

ভোঁদা। আজ্ঞে তা জানি। মলেই ভূত হয়।

পণ্ডিত। শূওর! গাধা! ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত ক'রে ভূত হয়।

ভোঁদা এতক্ষণে বুঝিল। মনে মনে স্থির করিল, মরিলেও যা হয়, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলেও তা হয়। তখন সে বিনীতভাবে পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে, ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত করিলে কি শ্রাদ্ধ করিতে হয়?"

পণ্ডিত মহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরাশী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন। ছাত্র পুস্তকাদি ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া আসিয়াছিল, রঙ্গ দেখিবার জন্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। ভোঁদার মাতার গৃহ বিদ্যালয় হইতে বড় বেশী দূর নয়। ভোঁদা গৃহপ্রবেশ-কালে কান্নার স্বর দ্বিগুণ বাড়াইল, এবং আছাড়িয়া পড়িল। দেখিয়া ভোঁদার মা তার কাছে এসে সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে, বাবা?"

ছেলে মাকে ভেঙ্গাইয়া বলিল, "এখন কি হয়েছে, বাবা! এমন ইস্কুলে আমায় পাঠাইয়েছিলি কেন পোড়ারমুখী?"

মা। কেন, কি হয়েছে, বাবা?

ছেলে। পোড়ারমুখী এখন বলেন, কি হয়েছে, বাবা! শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক। শিগ্‌গির হোক! আমি তোর শ্রাদ্ধ করি।

মা। সে আবার কি বাপ! কাকে বলে?

ছেলে। শিগ্‌গির তোর ভূ ধাতুর পর ক্ত হোক! শিগ্‌গির হোক।

মা। সে কি মরাকে বলে বাপ?

ছেলে। তা না ত কি? আমি তাই বলতে পারি নাই ব'লে পণ্ডিত মশাই আমায় মেরেছে।

মা। অধঃপেতে মিন্‌সে! আক্কেল নেই! আমার এই এক রত্তি ছেলের আর কত বিদ্যা হবে! যে কথা কেউ জানে না, তাই বল্‌তে পারে নি ব'লে ছেলেকে মারে! আজ মিন্‌সেকে আমি একবার দেখ্‌বো।

এই বলিয়া গাছকোমর বাঁধিয়া ভোঁদার মাতা পণ্ডিত মহাশয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় চলিলেন। আমিও পিছু পিছু চলিলাম। সেই সুপুত্রবতীকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তখন পাঠশালা বন্ধ হইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যেই উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তখন ভোঁদার মা বলিল, "হ্যাঁ গা পণ্ডিত মহাশয়, যা কেউ জানে না, আমার ছেলে তাই বল্‌তে পারে নি ব'লে কি এমনি মার মার্‌তে হয়?"

পণ্ডিত। ও গো, এমন কিছু শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভূত কেমন ক'রে হয়।

ভোঁদার মা। ভূত হয় গঙ্গা না পেলেই। তা ও সব কথা ও ছেলেমানুষ কেমন ক'রে জান্‌বে গা? ও সব কথা আমাদের জিজ্ঞাসা কর।

পণ্ডিত। ও গো, সে ভূত নয় গো।

ভোঁদার মা। তবে কি গোভূত?

পণ্ডিত। সে সব কিছু নয় গো, তুমি মেয়েমানুষ কি বুঝবে? বলি, একটা ভূত শব্দ আছে।

ভোঁদার মা। ভূতের শব্দ আমি অমন কত শুনেছি। তা ও ছেলেমানুষ, ওকে কি ও সব কথা ব'লে ভয় দেখাতে আছে?

আমি দেখিলাম যে, এ পণ্ডিতে পণ্ডিতে সমস্যা, শীঘ্র মিটিবে না। আমি এ রঙ্গের অংশ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইয়া পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, "মহাশয়, ও স্ত্রীলোক, ওর সঙ্গে বিচার ছেড়ে দিন। আমার সঙ্গে বরং এ বিষয়ের কিছু বিচার করুন।"

পণ্ডিত মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, একটু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, "আপনি প্রশ্ন করুন।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, ভূত ভূত করিতেছেন, বলুন দেখি ভূত কয়টি?"

পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। পণ্ডিতে পণ্ডিতের মতই কথা কয়। শুন্‌লি মাগী?" তার পর আমার দিকে ফিরিয়া, এমনই মুখখানা করিলেন, যেন বিদ্যার বোঝা নামাইতেছেন। বলিলেন, "ভূত পাঁচটি।"

তখন ভোঁদার মা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "তবে রে মিন্‌সে? তুই এই বিদ্যায় আমার ছেলে মারিস্! ভূত পাঁচটা! পাঁচ ভূত, না বারো ভূত?"

পণ্ডিত। সে কি, বাছা! ও ঠাকুরটিকে জিজ্ঞাসা কর, ভূত পঞ্চ। ক্ষিত্যপ্—

ভোঁদার মা। বারো ভূত নয় ত আমার এতটা বিষয় খেলে কে? আমি কি এমনই দুঃখী ছিলাম?

ভোঁদার মা তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন তাহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলাম, "উনি যা বলিলেন, তা হতে পারে। অনেক সময়েই শুনা যায়, অনেকের

বিষয় লইয়া ভূতগণ আপনাদিগের পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করে। কখন শোনেন নাই, অমুকের টাকাটায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে ?”

কথাটা শুনিয়া, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, কি সত্য বলিতেছি। কেন না, বুদ্ধিটা কিছু স্থূল। তাঁকে একটু ভেকাপানা দেখিয়া আমি বলিলাম, “মহাশয়, এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ ত সকলই অবগত আছেন। মনু বলিয়াছেন,—

“কৃপণানাং ধনঞ্চৈব পোষ্যকুষ্মাণ্ডপালিনাম্।
ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ॥”*

পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃতজ্ঞান ঐ ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত পর্যন্ত। কিন্তু এ দিকে বড় ভয়, পাছে সেই শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে, বিশেষতঃ ভোঁদার মার সম্মুখে আমার কাছে পরাস্ত হয়েন—অতএব যেমন শুনিলেন, “ভূতানাং পিতৃশ্রাদ্ধেষু ভবেন্নষ্টং ন সংশয়ঃ।” অমনই উত্তর করিলেন, “মহাশয়, যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। বেদেই ত আছে,—

“অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ”

শুনিয়া ভোঁদার মা বড় তৃপ্ত হইল। এবং পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিল, “তা, বাবা! তোমার এত বিদ্যা, তবু আমার ছেলে মার কেন ?”

পণ্ডিত। আরে বেটি, তোর ছেলেকে এমনই বিদ্বান্ করিব বলিয়াই ত মারি! না মারিলে কি বিদ্যা হয় ?

ভোঁদার মা। বাবা! মারিলে যদি বিদ্যা হয়, তবে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তাটির কিছু হলো না কেন ? ঝাঁটায় বল, কোঁস্তায় বল, আমি ত কিছুতেই কসুর করি না।

পণ্ডিত। বাছা! ও সব কি তোমাদের হাতে হয় ? ও আমাদের হাতে।

ভোঁদার মা। বাবা! আমাদের হাতে কিছুই জোরের কসুর নাই। দেখিবে ?

এই বলিয়া ভোঁদার মা একগাছা বাঁকারি কুড়াইয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয়, এইরূপ হঠাৎ অধিক বিদ্যালাভের সম্ভাবনা দেখিয়া সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, সেই অবধি পণ্ডিত মহাশয়, আর ভোঁদাকে কিছু বলেন নাই। ভূ ধাতু লইয়া পাঠশালায় আর গোলযোগ হয় নাই। ভোঁদা বলে, “মা, এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।”

দ্বিতীয় সংখ্যা—ধর্ম্ম-শিক্ষা

I. THEORY

“পড় বাবা, মাতৃবৎ পরদারেষু।”

ছেলে। সে কাকে বলে, বাবা ?

বাপ। এই যত স্ত্রীলোক, পরের স্ত্রী, সবাইকে আপনার মা মনে করিতে হয়।

ছেলে। তারা সবাই আমার মা ?

বাপ। হাঁ বাবা, তা বৈ কি।

* অস্যার্থ। কৃপণদিগের ধন আর যাঁহারা পোষ্যপুত্ররূপ কুষ্মাণ্ডগুলি প্রতিপালন করেন, তাঁহাদিগের ধন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

ছেলে। বাবা, তবে তোমার বড় জ্বালা হলো। আমার মা হ'লে তারা তোমার কে হ'লো বাবা ?

বাপ। ছি! ছি! ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! পড়,

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।"

ছেলে। অর্থ কি হলো, বাবা ?

বাপ। পরের সামগ্রীকে লোষ্ট্রের মত দেখ্‌বে।

ছেলে। লোষ্ট্র কি ?

বাপ। মাটির ঢেলা।

ছেলে। বাবা, তবে ময়রা বেটাকে আর সন্দেশের দাম না দিলেও হয়—মাটির ঢেলার আর দাম কি ?

বাপ। তা নয়। পরের সামগ্রী মাটির মত দেখ্‌বে—নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।

ছেলে। বাবা, কুমারের ব্যবসা শিখ্‌লে হয় না ?

বাপ। ছি বাবা! তোমার কিছু হবে না দেখ্‌ছি। এখন পড়,

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥"

ছেলে। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কি, বাবা ?

বাপ। এই আপনার মত সকলকেই দেখ্‌বে।

ছেলে। তা হলেই ত হলো। যদি পরকে আপনার মত ভাবি, তা হ'লে পরের সামগ্রীকে আপনারই সামগ্রী ভাব্‌তে হবে, আর পরের স্ত্রীকেও আপনার স্ত্রী ভাব্‌তে হবে।

বাপ। দূর হ! পাজি বেটা, ছুঁচো বেটা। (ইতি চপেটাঘাত)

II. PRACTICE

(১)

কাদম্বিনী নামে কোন প্রৌঢ়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে। তখন অধীত-শাস্ত্র সেই বালক, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ছেলে। বলি, মা!

কাদম্বিনী। কেন, বাছা! আহা, ছেলেটির কি মিষ্ট কথা গো! শুনে কান জুড়ায়।

ছেলে। মা, সন্দেশ খেতে একটি পয়সা দে না মা!

কাদম্বিনী। বাবা, আমি দুঃখী মানুষ, পয়সা কোথা পাব, বাবা ?

ছেলে। দিবিনে বেটি ? মুখপুড়ি! হতভাগি! আঁটকুড়ি!

কাদ। আ মলো! কাদের এমন পোড়ারমুখো ছেলে!

ছেলে। দিবিনে বেটি, (ইতি প্রহার এবং কলসী-ধ্বংস)

(পরে ছেলের বাপ সেই রঙ্গভূমে উপস্থিত)

বাপ। এ কি, রে বাঁদর ?

ছেলে। কেন, বাবা! এ যে আমার মা। মার সঙ্গে যেমন করি, ওর সঙ্গেও তেমনি করেছি—"মাতৃবৎ পরদারেষু।" কই মাগি, বাবাকে দেখে তুই ঘোমটা দিলি নে?

(২)

ময়রা আসিয়া ছেলের বাপের কাছে নালিশ করিল যে, ছেলের জ্বালায় আর দোকান করা ভার, ছেলে দোকান লুঠ করিয়া সকল মিঠাই মণ্ডা লইয়া আসে। গোয়ালা আসিয়া ক্ষীর ছানা সম্বন্ধে সেইরূপ নালিশ করিল।

বাপ তখন ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার আরম্ভ করিলেন। ছেলে বলিল, "মার কেন বাবা?"

বাপ। মারব না? তুই পরের দ্রব্য সামগ্রী লুটে পুটে আনিস্।

ছেলে। বাবা, চোরের ভয় হয়েছে, তাই ঢিল কুড়িয়ে জমা করেছি—পরের সামগ্রী ত ঢিল।

(৩)

সরস্বতীপূজা উপস্থিত। বাপ প্রাতঃকালে ছেলেকে বলিলেন, "যা, একটা ডুব দিয়ে এসে অঞ্জলি দে—নহিলে খেতে পাবিনে।"

ছেলে। খেয়ে দেয়ে বিকেলে কি অঞ্জলি দিলে হয় না?

বাপ। তাও কি হয়? খেয়ে কি অঞ্জলি দেওয়া হয়, রে পাগল?

ছেলে। তবে এ বছরের অঞ্জলি আর বছরে একেবারে দিলে হয় না? এবার বড় শীত।

বাপ। তা হয় না—সরস্বতীকে অঞ্জলি না দিলে কি বিদ্যা হয়?

ছেলে। একটা বছর কি ধারে বিদ্যা হয় না?

বাপ। দূর, মূর্খ! যা, ডুব দিয়ে আস্‌গে যা। অঞ্জলি দেওয়া হ'লে দুটো ভাল সন্দেশ দেব এখন।

"আচ্ছা" বলিয়া ছেলে নাচিতে নাচিতে ডুব দিতে গেল। বড় শীত—তেমনি বাতাস—জল কনকনে। তখন ছেলে ভাবিয়া চিন্তিয়া, ঘাটে একটা পাঁচ বছরের বাগ্দীর ছেলে রহিয়াছে দেখিয়া, তাহাকে ধরিয়া, গোটা দুই চুবানি দিল। তার পর তাকে জল হইতে তুলিয়া টানিয়া বাপের কাছে ধরিয়া আনিল। বলিল, "বাবা! নেয়ে এসেছি।"

বাপ। কই বাপু,—কই নেয়েছ?

ছেলে। এই যে বাগ্দী ছোঁড়াটাকে চুবিয়ে এনেছি।

বাপ। বড় কাজই করেছ—তুই নেয়ে এসেছিস্ কই?

ছেলে। বাবা, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"—ওতে আমাতে কি তফাৎ আছে? ওর নাওয়াতে আমার নাওয়া হয়েছে। এখন সন্দেশ দাও।

পিতা বেত্রহস্তে পুত্রের পিছু পিছু ছুটিলেন। পুত্র পলাইতে পলাইতে বলিতে লাগিল, "বাবা শাস্ত্র জানে না।"

কিছু পরে সেই সুশিক্ষিত বালকের পিতা শুনিলেন যে, সে ওপাড়ায় শিরোমণি ঠাকুরের টোলে গিয়া শিরোমণি ঠাকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে। ছেলে ঘরে এলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার এ কি করেছিস ?"

ছেলে। কি করি বাবা! তুমি ত ছাড়বে না—বেত মারিবেই মারিবে। তাই আপনা আপনি সেই বেত খেয়েছি।

পিতা। সে কি রে বেটা?—আপনা আপনি কি? শিরোমণি ঠাকুরকে মেরেছিস্ যে?

ছেলে। বাবা—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—শিরোমণি ঠাকুরে আর আমাতে কি আমি তফাৎ দেখি?

পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছেলেকে আর লেখাপড়া শিখাইবেন না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর

DRAMATIS PERSONÆ

১। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু।

২। তস্য ভার্য্যা।

উচ্চশিক্ষিত। কি হয়?

ভার্য্যা। পড়ি শুনি।

উচ্চ। কি পড়?

ভার্য্যা। যা পড়িতে জানি। আমি তোমার ইংরাজিও জানি না, ফরাশীও জানি না, ভাগ্যে যা আছে, তাই পড়ি।

উচ্চ। ছাই ভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন? ওর চেয়ে না পড়া ভাল যে।

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। ওগুলো সব immoral, obscene, filthy.

ভার্য্যা। সে সব কাকে বলে?

উচ্চ। Immoral কাকে বলে জান—এই ইয়ে হয়—অর্থাৎ যা morality-র বিরুদ্ধ।

ভার্য্যা। সেটা কি চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ?

উচ্চ। না না—এই কি জান—ওর আর বাঙ্গলা কোথা পাব? এই যা moral নয়—তাই আর কি।

ভার্য্যা। মরাল কি? রাজহংস?

উচ্চ। ছি! ছি! O woman! thy name is stupidity.

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। বাঙ্গলা কথায় ত আর অত বুঝান যায় না—তবে আসল কথাটা এই যে, বাঙ্গলা বই পড়া ভাল নয়।

ভার্য্যা। তা, এই বইখানা নিতান্ত মন্দ নয়—গল্পটা বেশ।

উচ্চ। এক রাজা আর দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর গল্প? না নল-দময়ন্তীর গল্প?

ভার্য্যা। তা ছাড়া আর কি গল্প হ'তে নেই?

উচ্চ। তা ছাড়া তোমার বাঙ্গলায় আর কিছু আছে না কি?

ভার্য্যা। এটা তা নয়। এতে কাট্‌লেট্‌ আছে, ব্রাণ্ডি আছে, বিধবার বিবাহ আছে—বৈষ্ণবীর গীত আছে।

উচ্চ। Exactly. তাই ত বলছিলাম, ও ছাই ভস্মগুলো পড় কেন?

ভার্য্যা। কেন, পড়িলে কি হয়?

উচ্চ। পড়িলে demoralize হয়।

ভার্য্যা। সে আবার কি? ধেমোরাজা হয়?

উচ্চ। এমন পাপও আছে! Demoralize কি না—চরিত্র মন্দ হয়।

ভার্য্যা। স্বামী মহাশয়! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ও কাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুবর্গ ডিনরের পর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কন—শুনিতে পাইলে খানসামারাও কাণে আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মাটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে, তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই,—আর আমি গরিবের মেয়ে, একখানা বাঙ্গলা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?

উচ্চ। আমরা হলেম Brass pot; তোমরা হলে Earthen pot.

ভার্য্যা। অত পট পট কর কেন? কইমাছ চাঁকা তেলে পড়েছ নাকি? তা যা হোক, একবার এই বইখানা একটু পড় না।

উচ্চ। (শিহরিয়া ও পিছাইয়া) আমি ও সব ছুঁয়ে hand contaminate করি না।

ভার্য্যা। কাকে বলে?

উচ্চ। ও সব ছুঁয়ে হাত ময়লা করি না।

ভার্য্যা। তোমার হাত ময়লা হবে না, আমি ঝাড়িয়া দিতেছি।

(ইতি পুস্তকখানি আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান। মানসিক ময়লা ভয়ে ভীত উচ্চশিক্ষিতের হস্ত হইতে পুস্তকের ভূমে পতন।)

ভার্য্যা। ও কপাল! আচ্ছা, তুমি যে বইখানাকে অত ঘৃণা করচো, কই—তোমার ইংরেজেরাও তত করে না। ইংরেজেরা নাকি এই বইখানা তরজমা করিয়া পড়িতেছে।

উচ্চ। ক্ষেপেছ?

ভার্য্যা। কেন?

উচ্চ। বাঙ্গলা বই ইংরেজিতে তরজমা? এমন আষাঢ়ে গল্প তোমায় কে শোনায়? বইখানা Seditious ত নয়? তা হলে government তরজমা করান সম্ভব। কি বই ওখানা?

ভার্য্যা। বিষবৃক্ষ।

উচ্চ। সে কাকে বলে?

ভার্য্যা। বিষ কাহাকে বলে জান না? তারই বৃক্ষ।

উচ্চ। বিষ—এক কুড়ি।

ভার্য্যা। তা নয়—আর এক রকমের বিষ আছে জান না? যা তোমার জ্বালায় আমি একদিন খাব।

উচ্চ। ওহো! Poison! Dear me! তারই গাছ—উপযুক্ত নাম বটে—ফেল! ফেল!

ভার্য্যা। এখন, গাছের ইংরেজি কি বল দেখি?

উচ্চ। Tree.

ভার্য্যা। এখন দুটো কথা এক কর দেখি?

উচ্চ। Poison Tree! ওহো! বটে বটে! Poison Tree বলিয়া একখান ইংরেজি বইয়ের কথা কাগজে পড়িতেছিলাম বটে। তা সেখানা কি বাঙ্গলা বইয়ের তরজমা?

ভার্য্যা। তোমার বোধ হয় কি?

উচ্চ। আমার Idea ছিল যে, Poison Tree একখানা ইংরেজি বই, তারই বাঙ্গলা তরজমা হয়েছে। তা যখন ইংরেজি আছে, তখন আর বাঙ্গলা পড়বো কেন?

ভার্য্যা। পড়াটা ইংরেজি রকমেই ভাল—তা কেতাব নিয়েই হোক, আর গেলাস নিয়েই হোক। তা তোমাকে ইংরেজি রকমেই পড়িতে দিতেছি। এই বইখানা দেখ দেখি। এখানা ইংরেজির তরজমা—লেখক নিজে বলিয়াছেন।

উচ্চ। ও সব বরং পড়া ভাল। কি ইংরেজি বইয়ের তরজমা—Robinson Crusoe না Watt on the Improvement of the Mind?

ভার্য্যা। ইংরেজি নাম আমি জানি না। বাঙ্গলা নাম ছায়াময়ী।

উচ্চ। ছায়াময়ী? সে আবার কি? দেখি (পুস্তক হস্তে লইয়া) Dante, by Jove.

ভার্য্যা। (টিপি টিপি হাসিয়া) তা ওখানা ভাল বুঝিতে পারি না—পোড়া বাঙ্গালির মেয়ে, ইংরেজির তরজমা বুঝি এত বুদ্ধি ত রাখিনে—ওটা তুমি আমায় বুঝিয়ে দেবে?

উচ্চ। তার আর আশ্চর্য্য কি? Dante lived in the fourteenth century. অর্থাৎ তিনি fourteenth century-তে flourish করেন।

ভার্য্যা। ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করেন? এত বড় কবি?

উচ্চ। কি পাপ! fourteen মানে চৌদ্দ।

ভার্য্যা। চৌদ্দ সুন্দরীকে পালিশ করেন? তা চোদ্দই হোক, আর পনেরই হোক, সুন্দরীকে আবার পালিশ করা কেন?

উচ্চ। বলি চোদ্দ সেঞ্চুরিতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভার্য্যা। তিনি চোদ্দ সুন্দরীতে বর্ত্তমান থাকুন আর চোদ্দ শ সুন্দরীতেই বর্ত্তমান থাকুন, বইখানা নিয়ে কথা।

উচ্চ। আগে অথরের লাইফটা জানতে হয়। তিনি Florence নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখানে বড় বড় appointment hold করিতেন।

ভার্য্যা। পোর্টম্যান্টো হলদে করিতেন। আমাদের এই কালো পোর্টম্যান্টোটা হলদে হয় না?

উচ্চ। বলি বড় বড চাকরি করিতেন। পরে Guelph ও Ghibillineদিগের বিবাদে—

ভার্য্যা। আর হাড় জ্বালিও না। বইখানা একটু বুঝাও না।

উচ্চ। তাই বুঝাইতেছিলাম। অথরেব লাইফ না জানিলে বই বুঝিবে কি প্রকারে?

ভার্য্যা। আমি দুঃখী বাঙ্গালির মেয়ে, আমার অত ঘটায় কাজ কি? বইখানার মর্ম্মটা বুঝাইয়া দাও না।

উচ্চ। দেখি, বইখানা কি রকম লিখেছে দেখি।

(পরে পুস্তক গ্রহণ করিয়া প্রথম ছত্র পাঠ)

"সন্ধ্যা গগনে নিবিড কালিমা"

তোমার কাছে অভিধান আছে?

ভার্য্যা। কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল?

উচ্চ। গগন কাকে বলে?

ভার্য্যা। গগন বলে আকাশকে।

উচ্চ। "সন্ধ্যা গগনে নিবিড কালিমা"—নিবিড কাকে বলে?

ভার্য্যা। ও হবি! এই বিদ্যাতে তুমি আমাকে শিখাবে? নিবিড বলে ঘনকে। এও জান না? তোমাব মুখ দেখাতে লজ্জা করে না?

উচ্চ। কি জান—বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদেব শোভা পায়?

ভার্য্যা। কেন, তোমরা কি?

উচ্চ। আমাদের হলো polished society—ও সব বাজে লোকে লেখে—বাজে লোকে পড়ে—সাহেব লোকের কাছে ও সবের দর নেই—polished societyতে কি ও সব চলে?

ভার্য্যা। তা মাতৃভাষার উপর পালিশ-ষষ্ঠীর এত রাগ কেন?

উচ্চ। আরে, মা মরে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন আর সম্পর্ক কি?

ভার্য্যা। আমারও ত ঐ ভাষা—আমি ত মরে ছাই হই নাই।

উচ্চ। Yes for *thy* sake, my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গলা বই পড়িব। কিন্তু mind একখানা বৈ আর নয়!

ভার্য্যা। তাই মন্দ কি?

উচ্চ। কিন্তু এই ঘরে দ্বার দিয়ে পড়্‌ব—কেহ না টের পায়।

ভার্য্যা। আচ্ছা তাই।

(বাছিয়া বাছিয়া একখানি অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নীতিপূর্ণ অথচ সরস পুস্তক স্বামীর হস্তে প্রদান। স্বামীর তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ সমাপন।)

ভার্য্যা। কেমন বই?

উচ্চ। বেড়ে। বাঙ্গলায় যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না।

ভার্য্যা। (ঘৃণার সহিত) ছি! এই বুঝি তোমার পালিশ-ষষ্ঠী? তোমার পালিশ-ষষ্ঠীর চেয়ে আমার চাপড়া-ষষ্ঠী, শীতল-ষষ্ঠী অনেক ভাল।

NEW YEAR'S DAY

DRAMATIS PERSONÆ

রামবাবু
শ্যামবাবু
রামবাবুর স্ত্রী (পাড়াগেঁয়ে মেয়ে)

রামবাবু ও শ্যামবাবুর প্রবেশ (রামবাবুর স্ত্রী অন্তরালে)

শ্যামবাবু। গুড্ মর্ণিং রামবাবু—হা ডু ডু ?

রামবাবু। গুড্ মর্ণিং শ্যামবাবু—হা ডু ডু। [উভয়ে প্রগাঢ় করমর্দ্দন]

শ্যামবাবু। I wish you a happy new year, and many many returns of the same.

রামবাবু। The same to you.

[শ্যামবাবুর তথাবিধ কথাবার্ত্তার জন্য অন্যত্র প্রস্থান। ও রামবাবুর অন্তঃপুর প্রবেশ]

রামবাবুর স্ত্রী। ও কে এসেছিল ?

রামবাবু। ঐ ও বাড়ীর শ্যামবাবু।

স্ত্রী। তা, তোমাদের হাতাহাতি হচ্ছিল কেন ?

রামবাবু। সে কি ? হাতাহাতি কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে তুমি তার হাত ধরে ঝেঁকুরে দিলে, সে তোমার হাত ধরে ঝেঁকুরে দিলে ? তোমার লাগে নি ত ?

রাম। তাই হাতাহাতি ! কি পাপ ! ওকে বলে shaking hands. ওটা আদরের চিহ্ন।

স্ত্রী। বটে ! ভাগ্যে আমি তোমার আদরের পরিবার নই ! তা, তোমার লাগেনি ত ?

রাম। একটু নোক্‌সা লেগেছে ; তা কি ধর্‌তে আছে ?

স্ত্রী। আহা, তাই ত ! ছ'ড়ে গেছে যে ? অধঃপেতে ড্যাকরা মিন্‌সে ! সকাল বেলা মর্‌তে আমার বাড়ীতে হাত কাড়াকাড়ি করতে এয়েছেন। আবার নাকি হুটোহুটি খেলা হবে ? অধঃপেতে মিন্‌সের সঙ্গে ও সব খেলা খেলিতে পাবে না।

রাম। সে কি ? খেলার কথা কখন হ'লো ?

স্ত্রী। ঐ যে সেও ব'ল্লে, "হাঁডু ডু ডু !" তুমিও ব'ল্লে, "হাঁডু ডু ডু !" তা, হাঁ ডু ডু ডু খেলবার কি আর তোমাদের বয়স আছে ?

রাম। আঃ, পাড়াগেঁয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল ! ওগো, হাঁ ডু ডু ডু নয় ; হা ডু ডু—অর্থাৎ How do ye do ? উচ্চারণ করিতে হয়, "হা ডু ডু !"

স্ত্রী। তার অর্থ কি ?

রাম। তার মানে, "তুমি কেমন আছ ?"

স্ত্রী। তা কেমন ক'রে হবে ? সে তোমায় জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন আছ, তুমি ত কৈ তার কোন উত্তর দিলে না,—তুমি সেই কথাই পালটিয়া বলিলে !

রাম। সেইটাই হইতেছে এখনকার সভ্য রীতি।

স্ত্রী। পালটে বলাই সভ্য রীতি ? তুমি যদি আমার ছেলেকে বল, "লেখাপড় করিস্‌নে কেন রে ছুঁচো ?" সেও কি তোমাকে পাল্‌টে বলবে, "লেখাপড়া করিস্‌নে কেন রে ছুঁচো ?" এইটা সভ্য রীতি ?

রাম। তা নয় গো তা নয়। কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর না দিয় পাল্‌টে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কেমন আছ। এইটা সভ্য রীতি।

স্ত্রী। (যোড়হাতে) আমার একটি ভিক্ষা আছে। তোমার দু বেলা অসুখ— আমায় দিনে পাঁচ বার তোমার কাছে খবর নিতে হয়, তুমি কেমন আছ ; আমায় যে তখন হা ডু ডু বলিয়া তাড়াইয়া দিও না। আমার কাছে সভ্য নাই হইলে।

রাম। না, না, তাও কি হয় ? তবে এ সব তোমার জেনে রাখা ভাল।

স্ত্রী। তা ব'লে দিলেই জান্‌তে পারি। বুঝিয়ে দাও না ? আচ্ছা, শ্যামবাবু এলো আর কি কিচিরমিচির ক'রে ব'ল্লে আর চলে গেল ; যদি হাঁ ডু ডু খেলার কথা বল্‌তে আসেনি, তবে কি করতে এসেছিল ?

রাম। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন, তাই সম্বৎসরের আশির্ব্বাদ করতে এয়েছিল

স্ত্রী। আজ নূতন বৎসরের প্রথম দিন ? আমার শ্বশুর শাশুড়ী ত ১লা বৈশাখ থেকে নূতন বৎসর ধরিতেন।

রাম। আজ ১লা জানুয়ারী—আমরা আজ থেকে নূতন বৎসর ধরি।

স্ত্রী। শ্বশুর ধরিতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১লা শ্রাবণ থেকে ?

রাম। তাও কি হয় ? এ যে ইংরেজের মুলুক—এখন ইংরেজি নূতন বৎসরে আমাদের নূতন বৎসর ধরিতে হয়।

স্ত্রী। তা, ভালই ত। তা, নূতন বৎসর ব'লে এতগুলো মদের বোতল আনিয়েছ কেন ?

রামবাবু। সুখের দিন, বন্ধু বান্ধব নিয়ে ভাল ক'রে খেতে দেতে হয়।

স্ত্রী। তবু ভাল। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমাদের বৎসর কাবারে বুঝি এই রকম কলসী উৎসর্গ করতে হয়। ভাবছিলাম, বলি বারণ করব যে, আমার শ্বশুর শাশুড়ীর উদ্দেশে ও সব দিও না।

রাম। তুমি বড় নির্ব্বোধ !

স্ত্রী। তা ত বটে। তাই আরও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাই।

রাম। আবার কি জিজ্ঞাসা করিবে ?

স্ত্রী। এত কপি, সালগম, গাজর, বেদানা, পেস্তা, আঙ্গুর, ভেটকি মাছ সব আনিয়েছ কেন ? খেতে কি এত লাগবে ?

রাম। না। ও সব সাহেবদের ডালি সাজিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। ছি, ছি, এমন কর্ম্ম করো না। লোকে বড় কুকথা বলবে।

রাম। কি কথা বলিবে ?

স্ত্রী। বল্‌বে, এদের বৎসর কাবারে কলসী উৎসর্গও আছে, চোদ্দ পুরুষকে ভুজ্যি উৎসর্গ করাও আছে। [ইতি প্রহারভয়ে গৃহিণীর বেগে প্রস্থান। রামবাবুর উকীলের বাড়ী গমন এবং হিন্দুর Divorce হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।]

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম দুই বৎসরের 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত আটটি রচনা নিয়ে 'লোকরহস্য' "কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে" মুদ্রিত হয়ে প্রথম প্রচারিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। 'বিজ্ঞাপন'টি ছিল এই :

"এই গ্রন্থে বঙ্গদর্শনেব প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। এতৎ সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, রহস্যমাত্র গালি ; গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে যে কিছু ব্যঙ্গ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে গালি দেওয়া মাত্র। এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই—তাঁহাবা অনুগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব।

"সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্যলেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তিবিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্যলেখকের কোন অধিকার নাই—কদাচিৎ অবস্থাবিশেষে অধিকার জন্মে। যথা, ভ্রান্ত রাজপুরুষের ভ্রান্তি-জনিত কার্য্যের প্রতি, অথবা মূর্খ গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থের প্রতি, রহস্য প্রযুজ্য। এ গ্রন্থের সে সকল উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।"

গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (এটিই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ) ; পরবর্তী কালের 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রচার' থেকে আরও সাতটি রচনা এই সংস্করণে সংযোজিত হয়।—সম্পাদক, ব. র স.।

বিজ্ঞানরহস্য

অর্থাৎ

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ

আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত

১৮৭১ শালে সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা-নিবাসী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্ সাহেব যে আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, এরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড মনুষ্যচক্ষে প্রায় আর কখন পড়ে নাই। তত্তুলনায় এট্না বা বিসিউবিয়াসের অগ্নিবিপ্লব, সমুদ্রোচ্ছ্বাসের তুলনায় দুগ্ধকটাহে দুগ্ধোচ্ছ্বাসের তুল্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করেন নাই, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাঁহাদের বোধগম্য করার জন্য সূর্য্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক। এই গোলক আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু উহা বাস্তবিক কত বৃহৎ, তাহা পৃথিবীর পরিমাণ না বুঝিলে বুঝা যাইবে না। সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি, ছয়ষট্টি লক্ষ, ছাব্বিশ হাজার, এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে এবং এক মাইল ঊর্দ্ধে, এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ভাগ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য বিজ্ঞানবলে পৃথিবীকে ওজন করাও গিয়াছে। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা নিম্ন অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম। ৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাশ মনের অধিক।

এই সকল অঙ্ক দেখিয়া মন অস্থির হয়; পৃথিবী যে কত বৃহৎ পদার্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এক্ষণে যদি বলি যে, এমত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্র আছে যে, তাহা পৃথিবী অপেক্ষা, ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ, তবে কে না বিস্মিত হইবে? কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য পৃথিবী হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ গুণে বৃহৎ। ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়।

তবে আমরা সূর্য্যকে এত ক্ষুদ্র দেখি কেন? উহার দূরতাবশতঃ। পূর্ব্বতন গণনানুসারে সূর্য্য পৃথিবী হইতে সার্দ্ধ নয় কোটি মাইল দূরে স্থিত বলিয়া জানা ছিল। আধুনিক গণনায় স্থির হইয়াছে যে, ৯১,৬৭৮,০০০ মাইল অর্থাৎ এক কোটি, চতুর্দ্দশ লক্ষ, ঊনসপ্ততি সহস্র সার্দ্ধ সপ্তদশ যোজন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা।* এই ভয়ঙ্কর রতা অনুমেয় নহে। দ্বাদশ সহস্র পৃথিবী শ্রেণীপরম্পরায় বিন্যস্ত হইলে, পৃথিবী ন্ত সূর্য্য পর্য্যন্ত পায় না।

* স্রা গণনায় আরও কিছু বাড়িয়াছে।

এই দূরতা অনুভব করার জন্য একটি উদাহরণ দিই। অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি ট্রেণ, অবিরত, ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণে গত হইবে।

এক্ষণে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্যমণ্ডলমধ্যে যাহা অণুবৎ ক্ষুদ্রাকৃতি দেখি, তাহাও বাস্তবিক অতি বৃহৎ। যদি সূর্য্যমধ্যে আমরা একটি বালির মত বিন্দুও দেখিতে পাই, তবে তাহাও লক্ষ ক্রোশ বিস্তার হইতে পারে।

কিন্তু সূর্য্য এমনি প্রচণ্ড রশ্মিময় যে, তাহার গায়ে বিন্দু বিসর্গ কিছু দেখিবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেও অন্ধ হইতে হয়। কেবল সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যতেজঃ চন্দ্রান্তরালে লুক্কায়িত হইলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা যায়। তখনও সাধারণ লোকে চক্ষুর উপর কালিমাখা কাচ না ধরিয়া, হৃততেজা সূর্য্য প্রতিও চাহিতে পারে না।

সেই সময়ে যদি কালিমাখা কাচ ত্যাগ করিয়া উত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায়। পূর্ণ গ্রাসের সময়ে, অর্থাৎ যখন চন্দ্রান্তরালে সূর্য্যমণ্ডল লুক্কায়িত, তখন দেখা যায়, মণ্ডলের চারিপার্শ্বে, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় কিরীটিমণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে "করোনা" বলেন। কিন্তু এই কিরীটিমণ্ডল ভিন্ন, আর এক অদ্ভুত বস্তু কখন কখন দেখা যায়। কিরীটিমূলে, ছায়াবৃত সূর্য্যের অঙ্গের উপরে সংলগ্ন, অথচ তাহার বাহিরে, কোন দুর্জ্ঞেয় পদার্থ উদ্গত দেখা যায়। ঐ সকল উদ্গত পদার্থ দেখিতে এত ক্ষুদ্র যে, তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দেখা যায় না। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় বলিয়াই তাহা বৃহৎ অনুমান করিতে হইতেছে। উহা কখন কখন অর্দ্ধ লক্ষ মাইল উচ্চ দেখা গিয়াছে। ছয়টি পৃথিবী উপর্য্যুপরি সাজাইলে এত উচ্চ হয় না। এই সকল উদ্গত পদার্থের আকার কখন পর্ব্বতশৃঙ্গবৎ, কখন বা অন্য প্রকার, কখন সূর্য্য হইতে বিযুক্ত দেখা গিয়াছে। তাহার বর্ণ কখন উজ্জ্বল রক্ত, কখন গোলাপী, কখন নীল কপিশ।

পণ্ডিতেরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এ সকল সূর্য্যের অংশ। প্রথমে কেহ কেহ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এ সকল সৌর পর্ব্বত; পরে সূর্য্য হইতে তাহার বিয়োগ দেখিয়া সে মত ত্যাগ করিলেন।

এক্ষণে নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ সূর্য্যগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত। যেরূপ পার্থিব আগ্নেয়গিরি হইতে দ্রব বা বায়বীয় পদার্থসকল উৎপতিত হইয়া গিরিশৃঙ্গের উপরে মেঘাকারে দৃষ্ট হইতে পারে, এই সকল সৌর মেঘও তদ্রূপ। উৎক্ষিপ্ত বস্তু যতক্ষণ না সূর্য্যোপরি পুনঃ পতিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্তূপাকারে পৃথিবী হইতে লক্ষ্য হইতে থাকে।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এইরূপ একখানি সৌর মেঘ বা স্তূপ দূরবীক্ষণে দেখিলে কি বুঝিতে হয়। বুঝিতে হয় যে, এক প্রকাণ্ড প্রদেশ লইয়া এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল উৎপাতকালে সূর্য্যগর্ভনিক্ষিপ্ত

পদার্থরাশি, এতাদৃশ বহুদূরব্যাপী হয় যে, তন্মধ্যে এই পৃথিবীর ন্যায় অনেকগুলি পৃথিবী ডুবিয়া থাকিতে পারে।

এইরূপ সৌরোৎপাত অনেকেই প্রফেসর ইয়ঙের পূর্ব্বে দেখিয়াছেন ; কিন্তু প্রফেসর ইয়ঙ্ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আবার বিশেষ বিস্ময়কর। বেলা দুই প্রহরের সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডল দূরবীক্ষণ দ্বারা অবেক্ষণ করিতেছিলেন। তৎকালে গ্রহণাদি কিছু ছিল না। পূর্ব্বে গ্রহণের সাহায্য ব্যতীত কেহ কখন এই সকল ব্যাপার নয়নগোচর করে নাই, কিন্তু ডাক্তার হাগিন্স প্রথমে বিনা গ্রহণে এ সকল ব্যাপার দেখিবার উপায় প্রদর্শন করেন। প্রফেসর ইয়ঙ্ এরূপ বিজ্ঞানকুশলী যে, তিনি সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজের সময়েও ঐ সকল সৌরস্তূপের আতপচিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কথিত সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ দূরবীক্ষণে দেখিতেছিলেন যে, সূর্য্যের উপরি ভাগে একখানি মেঘবৎ পদার্থ দেখা যাইতেছে। অন্যান্য উপায় দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ বায়বীয় আবরণে বেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ। ঐ মেঘবৎ পদার্থ সৌর বায়ুর উপরে ভাসিতেছিল। পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় আধারের উপরে উহা আরূঢ় দেখা যাইতেছিল। প্রফেসর ইয়ঙ্ পূর্ব্বদিন বেলা দুই প্রহর হইতে ঐ রূপই দেখিতেছিলেন। তদবধি তাহার পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখেন নাই। স্তম্ভগুলি উজ্জ্বল, মেঘখানি বৃহৎ—তদ্ভিন্ন মেঘের নিবিড়তা বা উজ্জ্বলতা কিছুই ছিল না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রাকার কতকগুলি পদার্থের সমষ্টির ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অপূর্ব্ব মেঘ সৌর বায়ুর উপরে পঞ্চদশ সহস্র মাইল ঊর্দ্ধে ভাসিতেছিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রফেসর ইয়ঙ্ ইহার দৈর্ঘ্য-প্রস্থও মাপিয়াছিলেন। তাহার দৈর্ঘ্য লক্ষ মাইল—প্রস্থ ৫৪,০০০ মাইল। বারটি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, তাহার দৈর্ঘ্যের সমান হয় না—ছয়টি পৃথিবী সারি সারি সাজাইলে, তাহার প্রস্থের সমান হয় না।

দুই প্রহর বাজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা হইলে, মেঘ এবং তন্মূলস্বরূপ স্তম্ভগুলির অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। সেই সময়ে প্রফেসর ইয়ঙ্ সাহেবকে দূরবীক্ষণ রাখিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইল। একটা বাজিতে পাঁচ মিনিট থাকিতে, যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, চমৎকার! নিম্ন হইতে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ঙ্কর বলের বেগে মেঘখণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সৌর গগন ব্যাপিয়া ঘনবিকীর্ণ উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থসকল ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে। ঐ সূত্রাকার পদার্থসকল অতি প্রবল বেগে ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা এই বেগই চমৎকার। আলোক বা বৈদ্যুতীয় শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন, গুরুত্ব-বিশিষ্ট পদার্থের এরূপ বেগ শ্রুতিগোচর হয় না। ইয়ঙ্ সাহেব যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রাকার পদার্থ লক্ষ মাইলের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। পরে দশ মিনিটের মধ্যে যাহা লক্ষ মাইলে ছিল, তাহা দুই লক্ষ মাইলে উঠিল। দশ মিনিটে লক্ষ মাইল গতি হইলে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৫ মাইল গতি হয়। অতএব উৎক্ষিপ্ত পদার্থের দৃষ্ট গতি এই।

এই গতি কি ভয়ঙ্কর, তাহা মনেরও অচিন্ত্য। কামানের গোলা অতি বেগবান্ হইলেও কখন এক সেকেণ্ডে অর্দ্ধ মাইল যাইতে পারে না। সচরাচর কামানের গোলার বেগের বহু শত গুণ এই সৌর পদার্থের বেগ. এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধেতে এই বেগ দেখা গিয়াছিল। যে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দুই লক্ষ মাইল উর্দ্ধে এত বেগবান্, নির্গমকালে তাহার বেগ কিরূপ ছিল? সকলেই জানেন যে, যদি আমরা একটা ইষ্টকখণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে যে বেগে তাহা নিক্ষিপ্ত হয়, সেই বেগ শেষ পর্য্যন্ত থাকে না, ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পরিশেষে একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, ইষ্টকখণ্ডও ভূপতিত হয়। ইষ্টকবেগের হ্রাসের দুই কারণ, প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, দ্বিতীয় বায়ুজনিত প্রতিবন্ধকতা। এই দুই কারণই সূর্য্য-লোকে বর্ত্তমান। যে বস্তু যত গুরু, তাহাব মাধ্যাকর্ষণী শক্তি তত বলবতী। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি সূর্য্যেব নাডীমণ্ডলে ২৮ গুণ অধিক। তদুল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত যদি কোন পদার্থ উত্থিত হয়, তবে তাহা যখন সূর্য্যকে ত্যাগ করে, তৎকালে তাহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে অবশ্যই ১৬৬ মাইল ছিল। ইহা গণনা দ্বারা সিদ্ধ। কিন্তু যদিও এই বেগে উৎক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ উঠিতে পারিবে, তাহা যে ঐ লক্ষ ক্রোশের শেষার্দ্ধ লঙ্ঘনকালে প্রতি সেকেণ্ডে ১৬৬ মাইল ছুটিবে, এমত নহে। শেষার্দ্ধ বেগ গড়ে ৬৫ মাইল মাত্র হইবে। প্রক্টর সাহেব গুড্‌ওয়ার্ডসে লিখিয়াছেন যে, যদি বিবেচনা করা যায় যে, সূর্য্যলোকে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতা নাই, তাহা হইলে এই উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সূর্য্যমধ্য হইতে যে বেগে নির্গত হইযাছিল, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৫ মাইল। কর্ণহিলেব একজন লেখক বিবেচনা করেন যে, এই পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ মাইলের অধিক বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যলোকে যে বায়বীয় পদার্থ নাই, এমত কথা বিবেচনা করিতে পারা যায় না। সূর্য্য যে গাঢ় বাষ্পমণ্ডল-পরিবৃত, তাহা নিশ্চিত হইয়াছে। প্রক্টর সাহেব সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার যেরূপ বল, সৌর বায়ুর প্রতিবন্ধকতার যদি সেইরূপ বল হয়, তাহা হইলে এই পদার্থ যখন সূর্য্য হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে আনুমানিক সহস্র মাইল ছিল।

এই বেগ মনের অচিন্ত্য। এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত পদার্থ এক সেকেণ্ডে ভারতবর্ষ পার হইতে পারে—পাঁচ সেকেণ্ডে কলিকাতা হইতে বিলাত পঁহুছিতে পারে, এবং ২৪ সেকেণ্ডে অর্থাৎ অর্দ্ধ মিনিটের কমে, পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।

আর এক বিচিত্র কথা আছে, আমরা যদি কোন মৃৎপিণ্ড উর্দ্ধে নিক্ষেপ করি, তাহা আবার ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে পড়ে। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির বলে, এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতায়, ক্ষেপণীর বেগ ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, যখন ক্ষেপণী একেবারে বেগহীন হয়, তখন মাধ্যাকর্ষণের বলে পুনর্ব্বার তাহা ভূপতিত হয়। সূর্য্য-লোকেও অবশ্য তাহাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণী শক্তি বা বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার শক্তি কখন অসীম নহে। উভয়েরই সীমা আছে। অবশ্য এমত কোন বেগবতী গতি আছে যে, তদ্দ্বারা উভয় শক্তিই পরাভূত হইতে পারে। এই সীমা কোথায়, তাহাও গণনা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। যে বস্তু নির্গমকালে প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮০ মাইল গমন করে, তাহা মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং বায়বীয় প্রতিবন্ধকতার বল অতিক্রম করিয়া যায়। অতএব উপরিবর্ণিত বেগবান্ উৎক্ষিপ্ত পদার্থ, আর সূর্য্যলোকে ফিরিয়া আইসে না। সুতরাং প্রফেসর ইয়ঙ্ যে সৌরোৎপাত দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদুৎক্ষিপ্ত পদার্থ আর সূর্য্যলোকে

ফিরে নাই। তাহা অনন্তকাল অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া ধূমকেতু বা অন্য কোন খেচররূপে পরিগণিত হইবে কি, কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

প্রক্টর সাহেব সিদ্ধান্ত করেন যে, উৎক্ষিপ্ত বস্তু লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদৃশ্যভাবে যে তদধিক দূর উর্দ্ধগত হয় নাই, এমত নহে। যতক্ষণ উহা উত্তপ্ত এবং জ্বালাবিশিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাহা দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ক্রমে শীতল হইয়া অনুজ্জ্বল হইলে, আব তাহা দেখা যায় নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ তিন লক্ষ মাইল উঠিয়াছিল। অতএব এই সৌরোৎপাতনিক্ষিপ্ত পদার্থ অদ্ভুত বটে—লক্ষযোজনব্যাপী মনোগতি, এক নূতন সৃষ্টির আদি।

আকাশে কত তারা আছে?

ঐ যে নীল নৈশ নভোমণ্ডলে অসংখ্য বিন্দু জ্বলিতেছে, ওগুলি কি?

ওগুলি তারা। তারা কি? প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পাঠশালার ছাত্র মাত্রেই তৎক্ষণাৎ বলিবে যে, তারা সব সূর্য্য। সব সূর্য্য! সূর্য্য ত দেখিতে পাই বিশ্বদাহকর, প্রচণ্ডকিরণমালার আকর; তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবারও মনুষ্যের শক্তি নাই; কিন্তু তারা সব ত বিন্দু মাত্র, অধিকাংশ তারাই নয়নগোচর হইয়া উঠে না। এমন বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? কোন্ প্রমাণের উপর নিভর করিয়া বলিব যে, এগুলি সূর্য্য? এ কথাব উত্তর পাঠশালার ছাত্রের দেয় নহে। এবং যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা এই কথাই অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন। তাঁহাদিগকে আমরা এক্ষণে ইহাই বলিতে পারি যে, এ কথা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রমাণ কি, তাহা বিবৃত করা এস্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যাঁহারা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ এখানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিষ সম্যক্ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সেই প্রমাণ বোধগম্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ দুইটি কঠিন কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; প্রথমতঃ কি প্রকারে নভঃস্থ জ্যোতিষ্কের দূরতা পরিমিত হয়; দ্বিতীয় আলোক-পরীক্ষক নামক আশ্চর্য্য যন্ত্র কি প্রকার, এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং সে বিষয়ে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। সন্দিহান পাঠকগণের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ, তাঁহারা ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস করিয়া বিবেচনা করুন যে, এই আলোকবিন্দুগুলি সকলই সৌর প্রকৃত। কেবল আত্যন্তিক দূরতাবশতঃ আলোকবিন্দুবৎ দেখায়।

এখন কত সূর্য্য এই জগতে আছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাই এখানে আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নিশীথে নির্ম্মল নিরম্বুদ আকাশমণ্ডল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে নক্ষত্র যেন আর ধরে না। আমরা বলি, নক্ষত্র অসংখ্য। বাস্তবিক কি নক্ষত্র অসংখ্য? বাস্তবিক শুধু চক্ষে আমরা যে নক্ষত্র দেখিতে পাই, তাহা কি গণিয়া সংখ্যা করা যায় না?

ইহা অতি সহজ কথা। যে কেহ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া স্থিরচিত্তে গণিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনিই সফল হইবেন। বস্তুতঃ দূরবীক্ষণ ব্যতীত যে তারাগুলি দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহা অসংখ্য নহে—সংখ্যা এমন অধিকও নহে। তবে তারাসকল যে অসংখ্য বোধ হয়, তাহা উহার দৃশ্যতঃ বিশৃঙ্খলতাজন্য মাত্র। যাহা শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত, তাহা অপেক্ষা যাহা শ্রেণীবদ্ধ নহে এবং অবিন্যস্ত, তাহা সংখ্যায় অধিক বোধ হয়। তারাসকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গণিত হইয়াছে। বর্লিন নগরে যত তারা ঐরূপে দেখা যায়, অর্গেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬টি মাত্র তারা আছে। পারিস নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্‌টের মতে তাহা ৪১৪৬টি মাত্র। গেলামির আকাশমণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষুর্দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার ;—

১ম শ্রেণী	...	...	...	২০
২য় শ্রেণী	...	...	...	৬৫
৩য় শ্রেণী	...	..	...	২০০
৫ম শ্রেণী	...	...	...	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	...	...	...	৩২০০
				৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুবরেখার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস নগর হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়, কিন্তু এ দেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে।

এককালীন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে। সুতরাং মনুষ্যচক্ষে এককালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যেখানে দুই একটি মাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলামি এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটি ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে ইহা দূরবীক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়।

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম হর্শেল প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহুকালাবধি প্রতিরাত্রে আপন দূরবীক্ষণসমীপাগত তারাসকল গণনা করিয়া তাহার

তালিকা করিতেন। এইরূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগনিক খণ্ড মাত্র তিনি এই ৩৪০০ বারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্রে তিনি ৯০,০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছেন। স্ত্রূবনামা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তাহার পরে সর্ উইলিয়মের পুত্র সর্ জন হর্শেল ঐরূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩,০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০,০০০ তারা, এবং নবম শ্রেণীর ১৪২,০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্রসমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতাবশতঃ নক্ষত্রসকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোকসমবায়ে ছায়াপথ শ্বেতবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথমধ্যে ১৮,০০০,০০০ এক কোটি আশী লক্ষ তারা আছে।

স্ত্রূব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে।

মসৃর শাকোর্ণাক্ বলেন, "সর্ উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসন্ধান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।"

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাকুক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার।

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্রপুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর-দৃষ্ট তারা-পুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্রসংখ্যা ধরিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়।

কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্যবুদ্ধি চিন্তায় অশক্ত হইয়া উঠে। চিত্ত বিস্ময়বিহ্বল হইয়া যায়। সর্ব্বত্রগামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গগনসীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য। আমরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎমধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সিরিয়স (Sirius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে, এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর-আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর-তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ-উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্যপার্শ্বে গ্রহ-উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? এ আশ্চর্য্য কথা কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎমধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?

ধূলার মত সামান্য পদার্থ আর সংসারে নাই। কিন্তু আচার্য্য টিণ্ডল ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আচার্যের ঐ প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং দুরূহ, তাহা সংক্ষেপে এবং সহজে বুঝান অতি কঠিন কর্ম্ম। আমরা কেবল টিণ্ডল সাহেবকৃত সিদ্ধান্তগুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিব, যিনি তাঁহার প্রমাণ-জিজ্ঞাসু হইবেন, তাঁহাকে আচার্য্যের প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

১। ধূলা, এই পৃথিবীতলে এক প্রকার সর্ব্বব্যাপী। আমরা যাহা যত পরিষ্কার করিয়া রাখি না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধূলাছাড়া নহে। যত "বাবুগিরি" করি না কেন, কিছুতেই ধূলা হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কার বিবেচনা করি, তাহাও ধূলায় পূর্ণ। সচরাচর ছায়ামধ্যে কোন রন্ধ্র-নিপতিত রৌদ্রে দেখিতে পাই, যে বায়ু পরিষ্কার দেখাইতেছিল, তাহাতেও ধূলা চিক্‌চিক্ করিতেছে। সচরাচর বায়ু যে এরূপ ধূলাপূর্ণ, তাহা জানিবার জন্য আচার্য্য টিণ্ডলের উপদেশের আবশ্যকতা নাই, সকলেই তাহা জানে। কিন্তু বায়ু ছাঁকা যায়। আচার্য্য বহুবিধ উপায়ের দ্বারা বায়ু অতি পরিপাটী করিয়া ছাঁকিয়া দেখিয়াছেন। তিনি অনেক চোঙ্গার ভিতর দ্রাবকাদি পূরিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূলা অদৃশ্য; কেন না, তাহার কণাসকল অতি ক্ষুদ্র। রৌদ্রেও উহা অদৃশ্য। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাও অদৃশ্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক প্রদীপের আলোক রৌদ্রাপেক্ষাও উজ্জ্বল। উহার আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রেরণ করিয়া তিনি দেখিয়াছেন যে, তাহাতেও ধূলা চিক্‌চিক্ করিতেছে। যদি এত যত্নপরিষ্কৃত বায়ুতেও ধূলা, তবে

সচরাচর ধনী লোকে যে ধূলা নিবারণ করিবার উপায় করেন, তাহাতে ধূলা নিবারণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। ছায়ামধ্যে রৌদ্র না পড়িলে রৌদ্রে ধূলা দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্রমধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের রেখা প্রেরণ করিলে ঐ ধূলা দেখা যায়। অতএব আমরা যে বায়ু মুহূর্তে মুহূর্তে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, তাহা ধূলিপূর্ণ। যাহা কিছু ভোজন করি, তাহা ধূলিপূর্ণ, কেন না, বায়ুস্থিত ধূলিরাশি দিবারাত্র সকল পদার্থের উপর বর্ষণ হইতেছে। আমরা যে কোন জল পরিষ্কৃত করি না কেন, উহা ধূলিপূর্ণ। কলিকাতার জল পলতার কলে পরিষ্কৃত হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলিশূন্য নহে। ছাঁকিলে ধূলা যায় না।

২। এই ধূলা বাস্তবিক সমুদয়াংশই ধূলা নহে। তাহার অনেকাংশ জৈব পদার্থ। যে সকল অদৃশ্য ধূলিকণার কথা উপরে বলা গেল, তাহার অধিক ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। যে ভাগ জৈব নহে, তাহা অধিকতর গুরুত্ববিশিষ্ট, এজন্য তাহা বায়ূপরি তত ভাসিয়া বেড়ায় না। অতএব আমরা প্রতি নিশ্বাসে শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি, জলের সঙ্গে সহস্র সহস্র পান করি, রাক্ষসবৎ অনেককে আহার করি। লণ্ডনের আটটি কোম্পানির কলে ছাঁকা পানীয় জল টিণ্ডল সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক প্রকার জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা মনুষ্য-সাধ্যাতীত। যে জল স্ফাটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল, কীটাণুপূর্ণ। জৈনেরা একথা স্মরণ রাখিবেন।

৩। এই সর্ব্বব্যাপী ধূলিকণা সংক্রামক পীড়ার মূল। অনতিপূর্ব্বে সর্ব্বত্র এই মত প্রচলিত ছিল যে, কোন এক প্রকার পচনশীল নির্জ্জীব জৈব পদার্থ (Malaria) কর্তৃক সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হইয়া থাকে। এ মত ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রবল। ইউরোপে এ বিশ্বাস এক প্রকার উচ্ছিন্ন হইতেছে। আচার্য্য টিণ্ডল প্রভৃতির বিশ্বাস এই যে, সংক্রামক পীড়ার বিস্তারের কারণ সজীব পীড়াবীজ (Germ)। ঐ সকল পীড়াবীজ বায়ুতে এবং জলে ভাসিতে থাকে, এবং শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় জীবজনক হয়। জীবের শরীরমধ্যে অসংখ্য জীবের আবাস। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতে কীট, এই কয়টি মনুষ্য-শরীরে সাধারণ উদাহরণ। পশু মাত্রেরই গাত্রমধ্যে কীটসমূহের আবাস। জীবতত্ত্ববিদেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, ভূমে, জলে বা বায়ুতে যত জাতীয় জীব আছে, তদপেক্ষা অধিক জাতীয় জীব অন্য জীবের শরীরবাসী। যাহাকে উপরে "পীড়াবীজ" বলা হইয়াছে, তাহাও জীবশরীরবাসী জীব বা জীবোৎপাদক বীজ। শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তদুৎপাদ্য জীবের জন্ম হইতে থাকে। এই সকল শোণিত-নিবাসী জীবের জনকতাশক্তি অতি ভয়ানক। যাহার শরীরমধ্যে ঐ প্রকার পীড়াবীজ প্রবিষ্ট হয়, সে সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন বীজ। সংক্রামক জ্বরের বীজে জ্বর উৎপন্ন হয়, বসন্তের বীজে বসন্ত জন্মে; ওলাউঠার বীজে ওলাউঠা; ইত্যাদি।

৪। পীড়াবীজে কেবল সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়, এমত নহে। ক্ষতাদি যে শুকায় না, ক্রমে পচে, দুর্গন্ধ হয়, দুরারোগ্য হয়, ইহাও অনেক সময়ে এই সকল ধূলিকণা-রূপী পীড়াবীজের জন্য। ক্ষতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন রাখা যাইতে পারে না যে, অদৃশ্য

ধূলা তাহাতে লাগিবে না। নিতান্ত পক্ষে তাহা ডাক্তারের অস্ত্র-মুখে ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করিবে। ডাক্তার যতই অস্ত্র পরিষ্কার রাখুন না কেন, অদৃশ্য ধূলিপুঞ্জের কিছুতেই নিবারণ হয় না। কিন্তু ইহার একটি সুন্দর উপায় আছে। ডাক্তারেরা প্রায় তাহা অবলম্বন করেন। কার্ব্বলিক আসিড নামক দ্রাবক বীজঘাতী; তাহা জল মিশাইয়া ক্ষতমুখে বর্ষণ করিতে থাকিলে প্রবিষ্ট বীজসকল মরিয়া যায়। ক্ষতমুখে পরিষ্কৃত তুলা বাঁধিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হয়, কেন না, তুলা বায়ু পরিষ্কৃত করিবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

গগনপর্য্যটন

পুরাণ ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ-মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এপাড়া ওপাড়ার ন্যায়, স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন; কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র, সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ গগন পর্য্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণ জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, সাইমন নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল। এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমান ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে একদিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। মাম্‌স্‌বরিনিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ শালে গোল্‌ড্‌উইন নামক এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন। ১৬৭৮ শালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুতপূর্ব্বক হস্তপদে বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ শালে লরেন্ত দে গুজ্‌মান নামক একজন ফরাসী দারুনির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মার্কুইস্ দে বাকবিল নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নর্দ্দামাগর্ত্তে পতিত হন। বানসার্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নবিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার বাক প্রচার করেন যে, জলজন বায়ু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত্তা মোনগোল্‌ফীর নামক ফরাসী। কিন্তু তিনি জলজন বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পূরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎসাহায্যে গোলক-সকল ঊর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চার্লস প্রথমে জলজন বায়ুপূরিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস

করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেশ নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব খেচর দেখিয়া, গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন যে, ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া, গ্রাম্য লোকেরা ভূত শান্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পালায় কি না দেখিবার জন্য, আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায় না—বায়ুসংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে একজন গ্রাম্য বীর, সাহস করিয়া তৎপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওযাতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষতমুখ দিয়া বহুল পরিমাণে জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগের ন্যায় "ধড়ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। এদেশে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে, মোনগোল্‌ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পূরিত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে বারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুট ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করিয়া, তাহারা সশরীরে মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শুনিয়া পিলাতর দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশ-মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্ব্বৃত্ত নরাধমদিগের কপালে ঘটিবে!" একজন রাজ-পুরস্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মার্কুইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্য্যটন করেন। সে বার নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে—আবার ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক, সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগন-পর্য্যটক। কেন না, দুষ্মন্ত, পুরূরবা, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা অতি

ধৃষ্টের কাজ আর যিনি জয় রাম বলিয়া পঞ্চমবায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস্ ও রবর্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন। এবং প্রায় ১৪,০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরীক্ষার্থ যাঁহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ শালে গাই লুসাকের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩,০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ শালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়, ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মাণীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পর্য্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার, বায়ুপথে সমুদ্রপার হইযাছিলেন—অতএব, কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য্য-সকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন দুইবার সমুদ্রমধ্যে পতিত হয়েন—এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেম্স্ গ্লেশর অপেক্ষা কেহ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ শালে উল্‌ভর্হাম্‌টন হইতে উড্ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিযাছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণপূর্ব্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্য্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্ব্বে বাত্যামধ্যে পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক!

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্য্যটন-সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না, এজন্য গগন-পর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয় পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্রবিশেষ, জলসমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘসকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ, পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা

যায় যে, সর্ব্বত্র জীবশূন্য, শব্দশূন্য, গতিশূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরে আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচণ্ড জ্বালাবিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না, এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ, বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক-রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি না।* কিন্তু যত উর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য উর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয়—মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহ বা কৃষ্ণমধ্য, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক-নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মসূর ফন্‌বিল একবার একটি মেঘগভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বতমধ্য দিয়া, বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ পথে গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন। এবং কেহ কেহ এক দিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া, আবার ততোধিক উর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয় বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া, আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগরসকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা

* কেহ কেহ বলেন যে, বায়ুমধ্যস্থ জলবাষ্প হইতে প্রতিহত নীল রশ্মিরেখাই আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার কারণ।

উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযানসল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাস-গৃহ নয়নগোচব করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরীসকলের রাজপথস্থ দীপমালাসকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। শিমলা, দারজিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এইজন্য হিমালয় তুষারমণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবি "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে" বিবেচনা করিযাছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা, তাহাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থান করিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যশোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২১২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষাব হয, এ কোন্ কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয। ৩২ ভাগ তাপ, জলের স্বাভাবিক তাপের অভাববাচক।)

পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্গণের সংস্কার ছিল যে, ঊর্দ্ধে তিনশত ফিট প্রতি এক ভাগ তাপ কমে। অর্থাৎ তিন শত ফিট উঠিলে এক ভাগ তাপহানি হইবে—ছয় শত ফিট উঠিলে দুই ভাগ তাপ কমিবে—ইত্যাদি। কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঊর্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থাবিশেষে তাপহানির লাঘব গৌরব ঘটিয়া থাকে। মেঘ থাকিলে, তাপহানি অল্প হয়—কারণ, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। আবার দিবাভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নলিখিত মত—

ভূমি হইতে হাজার ফিট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪.৫ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ৬.২ ভাগ, দশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত, মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে, মেঘাচ্ছন্নে ১.১ ভাগ; মেঘশূন্যে ১.২ ভাগ। ত্রিশ হাজার ফিট ঊর্দ্ধে মোট ৬.২ ভাগ তাপহ্রাস পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি। তাপহ্রাস হেতু ঊর্দ্ধে স্থানে স্থানে তুষার-কণা (Snow) দৃষ্ট হয়; এবং ব্যোমযান কখন কখন তন্মধ্যে পতিত হয়। ঊর্দ্ধে শীতাধিক্য, অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে—এমন কি, অনেক সময়ে হাত পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়।

ঊর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ, তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমে যেমন প্রখর, ঊর্দ্ধে বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতিক্ষীণ,—অল্পপরমাণু। দশ বারটি তূলার বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তূলার ভারে, নিম্নস্থ বস্তার তূলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ুই গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে—এক ইঞ্চি দীর্ঘ প্রস্থে, এরূপ ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের

উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, "অগাধজলসঞ্চারী" মৎস্য উপরিস্থ বারিরাশির ভারে পীড়িত হয় না কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তরসমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তরসকল ঘনীভূত—যত ঊর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগনপর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা অনুসারে ৩৮০ মাইল ঊর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদায় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মসূর ফ্লামারিয়ঁ দশ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া, প্রথম বারে, যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীরমধ্যে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। কর্ণমধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আমি এক পাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল—তাহা ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়ু, এক ভাগ কম হইয়াছিল। যখন বোতলে ছিপি আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।"

দুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মুমূর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯,০০০ ফিট উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ-স্তম্ভ অথবা ঘড়ির কাঁটা দেখিতে সক্ষম হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না—তাহার শক্তি অন্তর্হিতা হইয়াছিল। তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে, অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন; গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল, যেন হস্ত-পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের "সারথি" রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ, প্রথম, ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ। দ্বিতীয়, দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায়, সেইরূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত মানুষ্যের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে, উত্তরে, পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু ঊর্দ্ধাধঃ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই

নামিবে। ব্যোমযানের "রথে" কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে ; তাহার কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও ঊর্দ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে ঊর্দ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক বেলুন পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ি বাঁধা থাকে ; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায় ; ব্যোমযান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণ বায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন, তখনই হয়ত, কিয়দ্দূর উঠিয়া দেখিলেন যে, বায়ু উত্তরে ; আরও উঠিলে হয়ত দেখিবেন যে, বায়ু পূর্ব্বে, কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি। কোন্ স্তরে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মসূর তিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্‌চ্যুন নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের গতি উত্তর সমুদ্রে। অপরাহ্ণে এইরূপ তাঁহারা অকস্মাৎ অনিচ্ছার সহিত, অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিল না। এই সঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে, নিম্নে মেঘসকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্রবিহারে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া, নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্ন স্তরে দক্ষিণ-বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অবতরণ করেন না। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তাবশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমত অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। অকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সাগরোপরে বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহারা আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তরসমুদ্রে বিচরণকালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, ঊর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ ঊর্দ্ধে, মাস্তুর নিম্নে ; বিপরীত ভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণস্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মসূর ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে, প্রায় পাঁচ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফিট মাত্র দূরে দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি

তাঁহাদিগের বেলুনেরই আকৃতি, যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে যাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী! আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুই জন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব! তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। ফ্লামারিয়ঁ দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লামারিয়ঁ বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাঁহার সঙ্গী একটা পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সেই ভৌতিক ব্যোমযানের ভৌতিক রথের চতুঃপার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলসকল প্রতিভাত হইতেছিল। মধ্যে হরিৎ শ্বেতাভ মণ্ডল, তন্মধ্যে রথ। তৎপার্শ্বে ক্ষীণ নীল মণ্ডল; তাহার বাহিরে হরিদ্রাবর্ণ মণ্ডল; তৎপরে কপিশ রক্তাভ মণ্ডল, শেষে অতসীকুসুমবৎ বর্ণ; তাহা ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এই বৃত্তান্ত বুঝাইবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে হইতে পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা জলবাষ্পের উপর প্রতিসৌর বিম্ব* মাত্র।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে রেলওয়ে ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং বিশ হাজার ফিট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুক্কুরের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফিট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মসূর ফ্লামারিয়ঁ আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবতসকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত, তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতি বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অণুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাববশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেচ্ছ বিহারে উপায়স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মসূর ফ্লামারিয়ঁ এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, এক দিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদিগের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে,

---

* Ant' helia।

তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দেলোম নামক একজন ফরাসী একটি মৎস্যাকার বেলুন কল্পনা করিয়াছেন ; তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছা আকাশ-পথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া, আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

চঞ্চল জগৎ

সচরাচর মনুষ্যের বোধ এই যে, গতি জগতের বিকৃত অবস্থা ; স্থিরতা জগতের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, গতিই স্বাভাবিক অবস্থা ; স্থিরতা কেবল গতির রোধ মাত্র। যাহা গতিবিশিষ্ট, কারণবশতঃ তাহার গতির রোধ হইলে, তাহার অবস্থাকে আমরা স্থিরতা বা স্থিতি বলি। যে শিলাখণ্ড বা অট্টালিকাকে অচল বিবেচনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা মাধ্যাকর্ষণের ফলে গতি-বিশিষ্ট ; নিম্নস্থ ভূমি তাহার গতি রোধ করিতেছে বলিয়া, তাহাকে স্থির বলিতেছি। এ স্থিরতাও কাল্পনিক ; পৃথিবীতলস্থ অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেছি যে, এই পর্ব্বত বা এই অট্টালিকা অচল, গতিশূন্য—বস্তুতঃ উহার কেহই অচল বা গতিশূন্য নহে, পৃথিবীর উপরে থাকিয়া উহা পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিতেছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে গেলে জগতে কিছুই গতিশূন্য নহে।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। যাহা পৃথিবীর গতিতে গতিবিশিষ্ট, তাহাকে চঞ্চল বলিবার প্রয়োজন করে না। তথাপিও পৃথিবীতে এমত কোন বস্তু নাই, যে মুহূর্ত্ত জন্য স্থির।

চারি পার্শ্বে চাহিয়া দেখ, বায়ু বহিতেছে, বৃক্ষপত্রসকল নাচিতেছে, জল চলিতেছে, জীবসকল নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদনার্থ বিচরণ করিতেছে! পরন্তু ইহার মধ্যেও কোন কোন বস্তু গতিশূন্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে বা অন্য প্রকারে রুদ্ধ বাহ্যিক গতি ভিন্ন, ঐ সকল বস্তুর অন্য গতি আছে। সেই সকল গতি আভ্যন্তরিক।

বস্তুমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে তাপ আছে। যাহাকে শীতল বলি, তাহা বস্তুতঃ তাপশূন্য নহে। তাপের অল্পতাকেই শীতলতা বলি, তাপের অভাব কিছুতেই নাই। যে তুষারখণ্ডের স্পর্শে অঙ্গচ্ছেদের ক্লেশানুভব করিতে হয়, তাহাতেও তাপের অভাব নাই—অল্পতা মাত্র।

যাহাকে তাপ বলি, তাহা পরমাণুগুণের আন্দোলন মাত্র। কোন বস্তুর পরমাণুসকল পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট এবং সন্তাড়িত হইলে, তাহা তরঙ্গবৎ আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই ক্রিয়াই তাপ। যেখানে সকল বস্তুই তাপযুক্ত, সেখানে সকল বস্তুর পরমাণুই অহরহ পরস্পর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, সন্তাড়িত এবং সঞ্চালিত। অতএব পৃথিবীস্থ সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট।

আলোক সম্বন্ধেও সেই কথা। ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণুসমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণুসকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। সেই প্রকার তাপীয় তরঙ্গ সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাপ অনুভূত করি। এই সকল আন্দোলন-ক্রিয়া মনুষ্যের দৃষ্টির অগোচর—উহা তাপরূপে এবং আলোকরূপেই আমরা ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক গ্রহণ করিতে

পারি—অন্য রূপে নহে। তবে এই আন্দোলনক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কি? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এ স্থলে বর্ণনীয় নহে।

পৃথিবীতলে আলোক সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। অতি অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রে পৃথিবীতল একেবারে আলোকশূন্য নহে। অতএব সর্ব্বত্রেই সর্ব্বদা আলোকীয় আন্দোলনের গতি বর্ত্তমান।

বিজ্ঞানবিদেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আলোক, তাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ, তিনটিই পরমাণুর গতি মাত্র। অতএব পৃথিবীর সকল বস্তুই আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। যৌগিক আকর্ষণের বলে সেই সকল গতি সত্ত্বেও কোন বস্তুর পরমাণুসকল বিস্রস্ত বা পৃথগ্‌ভূত হয় না।

পৃথিবীতলে এইরূপ। তারপর, পৃথিবীর বাহিরে কি?

পৃথিবী স্বয়ং অত্যন্ত প্রখর বেগবিশিষ্টা এবং অনন্তকাল আকাশমার্গে ধাবমানা। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি যাহা সৌর জগতের অন্তর্গত, তাহাও পৃথিবীর মত অবস্থাপন্ন সন্দেহ নাই। সেই সকল গ্রহ উপগ্রহে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাও পার্থিব পদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক গতিবিশিষ্ট। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৌরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে সে কথার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

সূর্য্য নামে যে বৃহৎ বস্তু এই সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত, তাহা যেরূপ চাঞ্চল্যপূর্ণ, তাহা মনুষ্যের অনুভবশক্তির অতীত। যে সূর্য্যমণ্ডলের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতাদিকী শক্তি পৃথিবীস্থ গতিমাত্রেরই কারণ, সেই সূর্য্যমণ্ডলোপরে বা তদভ্যন্তরে যে নানাবিধ ভয়ঙ্কর এবং অদ্ভুত গতি নিয়ত বর্ত্তিবে, তাহা বলা বাহুল্য। সেই চাঞ্চল্যের একটি উদাহরণ "আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত" নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

কিন্তু সূর্য্যোপরে এবং সূর্য্যগর্ব্ভে যে নিয়ত গতির আধিপত্য, কেবল ইহাই নহে; সূর্য্য স্বয়ং গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বয়ং এই তাবৎ সৌর জগৎ সঙ্গে লইয়া প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮০ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭,১০০ মাইল আকাশ-পথে ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর বেগে এই পদার্থরাশি কোথায় যাইতেছে? কেহ বলিতে পারে না কোথায় যাইতেছে। আকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে ইউরোপীয়েরা হরকুলিজ বলেন। সূর্য্য তন্মধ্যস্থ লাম্‌ডা নামক নক্ষত্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, কেবল এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু সূর্য্য এবং সৌর জগৎ ত বিশ্বের অতি ক্ষুদ্রাংশ। অন্ধকার রাত্রে অনন্ত আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক জ্বলিতে থাকে, তাহারা সকলেই এক একটি সৌর জগতের কেন্দ্রীভূত। সে সকল কি গতিশূন্য? তাহাদিগেরও প্রাত্যহিক উদয়াস্তাদি দেখিতে পাই, সেও পৃথিবীর প্রাত্যহিক আবর্ত্তনজনিত চাক্ষুষ ভ্রান্তি মাত্র। নাক্ষত্রিক লোকেও কি জগৎ চঞ্চল?

জ্যোতির্ব্বিদ্যার দ্বারা যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, ততদূর জানিতে পারা গিয়াছে যে, নক্ষত্রলোকেও গতি সর্ব্বময়ী। যত অনুসন্ধান হইয়াছে, ততই বুঝা গিয়াছে যে, সূর্য্যের যে প্রকৃতি, নক্ষত্রমাত্রেরই সেই প্রকৃতি। গ্রহ ভিন্ন অন্য তারাকে নক্ষত্র বলিতেছি।

কতকগুলি নক্ষত্র সৌর গ্রহগণের ন্যায় বর্ত্তনশীল। যেখানে আমরা চক্ষে একটি নক্ষত্র

দেখিতে পাই, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে তথায় কখন কখন দুইটি, তিনটি বা ততোধিক নক্ষত্র দেখা যায়। কখন কখন ঐ দুই তিনটি নক্ষত্র পরস্পরের সহিত সম্বন্ধরহিত, এবং পরস্পর হইতে দূরস্থিত, অথচ দর্শক যেখান হইতে দেখিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে গেলে আকাশের একদেশে স্থিত দেখায়, এবং একটি সরল রেখার মধ্যবর্ত্তী হইয়া যুগ্ম নক্ষত্রের ন্যায় দেখায়। কিন্তু কখন কখন দেখা যায় যে, যে নক্ষত্রদ্বয় দেখিতে যুগ্ম, তাহা বাস্তবিক যুগ্মই বটে,—পরস্পরের নিকটবর্ত্তী এবং পরস্পরের সহিত নৈসর্গিক সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সকল যুগ্মাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা পর্য্যবেক্ষণা ও গণনার দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, উহারা পরস্পরকে বেড়িয়া বর্ত্তন করিতেছে। অর্থাৎ যদি ক, খ, এই দুইটি নক্ষত্রে একটি যুগ্ম নক্ষত্র হয়, তবে ক, খ, উভয়ের মাধ্যাকর্ষণিক কেন্দ্রের চতুষ্পার্শে ক, খ, উভয় নক্ষত্র বর্ত্তন করিতেছে। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ দুইটি কেন, বহু নক্ষত্রে এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। তন্মধ্যস্থ বিভক্ত নক্ষত্রগুলি সকলই ঐ প্রকার আবর্ত্তনকারী। বিচিত্র এই যে, নিউটন পৃথিবীতে বসিয়া, পার্থিব পদার্থের গতি দেখিয়া, পার্থিব উপগ্রহ চন্দ্রের গতিকে উপলক্ষ্য করিয়া, যে সকল মাধ্যাকর্ষণিক গতির নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, দূরবর্ত্তী এবং সৌর জগতের বহিঃস্থ এই সকল নক্ষত্রের গতিও সেই সকল নিয়মাধীন।

নক্ষত্রগণের প্রকৃতি এবং সূর্য্যের প্রকৃতি যে এক, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ডাক্তার হুগিন্‌স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-পরীক্ষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিয়াছেন যে, যে সকল বস্তুতে সূর্য্য নির্ম্মিত, অন্যান্য নক্ষত্রেও সেই সকল বস্তু লক্ষিত হয়। অতএব সূর্য্যোপরি ও সূর্য্যগর্ভে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কোলাহল ও বিপ্লব নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, তারাগণেও সেইরূপ হইতেছে, সন্দেহ নাই। যে নক্ষত্র দূরবীক্ষণ সাহায্যেও অস্পষ্ট দৃষ্ট আলোকবিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তাহাতে ক্ষণমাত্র যে সকল উৎপাত ঘটিতেছে, পৃথিবীতলে দশ বর্ষের নৈসর্গিক ক্রিয়া একত্রিত করিলেও তাহার তুল্য হইবে না। সূর্য্যমণ্ডলে সামান্য মাত্র কোন পরিবর্ত্তনে যে বিপ্লব ও নৈসর্গিক শক্তিব্যয় সূচিত হয়, তাহাতে পলকমাত্রে এই পৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রচণ্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমণ্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই। আর এই যে সহস্র সহস্র, স্থির, শীতল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ দেখিতেছি, তাহাতেও সেইরূপ হইতেছে; কেন না, সকলই সূর্য্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট, বরং আমাদিগের সূর্য্য অনেক অনেক নক্ষত্রের অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং হীনতেজা। সিরিয়স্ নামক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, আমাদিগের নয়ন হইতে যত দূরে আছে, আমাদিগের সূর্য্য তত দূরে প্রেরিত হইলে, উহা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইত; আকাশের কত শত নক্ষত্র তদপেক্ষা উজ্জ্বল জ্বালায় জ্বলিত। কিন্তু যদি সূর্য্যকে অল্‌দেবরণ (রোহিণী?), কস্তর, বেটেলগুস্ প্রভৃতি নক্ষত্রের স্থানে প্রেরণ করা যায়, তবে সূর্য্যকে দেখা যাইবে কি না সন্দেহ। প্রক্টর সাহেব বলেন যে, আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, বোধ হয় তাহার মধ্যে পঞ্চাশটিও আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইবে না। অতএব সূর্য্যমণ্ডলে যেরূপ চাঞ্চল্যের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়, অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য বর্ত্তমান, সন্দেহ নাই।

কেবল তাহাই নহে, সূর্য্য যেমন অতি প্রচণ্ডবেগে, গ্রহগণ সহিত, আকাশ-পথে

ধাবমান, অন্যান্য নক্ষত্রগণও তদ্রূপ। বরং অনেক নক্ষত্রের বেগ সূর্য্যাপেক্ষা প্রচণ্ডতর। সিরিয়সের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল, ঘণ্টায় ৭২,০০০ মাইল। বেগা নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ মাইল, ঘণ্টায় ১৮০,০০০ মাইল, কস্তর প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ মাইল, ঘণ্টায় ৯০,০০০ মাইল। পোলেক্সের গতি সেকেণ্ডে ৪৯ মাইল, প্রায় বেগার ন্যায়। সপ্তর্ষির মধ্যের পাঁচটির গতি সিরিয়সের ন্যায়, একটির গতি বেগার ন্যায়। এই বেগ অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষ যখন মনে করা যায় যে, এই সকল প্রচণ্ড-বেগশালী পদার্থের আকার অতি প্রকাণ্ড (সিরিয়স্ সূর্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণ বৃহৎ), তখন বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

নক্ষত্রসকল অদ্ভুত গতিবিশিষ্ট হইলেও, চারি সহস্র বৎসরেও তত্তাবতের স্থানভ্রংশ মনুষ্য-চক্ষে লক্ষিত হয় নাই। ঐ সকল নক্ষত্রের অসীম দূরতাই ইহার কারণ। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সাহায্যে, আশ্চর্য্য মান-যন্ত্র ও বিদ্যা-কৌশলের বলে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতেই ঐ সকল গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নাক্ষত্রিক গতিতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্য। গগনের একদেশে স্থিত নক্ষত্রও এক দিকেই ধাবমান না হইয়াও নানা দিকে ধাবমান, কখন বা একদিকেই ধাবমান। কোথায় ধাবমান? কেন ধাবমান? সে সকল তত্ত্বের আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং এক প্রকার অসাধ্য।

যাহা বলা গেল, তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়ম রোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও, দৈহিক পরমাণুমধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তা-শালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।

কত কাল মনুষ্য?

জলে যেরূপ বুদ্বুদ উঠিয়া তখনই বিলীন হয়, পৃথিবীতে মনুষ্য সেইরূপ জন্মিতেছে ও মরিতেছে। পুত্রের পিতা ছিল, তাহার পিতা ছিল, এইরূপ অনন্ত মনুষ্যশ্রেণীপরম্পরা সৃষ্ট এবং গত হইয়াছে, হইতেছে এবং যতদূর বুঝা যায়, ভবিষ্যতেও হইবে। ইহার আদি কোথা? জগদাদির সঙ্গে কি মনুষ্যের আদি, না পৃথিবীর সৃষ্টির বহু পরে প্রথম মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে? পৃথিবীতে মনুষ্য কত কাল আছে?

খ্রীষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কালি পরশ্ব হইয়াছে। যে দিন জগদীশ্বর কুম্ভকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। এ কথা খ্রীষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকের কথার প্রতি আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম-পুস্তকসকল ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থে এমন কোন

কথা নাই যে, তাহাতে বুঝায় যে, আজি কালি বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর বা ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে, অথবা অনন্ত কাল পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেই মত।

তবে জগতের আদি আছে কি না, কেহ কেহ এই তর্ক তুলিয়া থাকেন। সৃষ্টি অনাদি, এ জগৎ নিত্য, ও সকল কথায় বুঝায় যে, সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কিন্তু সৃষ্টি একটি ক্রিয়া—ক্রিয়া মাত্র, কোন বিশেষ সময়ে কৃত হইয়াছে, অতএব সৃষ্টি কোন কাল-বিশেষে হইয়া থাকিবে। অতএব সৃষ্টি অনাদি বলিলে, অর্থ হয় না। যাঁহারা বলেন, সৃষ্টি হইতেছে, যাইতেছে, আবার হইতেছে, এইরূপ অনাদি কাল হইতে হইতেছে, তাঁহারা প্রমাণশূন্য বিষয়ে বিশ্বাস করেন। এ কথার নৈসর্গিক প্রমাণ নাই।

"অসৃজচ্চ জগৎ সর্ব্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সূচিত হয় যে, জগৎসৃষ্টি এবং মনুষ্য বা মনুষ্য-জনকদিগের সৃষ্টি এক কালেই হইয়াছিল। এরূপ বাক্য হিন্দু গ্রন্থে অতি সচরাচর দেখা যায়। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে, যতকাল চন্দ্র সূর্য্য, ততকাল মনুষ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এ তত্ত্বে কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই সমালোচিত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি হয় নাই যে, জগৎ অনাদি, কি সাদি, তাহার মীমাংসা করেন। কোন কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল। তবে এক কালে, জগতের যে এরূপ ছিল না, বিজ্ঞান ইহা বলিতে সক্ষম। ইহা বলিতে পারে যে, এই পৃথিবী এইরূপ তৃণ-শস্য-বৃক্ষময়ী, সাগর-পর্ব্বতাদিপরিপূর্ণা, জীবসঙ্কুলা, জীববাসোপযোগিনী ছিল না, গগন এককালে এরূপ সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্রাদিবিশিষ্ট ছিল না। একদিন—তখন দিন হয় নাই—এককালে জল ছিল না, ভূমি ছিল না—বায়ু ছিল না। কিন্তু যাহাতে এই চন্দ্র সূর্য্য তারা হইয়াছে, যাহাতে জল বায়ু ভূমি হইয়াছে—যাহাতে নদ নদী সিন্ধু—বন বিটপী বৃক্ষ—তৃণ লতা পুষ্প—পশু পক্ষী মানব হইয়াছে, তাহা ছিল। জগতের রূপান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে। কবে ঘটিল, কি প্রকারে ঘটিল, তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। তবে ইহাই বলিতে পারে যে, সকলই নিয়মের বলে ঘটিয়াছে—ক্ষণিক ইচ্ছাধীন নহে। যে সকল নিয়মে অদ্যাপি জড় প্রকৃতি শাসিতা হইতেছে, সেই সকল নিয়মের ফলেই এই ঘোর রূপান্তর ঘটিয়াছে। সেই সকল নিয়মে? তবে আর সেরূপ রূপান্তর দেখি না কেন? দেখিতেছি। তিল তিল করিয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতের রূপান্তর ঘটিতেছে। কোটি কোটি বৎসর পরে, পৃথিবী কি ঠিক এইরূপ থাকিবে? তাহা নহে।

কিরূপে এই ঘোর রূপান্তর ঘটিল, এ প্রশ্নের একটি উত্তর অতি বিখ্যাত। আমরা লাপ্লাসের মতের কথা বলিতেছি। লাপ্লাসের মত ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও জানেন—সংক্ষেপে বর্ণিত করিলেই হইবে। লাপ্লাস সৌর জগতের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, মনে কর, আদৌ সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহাদি নাই, কিন্তু সৌর জগতের প্রান্ত অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে, সৌর জগতের পরমাণুসকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। জড় পরমাণু-মাত্রেরই, পরস্পরাকর্ষণ, তাপক্ষয়, সঙ্কোচন প্রভৃতি যে সকল গুণ আছে, ঐ জগদ্ব্যাপী পরমাণুরও থাকিবে। তাহার ফলে, ঐ পরমাণুরাশি, পরমাণুরাশির কেন্দ্রকে বেষ্টন

করিয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এবং তাপক্ষতির ফলে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। সঙ্কোচনকালে, পরমাণু-জগতের বহিঃপ্রদেশসকল মধ্যভাগ হইতে বিযুক্ত হইতে থাকিবে। বিযুক্ত ভগ্নাংশ পূর্ব্বসঞ্চিত বেগের গুণে মধ্য প্রদেশকে বেড়িয়া ঘুরিতে থাকিবে। যে সকল কারণে বৃষ্টিবিন্দু গোলত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপত্তি। এবং তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও ঐরূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে।

যদি স্বীকার করা যায় যে, আদৌ পরমাণু মাত্র আকারশূন্য হইয়া জগৎ ব্যাপিয়া ছিল —জগতে আর কিছুই ছিল না—তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হয় যে, প্রচলিত নৈসর্গিক নিয়মের বলে জগৎ, সূর্য্য,* চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু বিশিষ্ট হইবে—ঠিক এখন যেরূপ, সেইরূপ হইবে। প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকার ঐশিক আজ্ঞার সাপেক্ষ নহে। এই গুরুতর তত্ত্ব, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝাইবার সম্ভাবনা নহে—এবং ইহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইতেও পারে না। আমাদের সে উদ্দেশ্যও নহে। যাঁহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বট স্পেন্সরের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। দেখিবেন যে, স্পেন্সর কেবল আকারশূন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন। স্পেন্সরের সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য।

এইরূপে যে, বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে, এমত কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। অন্য কোন প্রকারে যে, সৃষ্টি হয় নাই, তাহারও কোন নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। তবে লাপ্লাসের মতে প্রমাণবিরুদ্ধও কিছু নাই।† অসম্ভব কিছু নাই। এ মত সম্ভব, সঙ্গত—অতএব ইহা প্রমাণের অতীত হইলেও গ্রাহ্য।

এই মত প্রকৃত হইলে, স্বীকার করিতে হয় যে, আদৌ পৃথিবী ছিল না। সূর্য্যাঙ্গ হইতে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী যখন বিক্ষিপ্ত হয়, তখন ইহা বাষ্পরাশি মাত্র—নহিলে বিক্ষিপ্ত হইবে না। অতএব পৃথিবীর প্রথমাবস্থা, উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক!

একটি উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক—আকাশ-পথে বহু কাল বিচরণ করিলে কি হইবে? প্রথমে তাহার তাপহানি হইবে। সেখানে তাপের আধার মাত্র নাই—সেখানে তাপ-লেশ নাই; তাহা অচিন্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। আকাশে তাপাধার কিছুই নাই—অতএব আকাশমার্গ অচিন্তনীয় শৈত্যবিশিষ্ট। এই শৈত্যবিশিষ্ট আকাশে বিচরণ করিতে করিতে তপ্ত বাষ্পীয় গোলকের অবশ্য তাপক্ষয় হইবে। তাপক্ষয় হইলে কি হইবে?

জলের উত্তপ্ত বাষ্প সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই দেখিয়াছেন যে, ঐ বাষ্প শীতল হইলে জল হয়। আরও শীতল হইলে, জল বরফ হয়। সকল পদার্থের এই নিয়ম। যাহা উত্তপ্ত অবস্থায় বাষ্পাকৃত, তাপক্ষয়ে তাহা গাঢ়তা এবং কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।

* গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রেই সূর্য্য। জগতে কোটি কোটি সূর্য্য।

† কোমৎ, মিল, স্পেন্সর প্রভৃতি এই মত অনুমোদন করেন। সর্ জন হর্শেল বলেন, এ মত প্রমাণবিরুদ্ধ।

অতএব বাষ্পীয় গোলকাকৃতা পৃথিবীর তাপক্ষয় হইলে, কালে তাহা এক্ষণকার গাঢ়তা এবং কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

পৃথিবী কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াও কিছুকাল অগ্নিতপ্ত ছিল, বিবেচনা হয়। অপেক্ষাকৃত শীতলতা ঘটিলেই কঠিনতা জন্মিবে, কিন্তু কঠিনতা জন্মিলেই তাহার সঙ্গে জীবাবাসযোগ্য শীতলতা ছিল বিবেচনা করা যায় না। সেও কালে ঘটিযাছিল। তাপক্ষতি হেতু যে শীতলতা, তাহা উপরিভাগেরই প্রথমে ঘটে, উপরিভাগ শীতল হইলেও, ভিতর তপ্ত থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অদ্যাপি বিষম তাপ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ইহা পুনঃ পুনঃ প্রমাণীকৃত করিযাছেন।

সেই উত্তপ্ত আদিমাবস্থায়, পৃথিবীতলে কোন জীব বা উদ্ভিদের বাসের সম্ভাবনা ছিল না। উত্তপ্ত বাষ্পীয় গোলক জীবাবাসোপযোগী শীতলতা এবং কঠিনতা প্রাপ্ত হইতে লক্ষ লক্ষ যুগ অতিবাহিত হইযাছিল, সন্দেহ নাই--কেন না, আমাদের দুধের বাটি জুডাইতে যে কালবিলম্ব হয়, তাহাতেই আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির লক্ষ লক্ষ যুগ পরেও জীব বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই।

যাঁহারা ভূতত্ত্বের কিছুমাত্র জানেন, তাঁহারাও অবগত আছেন যে, পৃথিবীর উপরে নানাবিধ মৃত্তিকা এবং প্রস্তর স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত আছে। এইরূপ স্তরসন্নিবেশ কিয়দ্দূর মাত্র পাওযা যায তাহার পরে যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায, তাহা স্তরত্বশূন্য।

নীচে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর, তদুপরি স্তরে স্তরে নানাবিধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকা। এই সকল স্তরনিবদ্ধ প্রস্তর, গৈরিক বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে এমত অনেক প্রমাণ পাওয়া যায যে, তাহা এক কালে সমুদ্রতলে ছিল! এমন কি, অনেকগুলি স্তর কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রচর জীবের শরীরের সমষ্টি মাত্র। চাখড়ি নামে যে গৈরিক বা প্রস্তর প্রচলিত, তাহা ইউরোপখণ্ডের অধিকাংশের এবং আশিযার কিয়দংশের নিম্নে স্তরনিবদ্ধ আছে। এক্ষণে বর্ত্তমান অনেকগুলি পর্ব্বত কেবল চাখড়ি। এই চাখড়ি কেবল একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্রতলচর জীবের (Globigerinæ) মৃত দেহের সমষ্টি মাত্র।

অতএব এই সকল গৈরিকস্তর এক কালে সমুদ্রতলস্থ ছিল। ভূভাগের কোন স্থান কখন সমুদ্রতলস্থ হইতেছে; আবার কাল সহকারে সমুদ্র সে স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতল শুষ্ক ভূমিখণ্ড হইতেছে। ভূগর্ভস্থ রুদ্ধবায়ু বা অন্য কারণে কোথাও ভূমি কাল সহকারে উন্নত, কাল সহকারে অবনত হইতেছে। যেখানে ভূমি উন্নত হইল, সেখান হইতে সমুদ্র সরিয়া গেল, যেখানে অবনত হইল, তাহার উপরে সাগরজলরাশি আসিয়া পড়িল। তাহার উপরে সমুদ্রবাহিত মৃত্তিকা, জীবদেহাদি পতিত হইয়া একটি নূতন স্তর সৃষ্ট হইল। মনে কর, আবার কালে সমুদ্র সরিয়া গেল—সমুদ্রের তল শুষ্ক ভূমি হইল—তাহার উপর বৃক্ষাদি জন্মিয়া—জীবসকল জন্মগ্রহণ করিয়া বিচরণ করিল। আবার যদি কখন উহা সমুদ্রগর্ভস্থ হয়, তবে তদুপরি নূতন স্তর সংস্থাপিত হইবে, এবং তথায় যে সকল জীব বিচরণ করিত, তাহাদিগের দেহাবশেষ সেইস্তরে প্রোথিত হইবে। জীবের অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—কিন্তু অতি দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকিলে একরূপ প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অস্থ্যাদিকে "ফসিল" বলা যায়। পাতুরিয়া কয়লা, ফসিল কাষ্ঠ।

যে কয়টি কথা উপরে বলিলাম, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে—

১। সর্ব্বনিম্নে স্তরত্বশূন্য প্রস্তর। তদুপরি অন্যান্য গৈরিকাদি স্তরে স্তরে সন্নিবিষ্ট।

২। স্তরপরম্পরা সাময়িক সম্বন্ধবিশিষ্ট। যে স্তরটি নিম্নে, সেটি আগে, যেটি তাহার উপরে, সেটি তাহার পরে হইয়াছে।

৩। যে স্তরে যে জীবের ফসিল অস্থি পাওয়া যায়, সেই স্তর যখন শুষ্ক ভূমি বা জলতল ছিল, তখন সেই জীব বর্ত্তমান ছিল। যদি কোন স্তরে কোন জীববিশেষের ফসিল একবারে পাওয়া না যায়, তবে সেই স্তর সৃজনকালে সেই জীব ছিল না।

৪। যদি কোন স্তরে ক নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায় না, তাহার উপরিস্থ কোন স্তরে যদি ঐ খ নামক জীবের ফসিল পাওয়া যায়, তবে সিদ্ধ হইতেছে, খ নামক জন্তু ক নামক জন্তুর পরে সৃষ্ট।

সর্ব্বনিম্নস্থ স্তরত্বশূন্য প্রস্তরে কোন ফসিল ছিল না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পৃথিবীর প্রথম ভূমিতে কোন জীব বিচরণ করে নাই। তখন পৃথিবী জীবশূন্য ছিল।

যখন প্রথম স্তরমধ্যে জীবদেহের ফসিল দেখা যায়, তখন মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। মনুষ্য দূরে থাকুক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চতুষ্পদ জন্তুর ফসিল পাওয়া যায় না। মৎস্য বা সরীসৃপের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যে সকল ক্ষুদ্র কীটাদিবৎ জীবের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শম্বুকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব আদিম জীবলোকে শম্বুকেরা প্রভু ছিল।

তৎপরে মৎস্য দেখা দিল। ক্রমে উপরে উঠিতে সরীসৃপ জাতীয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালীয় সরীসৃপ অতি ভয়ঙ্কর, তাদৃশ বিচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্কর সরীসৃপ এক্ষণে পৃথিবীতে নাই। সরীসৃপের রাজ্যের পরে, স্তন্যপায়ী জীবের দেখা পাওয়া যায়। ক্রমে নানাবিধ হস্তী, ঋক্ষ, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ জাতীয় প্রভৃতি দেখা যায়, তথাপি মনুষ্য দেখা যায় না। মনুষ্যের চিহ্ন কেবল সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরে, অর্থাৎ আধুনিক মৃত্তিকায়। তন্নিম্নস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরেও কদাচিৎ মনুষ্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্যের সৃষ্টি সর্ব্বশেষে, মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক জীব।*

"আধুনিক" শব্দে এ স্থলে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল স্তরের কথা বলিলাম, সেগুলির সমবায়, পৃথিবীর ত্বকের স্বরূপ। একটি স্তরের উৎপত্তি ও সমাপ্তিতে কত লক্ষ বৎসর, কত কোটি বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাহা গণনা করিবার উপায় নাই। তবে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, সে কাল অপরিমিত—বুদ্ধির ধারণার অতীত। সর্ব্বোর্দ্ধ স্তরেই মনুষ্য-চিহ্ন, এই কথা বলিলে, এমত বুঝায় না যে, বহু সহস্র বৎসর মনুষ্য পৃথিবীবাসী নহে। তবে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সঙ্গে তুলনা করিলে বোধ হয়, মনুষ্যের উৎপত্তি এই মুহূর্ত্তে হইয়াছে। এই জন্য মনুষ্যকে আধুনিক জীব বলা যাইতেছে।

মিসর দেশের রাজাবলীর যে সকল তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে মিসরদেশে দশ সহস্র বৎসরাবধি রাজশাসন প্রচলিত আছে। হোমর, খ্রীষ্টের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীবিদিত মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন; ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। হোমরের গ্রন্থে মিসরের রাজধানী শতদ্বারবিশিষ্টা থিব্‌স্ নগরীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনুষ্যজাতি সভ্যাবস্থায় একবার উন্নতির পথে পদার্পণ করিলে,

* এ কথায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের পর কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। বোধ হয়, বিড়াল মনুষ্যের কনিষ্ঠ।

উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অসভ্যদিগের স্বতঃসম্পন্ন যে উন্নতি, তাহা অচিন্তনীয়'কাল বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। ভারতীয় বন্য জাতিগণ চারি সহস্র বৎসর সভ্য জাতির প্রতিবেশী হইয়াও বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। অতএব সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, মিসরদেশে সভ্যতা স্বতঃ জন্মিযা, যে কালে শতদ্বারবিশিষ্টা নগবী সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাব পরিমাণ বহু সহস্র বৎসর। মিসরতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, মেম্ফিজ প্রভৃতি নগবী থিব্‌স্ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগবীতে যে দেবালযাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদির উৎসবেব প্রতিকৃতি আছে। সব জর্জ কর্ণওয়াল লুইস বলেন, ঐতিহাসিক সময়ে মিসরদেশীযদিগকে কখন যুদ্ধপবাযণ দেখা যায না। অথচ কোন কালে তাহারা যুদ্ধপরাযণ না থাকিলে, তন্নির্ম্মিত মন্দিবাদিতে যুদ্ধজয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা কবিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক কালেব পূর্ব্বেই মিসরদেশীযেরা এত দূর উন্নতি লাভ কবিযাছিল যে, প্রকাণ্ড মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া জাতীয কীর্ত্তিসকল তাহাতে চিত্রিত করিত। অসভ্য জাতি কেবল আপন প্রতিভাকে সহায করিয়া যে এত দূর উন্নতি লাভ কবে, ইহা অনেক সহস্র বৎসরের কাজ। তাহার পর ঐতিহাসিক কাল অনেক সহস্র বৎসব। অতএব বহু সহস্র বৎসর হইতে মিসরদেশে মনুষ্যজাতি সমাজবদ্ধ হইযা বাস কবিতেছে। সে দশ সহস্র বৎসর, কি ততোধিক, কি তাহার কিছু ন্যূন, তাহা বলা যায না।

মিসরদেশ নীলনদী-নির্ম্মিত। বৎসব বৎসর নীলনদীর জলে আনীত কর্দ্দম-রাশিতে এই দেশ গঠিত হইযাছে। থিব্‌স্, মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী নীলনদের পলির উপর স্থাপিত হইয়াছিল। এই নদী-কদ্দম-নির্ম্মিত প্রদেশ ১৮৫১ ও ১৮৫৪ শালে রাজব্যয়ে সুযোগ্য তত্ত্বাবধাযকেব তত্ত্বাবধারণায নিখাত হইয়াছিল। নানা স্থানে খনন করা যায়। যেখানে খনন কবা হইযা গিয়াছিল, সেইখান হইতেই ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়াছিল। এমন কি, যাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। সকল স্থানে এইরূপ ইষ্টকাদি পাওয়া গিযাছিল, অতএব ঐ সকল ইষ্টক পূর্ব্বতন কূপাদিনিহিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। এই সকল খনন-কার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত আরমাণিজাতীয় কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধারণায় হইয়াছিল। লিনান্টবে নামক অপর একজন কর্ম্মচারী ৭২ ফিট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মসূর গিরার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কদ্দম, শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে পাঁচ ইঞ্চিও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হেকেকিয়ান ৬০ ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাদশ সহস্র বৎসর। মসূর রজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২।০ ইঞ্চি মাত্র জমে। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে লিনান্টবের ইষ্টকের বয়স ত্রিশ হাজার বৎসর।

অতএব যদি কেহ বলেন যে, ত্রিশ হাজার বৎসরেরও অধিক কাল মিসরে মনুষ্যের বাস, তবে তাঁহার কথা নিতান্ত প্রমাণশূন্য বলা যায় না।

মিসরে যেখানে, যতদূর খনন করা গিয়াছে, সেইখানেই পৃথিবীস্থ বর্ত্তমান জন্তুর অস্থ্যাদি ভিন্ন লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি কোথাও পাওয়া যায় নাই। অতএব যে সকল স্তরমধ্যে লুপ্ত জাতির অস্থ্যাদি পাওয়া যায়, তদপেক্ষা এই নীল-কর্দ্দমস্তর অত্যন্ত

আধুনিক। আর যদি সেই সকল লুপ্ত জন্তুর দেহাবশেষবিশিষ্ট স্তরমধ্যে মনুষ্যের তৎসহ সমসাময়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায়, তবে কত সহস্র বৎসর পৃথিবীতল মনুষ্যের আবাসভূমি, কে তাহার পরিমাণ করিবে ?

এরূপ সমসাময়িকতার চিহ্ন ফ্রান্স ও বেল্‌জ্যমে পাওয়া গিয়াছে।

জৈবনিক

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই পঞ্চভূত—আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র আসিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাঁহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলেন, আমি বিলাত হইতে নূতন ভূত আনিয়াছি, তোমরা আবার কে ? যদি ক্ষিত্যাদি জড়সড় হইয়া বলেন যে, আমরা প্রাচীন ভূত, কণাদকপিলাদির দ্বারা ভৌতিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রতি জীব-শরীরে বাস করিতেছি, বিলাতী বিজ্ঞান বলেন, তোমরা আদৌ ভূত নও। আমার "Elementary Substances" দেখ—তাহারাই ভূত ; তাহার মধ্যে তোমরা কই ! তুমি, আকাশ, তুমি কেহই নও—সম্বন্ধবাচক শব্দ মাত্র। তুমি, তেজঃ, তুমি কেবল একটি ক্রিয়া,—গতিবিশেষ মাত্র। আর, ক্ষিতি, অপ্‌, মরুৎ, তোমরা এক একজন দুই তিন বা ততোধিক ভূতে নির্ম্মিত। তোমরা আবার কিসের ভূত ?

যদি ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তবে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখনও অনেকে পঞ্চ ভূতের প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট। বাস্তবিক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। ভূতবাদীরা বলিবেন যে, যদি ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, তবে আমাদিগের এ শরীর কোথা হইতে ? কিসে নির্ম্মিত হইল ? নূতন বিজ্ঞান বলেন যে, "তোমাদের পুরাণ কথায় একেবারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহি না। জীব-শরীরের একটি প্রধান ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিব ; আর মরুতের সঙ্গে শরীরের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে,—এমন কি, শরীরের বায়ুকোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার করি। তেজঃ সম্বন্ধে ইহা স্বীকার করিতে তোমাদের বৈশেষিকেরা যে জঠরাগ্নি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব আমার লিবিগ অতি সুকৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর যদি সন্তাপকেই তেজঃ বল, তবে মানি যে, ইহা জীবদেহে অহরহঃ বিরাজ করে, ইহার লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয়। সোডা পোতাস প্রভৃতি পৃথিবী বটে তাহা অত্যল্প পরিমাণে শরীরমধ্যে আছে। আর আকাশ ছাড়া কিছুই নাই ; কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মাত্র। অতএব শরীরে পঞ্চ ভূতের অস্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ এ সকলে নির্ম্মিত নহে ; এ সকল ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন ? তৃতীয় ইহার সঙ্গে প্রাণাপানাদি বায়ু প্রভৃতি যে কতকগুলি কথা বল, বোধ হয়, হিন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন প্রচলিত থাকিলে, সে কথাগুলির প্রচার হইত না।"

"দেখ, এই তোমার সম্মুখে ইষ্টক-নির্ম্মিত মনুষ্যের বাসগৃহ। ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত,

সুতরাং ইহাতে পৃথিবী আছে। গৃহস্থ ইহাতে পানাদির জন্য কলসী কলসী জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। পাকার্থ এবং আলোকের জন্য অগ্নি জ্বালিয়াছে, সুতরাং তেজঃও বর্ত্তমান। আকাশ, গৃহমধ্যে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। সর্ব্বত্র বায়ু যাতায়াত করিতেছে। সুতরাং এ গৃহও পঞ্চভূত-নির্ম্মিত? তুমি যেমন বল, মনুষ্যের এ স্থানে প্রাণ-বায়ু, ও স্থানে অপান-বায়ু ইত্যাদি, আমিও তেমনি বলিতেছি, এই দ্বার-পথে যে বায়ু বহিতেছে, তাহা প্রাণ-বায়ু ও বাতায়ন-পথে যাহা বহিতেছে, তাহা অপান-বায়ু ইত্যাদি। তোমারও নির্দ্দেশ যেমন অমূলক ও প্রমাণশূন্য, আমার নির্দ্দেশও তেমনি প্রমাণশূন্য। তুমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিবে, আমি এই অট্টালিকা সম্বন্ধে তাহাই বলিব। তুমি যদি আমার কথা অপ্রমাণ করিতে যাও, তোমার স্বপক্ষের কথাও অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। তবে কি তুমি আমার এই অট্টালিকাটি জীব বলিয়া স্বীকার করিবে?"

প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন যে, "প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহাই মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ ঋষি-প্রণীত, তাহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন, কেন না, তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।"

আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, "কোন্‌টি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখীর মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে, তবে দুই মানি। তবে, যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি; কেন না, তা না মানিলে, লোকে আজি কালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে, এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারি না। আর বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।"

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, "প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ, তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব,—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। "সর্ব্বজ্ঞ" বা "সিদ্ধ" মানি না, আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না—কেন না, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেন না,

কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে ? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন না ; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন ; তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এ দিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছেন, 'আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না, যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি না ; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব, তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যাজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিবলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীব-শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব।' এইরূপ অভিহিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।"

যাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া কুতূহলবিশিষ্ট হইবেন, তাঁহারা বিজ্ঞান-মাতার আহ্বানানুসারে তাঁহার শবচ্ছেদ-গৃহে এবং রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় গিয়া দেখুন, পঞ্চ ভূতের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীব-শরীরের ভৌতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি দুই একটা কথা বলিয়া রাখি, তবে তাঁহাদিগের পথ একটু সুগম হইবে।

বিষয়বাহুল্যভয়ে কেবল একটি তত্ত্বই আমরা সংক্ষেপে বুঝাইব। আমরা অনুমান করিয়া রাখিলাম যে, পাঠক জীবের শারীরিক নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। গঠনের কথা বলিব না—গঠনের সামগ্রীর কথা বলিব।

এক বিন্দু শোণিত লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা কর। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দেখিবে। অধিকাংশই রক্তবর্ণ এবং সেই চক্রাণুসমূহের বর্ণ হেতুই শোণিতের বর্ণ রক্ত, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধ্যে মধ্যে, আর কতকগুলি দেখিবে, তাহা রক্তবর্ণ নহে,—বর্ণহীন, রক্ত-চক্রাণু হইতে কিঞ্চিৎ বড়, প্রকৃত চক্রাকার নহে—আকারের কোন নিয়ম নাই। শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ, পরীক্ষ্যমাণ রক্তবিন্দু যদি সেইরূপ তাপসংযুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন চক্রাণুসকল সজীব পদার্থের ন্যায় আচরণ করিবে। আপনারা যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার

পরিবর্ত্তন করিবে, কখন কোন অঙ্গ বাড়াইয়া দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্কীর্ণ করিয়া লইবে। এইগুলি যে পদার্থের সমষ্টি, তাহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটোপ্লাস্ম্ বা বিওপ্লাস্ম্ বলেন। আমরা ইহাকে "জৈবনিক" বলিলাম। ইহাই জীব-শরীর নির্ম্মাণের একমাত্র সামগ্রী। যাহাতে ইহ আছে, তাহাই জীব ; যাহাতে ইহা নাই, তাহা জীব নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীটি কি।

এক্ষণকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অনেকেই দেখিযাছেন, আচার্য্যেরা বৈদ্যুতীয যন্ত্র-সাহায্যে জল উড়াইয়া দেন। বাস্তবিক জল উড়িযা যায় না ; জল অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু তাহার স্থানে দুইটি বায়বীয় পদার্থ পাওয়া যায়—পরীক্ষক সেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধবিয়া রাখেন। সেই দুইটি পুনর্ব্বার একত্রিত করিয়া আগুন দিলে আবার জল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে জলের জন্ম। ইহাব একটির নাম অম্লজান বায়ু ; দ্বিতীয়টির নাম জলজান বায়ু।

যে বায়ু পৃথিবী ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাতেও অম্লজান আছে। অম্লজান ভিন্ন আর একটি বায়বীয় পদার্থও তাহাতে আছে। সেটি যবক্ষারেও আছে বলিয়া তাহার নাম যবক্ষারজান হইযাছে। অম্লজান ও যবক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত নহে। মিশ্রিত মাত্র। যাঁহারা রসায়নবিদ্যা প্রথম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা শুনিয়া চমৎকৃত হয়েন যে, হীরক ও অঙ্গার একই বস্তু। বাস্তবিক এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন। যে দ্রব্য উভয়ের সাব, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদি যাহা দাহ করা যায়, তাহাব দাহ্য ভাগ এই অঙ্গারজান। অঙ্গারজানের সহিত অম্লজানের রাসায়নিক যোগক্রিয়াকে দাহ বলে। এই চারিটি পদার্থ সর্ব্বদা পরস্পরে রাসায়নিক যোগে সংযুক্ত হয়। যথা, অম্লজানে জলযানে জল হয। অম্লজানে যবক্ষারজানে নাইট্রিক আসিড নামক প্রসিদ্ধ ঔষধ হয়। অম্লজানে, অঙ্গারজানে আঙ্গারিক অম্ল (কার্ব্বণিক আসিড) হয়। যে বাষ্পের কারণ সোডা ওয়াটার উছলিয়া উঠে, সে এই পদার্থ। দীপশিখা হইতে এবং মনুষ্য-নিশ্বাসে ইহা বাহির হইয়া থাকে। যবক্ষারজান এবং জলজানে আমোনিয়া নামক প্রসিদ্ধ তেজস্বী ঔষধ হইয়া থাকে। অঙ্গারজান এবং জলজানে তারপিন তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈলবৎ এবং অন্যান্য সামগ্রী হয়। ইত্যাদি।

এই চারিটি সামগ্রী যেমন পরস্পরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয়, সেরূপ অন্যান্য সামগ্রীর সহিত যুক্ত হয় এবং সেই সংযোগেই এই পৃথিবী নির্ম্মিত। যথা, সডিয়মের সঙ্গে ও ক্লোরাইনের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগবিশেষে লবণ ; চূণের সঙ্গে অম্লজান ও অঙ্গারজানের সংযোগবিশেষে মর্ম্মরাদি নানাবিধ প্রস্তর হয়, সিলিকন এবং আলুমিনার সঙ্গে অম্লজানের সংযোগে নানাবিধ মৃত্তিকা।

দুইটি সামগ্রীর রাসায়নিক সংযোগে যে এক ফল হয়, এমত নহে। নানা মাত্রায় নানা দ্রব্যের সংযোগে নানা দ্রব্য হইয়া থাকে।

জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজান, এই চারিটিই একত্রে সংযুক্ত হইয়া থাকে। সেই সংযোগের ফল জৈবনিক। জৈবনিকে এই চারিটি সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, এমত নহে ; অম্লজানাদির সঙ্গে কখন কখন গন্ধক, কখন পোতাস ইত্যাদি সামগ্রী থাকে। কিন্তু যে পদার্থে এই চারিটিই নাই, তাহা জৈবনিক নহে ;

যাহাতে এই চারিটিই আছে, তাহাই জৈবনিক। জীবমাত্রেই এই জৈবনিকে গঠিত; জীব ভিন্ন আর কিছুতেই জৈবনিক নাই। এই স্থলে জীব শব্দে কেবল প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নহে। উদ্ভিদ্‌ও জীব; কেন না, তাহাদিগেরও জন্ম, বৃদ্ধি, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের শরীরও জৈবনিকে নির্ম্মিত। কিন্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ বিষয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে।

জৈবনিক জীব-শরীরমধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব-শরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীব-শরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জীব, ভূমি এবং বায়ু হইতে অম্লজানাদি গ্রহণ করিয়া আপন শরীরমধ্যে তৎসমুদায়ের রাসায়নিক সংযোগ সম্পাদন করিয়া জৈবনিক প্রস্তুত করে; সেই জৈবনিকে আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। কিন্তু নির্জ্জীব পদার্থ হইতে জৈবনিক পদার্থ প্রস্তুত করার যে শক্তি, তাহা উদ্ভিদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শক্তি নাই; ইহারা স্বয়ং জৈবনিক প্রস্তুত করিতে পারে না, উদ্ভিদ্‌কে ভোজন করিয়া প্রস্তুত জৈবনিক সংগ্রহপূর্ব্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন জীব মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তৃণ ধান্য প্রভৃতি সেই মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে; কেন না, উহারা তাহা হইতে জৈবনিক প্রস্তুত করে, বৃষ মৃত্তিকা খাইবে না, কিন্তু সেই তৃণ ধান্যাদি খাইয়া তাহা হইতে জৈবনিক গ্রহণ করিবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে খাইয়া জৈবনিক সংগ্রহ করিবে। যাঁহারা এদেশের জমীদারগণের দ্বেষক, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, উদ্ভিদ্ জীবেরা এ জগতে চাষা, তাহারা উৎপাদন করে; অপরেরা জমীদার, তাহারা চাষার উপার্জ্জন কাড়িয়া খায়, আপনারা কিছু করে না।

এখন দেখ, এক জৈবনিকে সর্ব্বজীব নির্ম্মিত। যে ধান ছড়াইয়া তুমি পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাট্‌ও তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও তাই। সকলই জৈবনিক। প্রভেদও গুরুতর। জয়পুরী শ্বেত প্রস্তরে তোমার জলপান-পাত্র বা ভোজন-পাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; সেই প্রস্তরে তাজমহল এবং জুমা মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ে প্রভেদ নাই কে বলিবে? গোষ্পদেও জল, সমুদ্রেও জল, গোষ্পদে সমুদ্রে প্রভেদ নাই কে বলিবে?

কিন্তু স্থূল কথা বলিতে বাকি আছে। জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে জৈবনিক তাহার পূর্ব্বগামী। "অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জৈবনিকই জীবনের কারণ। জৈবনিক ভিন্ন জীবন কুত্রাপি সিদ্ধ নহে এবং জৈবনিক জীবনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। অতএব আমাদের এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল, বহু স্নেহাস্পদ জীবন, কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগসমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হাম্বোল্ট্ বা শঙ্করাচার্য্যের পাণ্ডিত্য—সকলই জড় পদার্থের ক্রিয়া; শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা সকলই জড়ের গতি। তোমার বনিতার প্রেম, বালকের অমৃত ভাষা, পিতার সদুপদেশ—সকলই জড় পদার্থের আকুঞ্চন সম্প্রসারণ মাত্র—জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই। যে যশের জন্য তুমি

প্রাণপাত করিতেছ, সে এই জৈবনিকের ক্রিয়া—যেমন সমুদ্রগর্জ্জন এক প্রকার জড়পদার্থকৃত কোলাহল, যশ তেমনি জড়পদার্থকৃত অন্য প্রকার কোলাহল মাত্র। এই সর্ব্বকর্ত্তা জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ডসকল আশ্চর্য্য বটে। পাঠক দেখিবেন যে, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত পঞ্চ ভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ (Materialism), সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,—কেন না, মনুষ্যজাতি ভূতছাড়া হইল না। নাই হউক—স্মরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্ব্বভূতময় এক জন আছেন। তাঁহা হইতে ভূতের এ খেলা।

পরিমাণ-রহস্য

আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে সূর্য্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। যে চন্দ্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার চারি শত ভাগের এক ভাগও নহে, তাহা সূর্য্যের সমদূরবর্ত্তী দেখায়। যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্ম্মিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না। আণুবীক্ষণিক জীব জৈবনিকাদি কিছুই দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাস-যোগ্য চক্ষুকেই আমাদের বিশ্বাস।

দর্শনেন্দ্রিয়ের এইরূপ শক্তিহীনতার গতিকে আমরা জগতের পরিমাণবৈচিত্র্য কিছুই বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষ্কাদি অতি বৃহৎ পদার্থকে ক্ষুদ্র দেখি, এবং অতি ক্ষুদ্র পদার্থসকলকে একেবারে দেখিতে পাই না। ভাগ্যক্রমে, মন বাহ্যেন্দ্রিয়াপেক্ষা দূরদর্শী; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে। সে পরিমাণ অতি বিস্ময়কর। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

সকলে জানেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল। যদি পৃথিবীকে এক মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ, এমত খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়, তাহা হইলে উনিশ কোটি ছয়ষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এইরূপ বর্গমাইল পাওয়া যায়। এক মাইল দীর্ঘে, এক মাইল প্রস্থে, এবং এক মাইল উর্দ্ধে এরূপ ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ঘন মাইল পাওয়া যায়। ওজনে পৃথিবী যত টন হইয়াছে, তাহা অঙ্কের দ্বারা লিখিলাম—৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সাতাইশ মণের অধিক।*

এই আকার কি ভয়ানক, তাহা মনে কল্পনা করা যায় না। সমগ্র হিমালয় পর্ব্বত ইহার নিকট বালুকাকণার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পৃথিবী সূর্য্যের আকারের সহিত তুলনায় বালুকামাত্র। চন্দ্র একটি প্রকাণ্ড উপগ্রহ, উহা পৃথিবী হইতে ২৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্য এ প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ যে, তাহা অন্তঃশূন্য করিয়া

* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

পৃথিবীকে চন্দ্রসমেত তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলে, চন্দ্র এখন যেরূপ দূরে থাকিয়া পৃথিবীর পার্শ্বে বর্ত্তন করে, সূর্য্যগর্ভেও সেইরূপ করিতে পারে, এবং চন্দ্রের বর্ত্তনপথ ছাড়াও এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল বেশী থাকে।

সূর্য্যের দূরতা কত মাইল, তাহা বালকেও জানে, কিন্তু সেই দূরতা অনুভূত করিবার জন্য, নিম্নলিখিত গণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অস্মদাদির দেশে রেলওয়ে ট্রেণ ঘণ্টায় ২০ মাইল যায়। যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কত কালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর—যদি দিন রাত্রি, ট্রেণ অবিরত ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌঁছান যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ট্রেণে চড়িবে, তাহার সপ্তদশ পুরুষ ঐ ট্রেণেই গত হইবে।*

আর বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহসকলের দূরতার সহিত তুলনায় এ দূরতাও সামান্য। বুবীর গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, রেল যদি ঘণ্টায় ৩৩ মাইল চলে, তবে সূর্য্যলোক হইতে কেহ রেলে যাত্রা করিলে, দিন রাত্র চলিয়া বৃহস্পতি গ্রহে ১৭১২ বৎসরে, শনিগ্রহে ৩১১৩ বৎসরে, ঊরেনসে ৬২২৬ বৎসরে, নেপ্‌চ্যুনে ৯৬৮৫ বৎসরে পৌঁছিবে।

আবার, এ দূরতা নক্ষত্র সূর্য্যগণের দূরতার তুলনায় কেশের পরিমাণ মাত্র। সকল নক্ষত্রের অপেক্ষা আল্‌ফা সেন্টরাই আমাদিগের নিকটবর্ত্তী; তাহার দূরতা ৬১ সিগনাই নামক নক্ষত্রের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ। এই দ্বিতীয় নক্ষত্রের দূরতা ৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মাইল। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল। সেই আলোক ঐ নক্ষত্র হইতে আসিতে দশ বৎসরের অধিক কাল লাগে। বেগা নামক নক্ষত্রেব দূরতা ১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল; আলোক সেখান হইতে ২১ বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছে। ২১ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্রের যে অবস্থা ছিল তাহা আমরা দেখিতেছি—উহার অদ্যকার অবস্থা আমাদিগের জানিবার সাধ্য নাই।

আবার নীহারিকাগণের দূরতার সঙ্গে তুলনায়, এ সকল নক্ষত্রের দূরতা সূত্র-পরিমিত বোধ হয়। বীণা (Lyra) নামক নক্ষত্রসমষ্টির বিটা ও গামা নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী অঙ্গুরীয়বৎ নীহারিকার দূরতা, সর্ উইলিয়ম্ হর্শেলের গণনানুসারে সিরিয়সের দূরতার ৯৫০ গুণ। ঐ বিটা নক্ষত্রের দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত গোলাকৃত নীহারিকা, ঐ মহাত্মার গণনানুসারে সৌর জগৎ হইতে ১,৩০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল। ত্রিকোণ নামক নক্ষত্রসমষ্টিস্থিত এক নীহারিকা, সিরিয়সের দূরতার ৩৪৪ গুণ দূরে অবস্থিত; এবং সুবৈস্কির ঢাল নামক নক্ষত্রসমষ্টিতে ঘোড়ার নালের আকার যে এক নীহারিকা আছে, তাহার দূরতা উক্ত ভীষণ মানদণ্ডের নয় শত গুণ অর্থাৎ ৫০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইলের কিছু ন্যূন।

পাদরি ডাক্তার স্কোরেস্‌বি বলেন যে, যদি আমাদিগের সূর্য্যকে এত দূর লইয়া যাওয়া যায় যে, তথা হইতে পঁচিশ হাজার বৎসরে উহার আলোক আমাদিগের চক্ষে আসিবে, উহা তথাপি লর্ড রসের বৃহৎ দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইতে পারে। যদি তাহা সত্য হয়, তবে যে সকল নীহারিকা হইতে সহস্র সহস্র প্রচণ্ড সূর্য্যের রশ্মি একত্রিত হইয়া আসিলেও, নীহারিকাকে ঐ দূরবীক্ষণে ধূমরেখামাত্রবৎ দেখা যায়, না জানি যে, কত

* আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত দেখ।

কোটি বৎসরে আলোক তথা হইতে আসিয়া আমাদিগের নয়নে লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২,০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির অষ্টগুণ যায়।

পণ্টন সাহেব জানিয়াছেন যে, রৌদ্রের আলোক, মডরেটর দীপের অপেক্ষা ৪৪৪ গুণ তীব্র। যদি কোন সামগ্রীর দুই ইঞ্চি দূরে ১৬০টা মোমবাতী রাখা যায়, তবে তাহাতে যে আলো পড়ে, সে রৌদ্রের মত উজ্জ্বল হয়। গণিত হইয়াছে যে, যদি সূর্য্য রশ্মিবিশিষ্ট পদার্থ না হইত, তবে তাহাকে মোমবাতীর সাত কোটি বিশ লক্ষ স্তরে আবৃত করিলে, অর্থাৎ নয় মাইল উচ্চ করিয়া বাতীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া, সকল বাতী জ্বালিয়া দিলে রৌদ্রের ন্যায় আলো পৃথিবীতে পাওয়া যাইত। কি ভয়ঙ্কর তাপাধার! সিনসিনেটিব ডাক্তার ভন স্থির করিয়াছেন যে, এক ফুট দূরে ১৪,০০০ বাতী রাখিলে যে তাপ পাওয়া যায়, রৌদ্রের সেই তাপ। আর সূর্য্য আমাদিগের নিকট হইতে যত দূরে আছে, তত দূরে থাকিলে ৩,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক বাতী এককালীন না পোড়াইলে রৌদ্রের ন্যায় তাপ হয় না। এ কথার অর্থ এই হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ দুই শত বাতীর গোলক পোড়াইলে যে তাপ সম্ভূত হয়, সূর্য্যদেব একদিনে তত তাপ খরচ করেন। তাঁহার তাপ যেরূপ খরচ হয়, সেইরূপ নিত্য নিত্য উৎপন্ন হইয়া জমা হইয়া থাকে। তাহা না হইলে এই মহাতাপক্ষয়ে সূর্য্যও অল্পকালে অবশ্য তাপশূন্য হইতেন। কথিত হইয়াছে যে, সূর্য্য দাহ্যমান পদার্থ হইলে এই তাপ ব্যয় করিতে দশ বৎসরে আপনি দগ্ধ হইয়া যাইতেন।

মসূর পুইলা গণনা করিয়াছেন যে, সতের মাইল উচ্চ কয়লার খনি পোড়াইলে যে তাপ জন্মে, এক বৎসরে সূর্য্য তত তাপ ব্যয় করেন। যদি সূর্য্যের তাপবাহিতা জলের ন্যায় হয়, তবে বৎসরে ২·৬ ডিগ্রী সূর্য্যের তাপ কমিবে। কুঞ্চন-ক্রিয়াতে তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য্যের ব্যাস তাহার দশ সহস্রাংশের একাংশ কমিলেই, দুই সহস্র বৎসরে ব্যয়িত তাপ সূর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে।

সূর্য্যের তাপশালিতার যে ভয়ানক পরিমাণ লিখিত হইল, স্থির নক্ষত্রমধ্যে অনেকগুলি তদপেক্ষা তাপশালী বোধ হয়। সে সকলেরও তাপ পরিমিত হইবার উপায় নাই; কেন না, তাহার রৌদ্র পৃথিবীতে আসে না, কিন্তু তাহার আলোক পরিমিত হইতে পারে। কোন কোন নক্ষত্রের প্রভাশালিতা পরিমিত হইয়াছে। আলফা সেণ্টরাই নামক নক্ষত্রের প্রভাশালিতা সূর্য্যের ২·৩২ গুণ। বেগা নক্ষত্র ষোড়শ সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। এই নক্ষত্র আমাদিগের সৌর জগতের মধ্যবর্ত্তী হইলে পৃথিব্যাদি গ্রহসকল অল্পকালমধ্যে বাষ্প হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত।

এই সকল নক্ষত্রের সংখ্যা অতি ভয়ানক। সর্ উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়াপথে ১৮,০০০,০০০ নক্ষত্র আছে। স্ত্রূব বলেন, আকাশে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। মসূর শাকর্ণাক বলেন, নক্ষত্রসংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ। এ সকল সংখ্যার মধ্যে নীহারিকাভ্যন্তরবর্ত্তী নক্ষত্রসকল গণিত হয় নাই। যেমন সমুদ্রতীরে বালুকা, নীহারিকা সেইরূপ নক্ষত্র। এখানে অঙ্ক হারি মানে।

যদি অতি প্রকাণ্ড জগৎসকলের সংখ্যা এইরূপ অননুমেয়, তবে ক্ষুদ্র পদার্থের কথা কি বলিব? ইহ্রেণবর্গ বলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি বিলিন্ শ্লেট প্রস্তরে চল্লিশ হাজার Gallionella নামক আণুবীক্ষণিক শম্বুক আছে—তবে এই প্রস্তরের একটি পর্ব্বত-

শ্রেণীতে কত আছে, কে মনে ধারণা করিতে পারে ? ডাক্তার টমাস টম্‌সন্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সীস, এক ঘন ইঞ্চির ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ পরিমিত হইয়া বিভক্ত হইতে পারে। উহাই সীসার পরমাণুর পরিমাণ। তিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গন্ধকের পরমাণু ওজনে এক গ্রেণের ২,০০০,০০০,০০০ ভাগের এক ভাগ।

(সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ)

লোকের বিশ্বাস আছে যে, সমুদ্র যত গভীর, তাহার পরিমাণ নাই। অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্র "অতল"।

অনেক স্থানে সমুদ্রের গভীরতা পরিমিত হইয়াছে। আলেক্‌জান্দ্রানিবাসী প্রাচীন গণিতব্যবসায়িগণ অনুমান করিতেন যে, নিকটস্থ পর্ব্বতসকল যত উচ্চ, সমুদ্রও তত গভীর। ভূমধ্যস্থ (Mediterranean) সমুদ্রের অনেক স্থানে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তথায় এ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ ফিটের অধিক জল পরিমিত হয় নাই—আল্‌প্স পর্ব্বত-শ্রেণীর উচ্চতাও ঐরূপ।

মিসর ও সাইপ্রস দ্বীপের মধ্যে ছয় সহস্র ফিট, আলেক্‌জান্দ্রা ও রোড্‌শের মধ্যে নয় সহস্র নয় শত, এবং মালটায় পূর্ব্বে ১৫,০০০ ফিট জল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা অন্যান্য সমুদ্রে অধিকতর গভীরতা পাওয়া গিয়াছে। হম্বোল্‌টের কস্মস্ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক স্থানে ২৬,০০০ ফিট বর্শা নামাইয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—ইহা চারি মাইলের অধিক। ডাক্তার স্কোরেস্‌বি লিখেন যে, সাত মাইল বর্শা ছাড়িয়া দিয়াও তল পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চতম পর্ব্বত-শৃঙ্গ পাঁচ মাইল মাত্র উচ্চ।

কিন্তু গড়ে, সমুদ্র কত গভীর, তাহা না মাপিয়াও গণিতবলে জানা যাইতে পারে। জলোচ্ছ্বাসের কারণ—সমুদ্রের জলের উপর সূর্য্য চন্দ্রের আর্কষণ। অতএব জলোচ্ছ্বাসের পরিণামের হেতু, (১) সূর্য্য চন্দ্রের গুরুত্ব, (২) তদীয় দূরতা, (৩) তদীয় সম্বর্ত্তনকাল, (৪) সমুদ্রের গভীরতা। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ত্ব আমরা জ্ঞাত আছি ; চতুর্থ আমরা জানি না, কিন্তু চারিটির সমবায়ের ফল, অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ, আমরা জ্ঞাত আছি। অতএব অজ্ঞাত চতুর্থ সমবায়ী কারণ অনায়াসেই গণনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য হটন এই প্রকারে গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র গড়ে, ৫.১২ মাইল, অর্থাৎ পাঁচ মাইলের কিছু অধিক মাত্র গভীর। লাপ্লাস ব্রেষ্ট নগরে জলোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণের বলে যে "Ratio of Semidiurnal Coefficients" স্থির করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও এইরূপ উপলব্ধি করা যায়।

(শব্দ)

সচরাচর শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৩৮ ফিট গিয়া থাকে বটে, কিন্তু বের্থেম ও ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বৈদ্যুতিক তারে প্রতি সেকেণ্ডে, ১১,৪৫৬ ফিট বেগে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতএব তারে কেবল পত্র প্রেরণ হয়, এমত নহে ; বৈজ্ঞানিক শিল্প আরও কিছু উন্নতি প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য তারে কথোপকথন করিতে পারিবে।*

* এই প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার পরে টেলিফোনের আবিষ্ক্রিয়া

মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কত দূর যায়? বলা যায় না। কোন কোন যুবতীর ব্রীড়ারুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিবার সময়ে, বিরক্তিক্রমে ইচ্ছা করে যে, নাকের চসমা খুলিয়া কাণে পরি, কোন কোন প্রাচীনার চীৎকারে বোধ হয়, গ্রামান্তরে পলাইলেও নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেখা যাউক।

প্রাচীন মতে আকাশ শব্দবহ; আধুনিক মতে বায়ু শব্দবহ। বায়ুর তরঙ্গে শব্দের সৃষ্টি ও বহন হয়। অতএব যেখানে বায়ু তরল ও ক্ষীণ, সেখানে শব্দের অস্পষ্টতা সম্ভব। ব্লাঙ্্‌শৃঙ্গোপরি শব্দ অস্পষ্টশ্রাব্য বলিয়া শস্যোর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তথায় পিস্তল ছুড়িলে পটকার মত শব্দ হয়, এবং শ্যাম্পেন খুলিলে কাকের শব্দ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মার্শ্যস বলেন যে, তিনি সেই শৃঙ্গোপরেই ১৩৪০ ফিট হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনিয়াছিলেন। এ বিষয়ে "গগনপর্য্যটন" প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছে।

যদি শব্দবহ বায়ুকে চোঙ্গার ভিতরে রুদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্যকণ্ঠ যে অনেক দূর হইতে শুনা যাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না, শব্দ-তরঙ্গসকল ছড়াইয়া পড়িবে না।

স্থির জল, চোঙ্গার কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চতায় বায়ু প্রতিহত হইতে পায় না—এজন্য শব্দ-তরঙ্গসকল, ভগ্ন হইয়া নানা দিক্ দিগন্তরে বিকীর্ণ হয় না। এই জন্য প্রশস্ত নদীর এপার হইতে ডাকিলে ওপারে শুনিতে পায়। বিখ্যাত হিমবেন্দ্রানুসারী পর্য্যটক পারির সমভিব্যাহারী লেপ্টেনান্ট ফষ্টর লিখেন যে, তিনি পোর্ট বৌয়েনের এপার হইতে পরপারে স্থিত মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে ১।০ মাইল ব্যবধান। ইহা আশ্চর্য্য বটে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ডাক্তার ইয়ং কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, জিব্র টরে দশ মাইল হইতে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনা গিয়াছে। কথা বিশ্বাসযোগ্য কি?

(জ্যোতিস্তরঙ্গ)

প্রবন্ধান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আলোক ইথর নামপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী জাগতিক তরল পদার্থের আন্দোলনের ফল মাত্র। সূর্য্যালোক, সপ্ত বর্ণের সমবায়; সেই সপ্ত বর্ণ ইন্দ্রধনু অথবা স্ফাটিক প্রেরিত আলোকে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক বর্ণের তরঙ্গসকল পৃথক্ পৃথক্; তাহাদিগের প্রাকৃতিক সমবায়ের ফলে, শ্বেত রৌদ্র। এই সকল জ্যোতিস্তরঙ্গ-বৈচিত্র্যই জগতের বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ। কোন কোন পদার্থ, কোন কোন বর্ণের তরঙ্গসকল রুদ্ধ করিয়া, অবশিষ্টগুলি প্রতিহত করে। আমরা সে সকল দ্রব্যকে প্রতিহত তরঙ্গের বর্ণবিশিষ্ট দেখি।

তবে তরঙ্গেরই বা বর্ণ-বৈষম্য কেন? কোন তরঙ্গ রক্ত, কোন তরঙ্গ পীত, কোন তরঙ্গ নীল কেন? ইহা কেবল তরঙ্গের বেগের তারতম্য। প্রতি ইঞ্চি স্থান মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার তরঙ্গের উৎপত্তি হইলে, তরঙ্গ রক্তবর্ণ, অন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় তরঙ্গ পীতবর্ণ, ইত্যাদি।

যে জ্যোতিস্তরঙ্গ এক ইঞ্চি মধ্যে ৩৭,৬৪০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা রক্তবর্ণ। পীত তরঙ্গ, এক ইঞ্চিতে ৪৪,০০০ বার, এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৫৩৫,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। এবং

নীল তরঙ্গ প্রতি ইঞ্চিতে ৫১,১১০ বার এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৬২২,০০০,০০০,০০০,০০০ বার প্রক্ষিপ্ত হয়। পরিমাণের রহস্য ইহা অপেক্ষা আর কি বলিব? এমন অনেক নক্ষত্র আছে যে, তাহার আলোক পৃথিবীতে পঞ্চাশ বৎসরেও পৌঁছে না। সেই নক্ষত্র হইতে যে আলোকরেখা আমাদের নয়নে আসিয়া লাগে, তাহার তরঙ্গসকল কতবার প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? এবার যখন রাত্রে আকাশ প্রতি চাহিবে, তখন এই কথাটি একবার মনে করিও।

(সমুদ্র-তরঙ্গ)

এই অচিন্ত্য বেগবান্ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম জ্যোতিস্তরঙ্গের আলোচনার পর, পার্থিব জলের তরঙ্গমালার আলোচনা অবিধেয় নহে। জ্যোতিস্তরঙ্গের বেগের পরে, সমুদ্রের ঢেউকে অচল মনে করিলেও হয়। তথাপি সাগর-তরঙ্গের বেগ মন্দ নহে। ফিণ্‌লে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি বৃহৎ সাগরোর্ম্মিসকল ঘণ্টায় ২০ মাইল হইতে ২৭॥০ মাইল পর্য্যন্ত বেগে ধাবিত হয়। স্কোরেস্‌বি সাহেব গণনা করিয়াছেন যে, আটলাণ্টিক সাগরের তরঙ্গ ঘণ্টায় প্রায় ৩৩ মাইল চলে। এই বেগ ভারতবর্ষীয় বাষ্পীয় রথের বেগের অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর।

যাঁহারা বাঙ্গালার নদীবর্গে নৌকারোহণ করিতে ভীত, সাগরোর্ম্মির পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ অনুমান, তাহা বলিতে পারি না। উপকথায় "তালগাছপ্রমাণ ঢেউ" শুনা যায়—কিন্তু কেহ তাহা বিশ্বাস করে না। সমুদ্রে তদপেক্ষা উচ্চতর ঢেউ উঠিয়া থাকে। ফিণ্‌লে সাহেব লিখেন, ১৮৪৩ অব্দে কর্ম্বালের নিকট ৩০০ ফিট অর্থাৎ ২০০ হাত উচ্চ ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৮২০ সালে নরওয়ে প্রদেশের নিকট ৪০০ ফিট পরিমিত ঢেউ উঠিয়াছিল।

সমুদ্রের ঢেউ অনেক দূর চলে। উত্তমাশা অন্তরীপে উদ্ভূত মগ্ন তরঙ্গ তিন সহস্র মাইল দূরস্থ উপদ্বীপে প্রহত হইয়া থাকে। আচার্য্য বাচ বলেন যে, জাপান দ্বীপাবলীর অন্তর্গত সৈমোদা নামক স্থানে একটা ভূমিকম্প হয়; তাহাতে ঐ স্থানসমীপস্থ "পোতাশ্রয়ে" এক বৃহৎ উর্ম্মি প্রবেশ করিয়া, সরিয়া আসিলে পোতাশ্রয় জলশূন্য হইয়া পড়ে। সেই ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে, সানফ্রন্‌সিস্কো নগরের উপকূলে প্রহত হয়। সৈমোদা হইতে ঐ নগর ৪৮০০ মাইল। তরঙ্গরাজ ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে পার হইয়াছিলেন অর্থাৎ মিনিটে ৬॥০ মাইল চলিয়াছিলেন।

চন্দ্রলোক

এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, খোশামোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্র-বদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা, শশী, মাসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর, হিমকরকরনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া, কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ

ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে, সাহেব অক্রূর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র, বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।

যখন অভিমন্যু-শোকে ভদ্রাৰ্জ্জুন অত্যন্ত কাতর, তখন তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ কথিত হইয়াছিল যে, অভিমন্যু চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। আমরাও যখন নীলগগন-সমুদ্রে এই সুবর্ণের দ্বীপ দেখি, আমরাও মনে করি, বুঝি এই সুবর্ণময় লোকে সোনার মানুষ সোনার থালে সোনার মাছ ভাজিয়া সোনার ভাত খায়, হীরার সরবত পান করে, এবং অপূর্ব্ব পদার্থের শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় কাল কাটায়। বিজ্ঞান বলে, তাহা নহে—এ পোড়া লোকে যেন কেহ যায় না—এ দগ্ধ মরুভূমি মাত্র। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

বালকেরা শৈশবে পড়িয়া থাকে, চন্দ্র উপগ্রহ। কিন্তু উপগ্রহ বলিলে, সৌরজগতের সঙ্গে চন্দ্রের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইল না। পৃথিবী ও চন্দ্র যুগল গ্রহ। উভয়ে এক পথে, একত্র সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে—উভয়েই উভয়ের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের বশবর্ত্তী—কিন্তু পৃথিবী গুরুত্বে চন্দ্রের একাশী গুণ, এজন্য পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি চন্দ্রাপেক্ষা এত অধিক যে, সেই যুক্ত আকর্ষণে কেন্দ্র পৃথিবীস্থিত; এজন্য চন্দ্রকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ বোধ হয়। সাধারণ পাঠকে বুঝিবেন যে, চন্দ্র একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবী; ইহার ব্যাস ১০৫০ ক্রোশ; অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চতুর্থাংশের অপেক্ষা কিছু বেশী। যে সকল কবিগণ নায়িকাদিগকে আর প্রাচীন প্রথামত চন্দ্রমুখী বলিয়া সন্তুষ্ট নহেন—নূতন উপমার অনুসন্ধান করেন—তাঁহাদিগকে আমরা পরামর্শ দিই যে, এক্ষণ অবধি নায়িকাগণকে পৃথিবীমুখী বলিতে আরম্ভ করিবেন। তাহা হইলে অলঙ্কারের কিছু গৌরব হইবে। বুঝাইবে যে, সুন্দরীর মুখমণ্ডলের ব্যাস কেবল সহস্র ক্রোশ নহে—কিছু কম চারি সহস্র ক্রোশ।

এই ক্ষুদ্র পৃথিবী আমাদিগের পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ মাত্র—ত্রিশ হাজার যোজন মাত্র। গাগনিক গণনায় এ দূরতা অতি সামান্য—এপাড়া ওপাড়া। ত্রিশটি পৃথিবী গায় গায় সাজাইলে চন্দ্রে গিয়া লাগে। চন্দ্র পর্য্যন্ত রেলওয়ে যদি থাকিত, তাহা হইলে ঘণ্টায় বিশ মাইল গেলে, দিন রাত্র চলিলে, পঞ্চাশ দিনে পৌঁছান যায়।

সুতরাং আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চন্দ্রকে অতি নিকটবর্ত্তী মনে করেন। তাঁহাদিগের কৌশলে এক্ষণে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা চন্দ্রাদিকে ২৪০০ গুণ বৃহত্তর দেখা যায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, চন্দ্র যদি আমাদিগের নেত্র হইতে পঞ্চাশৎ ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে আমরা চন্দ্রকে যেমন স্পষ্ট দেখিতাম, এক্ষণেও ঐ সকল দূরবীক্ষণ সাহায্যে সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পারি।

এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে চন্দ্রকে কিরূপ দেখা যায়? দেখা যায় যে, তিনি হস্তপদাদি-বিশিষ্ট দেবতা নহেন, জ্যোতির্ময় কোন পদার্থ নহেন, কেবল পাষাণময়, আগ্নেয় গিরিপরিপূর্ণ, জড়পিণ্ড। কোথাও অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা—কোথাও গভীর গহ্বররাজি। চন্দ্র যে উজ্জ্বল, তাহা সূর্য্যালোকের কারণে। আমরা পৃথিবীতেও দেখি যে, যাহা রৌদ্রপ্রদীপ্ত, তাহাই দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়। চন্দ্রও রৌদ্রপ্রদীপ্ত বলিয়া উজ্জ্বল।

কিন্তু যে স্থানে রৌদ্র না লাগে, সে স্থান উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। সকলেই জানে যে, চন্দ্রের কলায় কলায় হ্রাস বৃদ্ধি এই কারণেই ঘটিয়া থাকে। সে তত্ত্ব বুঝাইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যাইবে, যে স্থান উন্নত, সেই স্থানে রৌদ্র লাগে—সেই স্থান আমরা উজ্জ্বল দেখি—যে স্থানে গহ্বর অথবা পর্ব্বতের ছায়া, সে স্থানে রৌদ্র প্রবেশ করে না—সে স্থলগুলি আমরা কালিমাপূর্ণ দেখি। সেই অনুজ্জ্বল রৌদ্রশূন্য স্থানগুলিই "কলঙ্ক"—অথবা "মৃগ"—প্রাচীনাদিগের মতে সেইগুলিই "কদমতলায় বুড়ী চরকা কাটিতেছে।"

চন্দ্রের বহির্ভাগেব এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান হইয়াছে যে, তাহায় চন্দ্রের উৎকৃষ্ট মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে ; তাহার পর্ব্বতাবলী ও প্রদেশসকল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এবং তাহার পর্ব্বতমালার উচ্চতা পরিমিত হইয়াছে। বেয়র ও মাল্লর নামক সুপরিচিত জ্যোতির্ব্বিদদ্বয় অন্যূন ১০৯৫টি চান্দ্র পর্ব্বতের উচ্চতা পরিমিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মনুষ্যে যে পর্ব্বতের নাম রাখিয়াছে "নিউটন", তাহার উচ্চতা ২২,৮২৩ ফিট। এতাদৃশ উচ্চ পর্ব্বতশিখর, পৃথিবীতে আন্দিস্ ও হিমালয়শ্রেণী ভিন্ন আর কোথাও নাই। চন্দ্র পৃথিবীর পঞ্চাশৎ ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং গুরুত্বে একাশী ভাগের এক ভাগ মাত্র ; অতএব পৃথিবীর তুলনায়, চান্দ্র পর্ব্বতসকল অত্যন্ত উচ্চ। চন্দ্রের তুলনায় নিউটন যেমন উচ্চ, চিম্বারোজা নামক বৃহৎ পার্থিব শিখরের অবয়ব আর পঞ্চাশৎ গুণে বৃদ্ধি পাইলে পৃথিবীর তুলনায় তত উচ্চ হইত।

চান্দ্র পর্ব্বত কেবল যে আশ্চর্য্য উচ্চ, এমত নহে ; চন্দ্রলোকে আগ্নেয় পর্ব্বতের অত্যন্ত আধিক্য। অগণিত আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী অগ্ন্যুদ্গারী বিশাল রন্ধ্রসকল প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছে—যেন কোন তপ্ত দ্রবীভূত পদার্থ কটাহে জ্বাল প্রাপ্ত হইয়া কোন কালে টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া জমিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্রধা বিভিন্ন, সহস্র সহস্র বিবরবিশিষ্ট,—কেবল পাষাণ, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ, পাষাণময়। হায়! এমন চাঁদের সঙ্গে কে সুন্দরীদিগের মুখের তুলনা করার পদ্ধতি বাহির করিয়াছিল ?

এই ত পোড়া চন্দ্রলোক! এক্ষণে জিজ্ঞাসা, এখানে জীবের বসতি আছে কি ? আমরা যত দূর জানি, জল বায়ু ভিন্ন জীবের বসতি নাই, যেখানে জল বা বায়ু নাই, সেখানে আমাদের জ্ঞানগোচরে জীব থাকিতে পারে না। যদি চন্দ্রলোকে জল বায়ু থাকে, তবে সেখানে জীব থাকিতে পারে ; যদি জল বায়ু না থাকে, তবে জীব নাই, এক প্রকার সিদ্ধ করিতে পারি। এক্ষণে দেখা যাউক, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

মনে কর, চন্দ্র পৃথিবীর ন্যায় বায়বীয় মণ্ডলে বেষ্টিত। মনে কর, কোন নক্ষত্র, চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া গতি করিবে। ইহাকে জ্যোতিষে সমাবরণ (Occultation) বলা যাইতে পারে। নক্ষত্র চন্দ্র কর্তৃক সমাবৃত হইবার কালে প্রথমে, বায়ুস্তরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে ; তৎপরে চন্দ্রশরীরের পশ্চাতে লুকাইবে। যখন বায়বীয় স্তরের পশ্চাতে নক্ষত্র যাইবে, তখন নক্ষত্র পূর্ব্বমত উজ্জ্বল বোধ হইবে না ; কেন না, বায়ু আলোকের কিয়ৎপরিমাণে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। নিকটস্থ বস্তু আমরা যত স্পষ্ট দেখি, দূরস্থ বস্তু আমরা তত স্পষ্ট দেখিতে পাই না—তাহার কারণ, মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তর। অতএব সমাবরণীয় নক্ষত্র ক্রমে হ্রস্বতেজা হইয়া পরে চন্দ্রান্তরালে অদৃশ্য হইবে। কিন্তু এরূপ ঘটিয়া থাকে না। সমাবরণীয় নক্ষত্র একেবারেই নিবিয়া যায়—নিবিবার পূর্ব্বে

তাহার উজ্জ্বলতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। চন্দ্রে বায়ু থাকিলে কখন এরূপ হইত না।

চন্দ্রে যে জল নাই, তাহারও প্রমাণ আছে, কিন্তু সে প্রমাণ অতি দুরূহ—সাধারণ পাঠককে অল্পে বুঝান যাইবে না। এবং এই সকল প্রমাণ বর্ণ-রেখা-পরীক্ষক (Spectroscope) যন্ত্রের বিচিত্র পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে; চন্দ্রলোকে জলও নাই, বায়ুও নাই। যদি জল বায়ু না থাকে, তবে পৃথিবীবাসী জীবের ন্যায় কোন জীব তথায় নাই।

আর একটি কথা বলিয়াই আমরা উপসংহার করিব। চান্দ্রিক উত্তাপও এক্ষণে পরিমিত হইয়াছে। চন্দ্র এক পক্ষকালে আপন মেরুদণ্ডের উপর সম্বর্ত্তন করে, অতএব আমাদের এক পক্ষকালে এক চান্দ্রিক দিবস। এক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখ যে, পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা এত তাপাধিক্য ভোগ করি, তাহার কারণ—পৌষ মাসে দিন ছোট, জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন তিন চারি ঘণ্টা বড। যদি দিনমান তিন চারি ঘণ্টা মাত্র বড হইলেই, এত তাপাধিক্য হয, তবে পাক্ষিক চান্দ্র দিবসে না জানি, চন্দ্র কি ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। তাতে আবাব পৃথিবীতে জল, বায়ু, মেঘ আছে—তজ্জন্য পার্থিব সন্তাপ বিশেষ প্রকারে শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জল বায়ু মেঘ ইত্যাদি চন্দ্রে কিছুই নাই। তাহার উপর আবার চন্দ্র পাষাণময়। অতি সহজে উত্তপ্ত হয়। অতএব চন্দ্রলোক অত্যন্ত তপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। বিখ্যাত দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণকারীর পুত্র লর্ড রস চন্দ্রের তাপ পরিমিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, চন্দ্রের কোন কোন অংশ এত উষ্ণ, তত্তুলনায় যে জল অগ্নিসংস্পর্শে ফুটিতেছে, তাহাও শীতল। সে সন্তাপে কোন পার্থিব জীব রক্ষা পাইতে পারে না—মুহূর্ত্ত জন্যও রক্ষা পাইতে পারে না। এই কি শীতরশ্মি, হিমকর, সুধাংশু? হায়! হায়। অন্ধ পুত্রকে পদ্মলোচন আব কেমন করিয়া বলিতে হয়!*

অতএব সুখের চন্দ্রলোক কি প্রকাব, তাহা এক্ষণে আমরা একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। চন্দ্রলোক পাষাণময়,—বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্ন-ভিন্ন, বন্ধুর, দগ্ধ, পাষাণময়! জলশূন্য, সাগরশূন্য, নদীশূন্য, তডাগশূন্য, বায়ুশূন্য, মেঘশূন্য, বৃষ্টিশূন্য,—জনহীন, জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, শব্দহীন,† উত্তপ্ত, জ্বলন্ত, নরককুণ্ডতুল্য এই চন্দ্রলোক।

এই জন্য বিজ্ঞানকে কাব্য আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কাব্য গড়ে—বিজ্ঞান ভাঙ্গে।

---

* যদি কেহ বলেন যে, চন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আমরা তাঁহার আলোকেব শৈত্য স্পর্শের প্রত্যক্ষ দ্বারা জানিয়া থাকি। বাস্তবিক এ কথা সত্য নহে—আমবা স্পর্শ দ্বাবা চন্দ্রলোকের শৈত্য বা উষ্ণতা কিছুই অনুভূত কবি না। অন্ধকার-রাত্রের অপেক্ষা জ্যোৎস্না রাত্রি শীতল এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে সে তাঁহার মনেব বিকার মাত্র। বরং চন্দ্রালোকে কিঞ্চিৎ সন্তাপ আছে; সেটুকু এত অল্প যে, তাহা আমাদিগের স্পর্শের অনুভবনীয় নহে। কিন্তু জাস্তেদেশী, মেলনি, পিযাজি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

† কেন না, বায়ু নাই।

সম্পাদকের নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে 'বিজ্ঞানরহস্যে'র দুটি সংস্করণ প্রচারিত হয় —প্রথমটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয়টি ১২৯১ বঙ্গাব্দে। প্রথম সংস্করণে 'সর্ উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা' নামে একটি রচনা ছিল, সেটি দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়; তার স্থানে 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটি গৃহীত হয়।

প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' ছিল এই :

"বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই—কৃতবিদ্য পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মৃতির উপর নিভর করিয়া লিখিত হইয়াছে,—অথচ স্মৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিতবিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক, সময়াভাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব। যিনি যেখানে যে ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন, ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করা যাইবে।

"এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্স্লী, টিণ্ডল, প্রক্টর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। তবে টিণ্ডল সাহেবের 'Dust and Disease' নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্মে, 'ধূলা', গ্লেশর সাহেবের গ্রন্থ হইতে 'গগনপর্য্যটন', হক্স্লীর 'Lay Sermons' হইতে 'জৈবনিক', এবং লায়েল সাহেবের 'Antiquity of Man' হইতে 'কত কাল মনুষ্য ?' নামক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

"লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা, এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন। কত দূর এ উদ্দেশ্য সফল হইবে, বলিতে পারি না।"

দ্বিতীয় সংস্করণে এ ভূমিকা ছিল না, তার জায়গায় আর কোনো 'বিজ্ঞাপন'ও মুদ্রিত হয় নি।—সম্পাদক, ব. র. স.

কমলাকান্ত

কমলাকান্তের দপ্তর

অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত। সে কখন্ কি বলিত, কি করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। লেখাপড়া না জানিত, এমত নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কিন্তু যে বিদ্যায় অর্থোপার্জ্জন হইল না, সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেব সুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ, কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে,—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তের মত বিদ্বান্, যাহারা কেবল কতকগুলা বহি পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।

কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল। একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া, ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না। সরকারি বহিতে কবিতা লিখিত—আপিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র নামক কে লেখক আছে, তাহার বচন তুলিয়া লিখিয়া রাখিত; বিলবহির পাতায় ছবি আঁকিয়া রাখিত। এক বার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল "যথার্থ পে-বিল।" সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত তখন দারপরিগ্রহ করে নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেক দিন আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। এক দিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া-বস্ত্র পরিয়া, কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে পাইলাম না। সে এ পর্য্যন্ত আর ফিরে নাই।

তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কি মাথা মুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না। কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। গমনকালে, কমলাকান্ত আমাকে সেই দপ্তরটি দিয়া গেল। বলিয়া গেল, তোমাকে ইহা বখ্‌শিশ করিলাম।

এ অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব? প্রথমে মনে করিলাম, অগ্নিদেবকে উপহার দিই। পরে লোকহিতৈষিতা আমার চিত্তে বড় প্রবল হইল। মনে করিলাম যে, যে লোকের উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎ-

কৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদিগের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস

প্রথম সংখ্যা

একা

"কে গায় ওই?"

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গাযিতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনাব মনের সুখেব মাধুর্য্য বিকীর্ণ কবিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? বাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ-শরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; বাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া, আনন্দ কবিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সংগীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সংগীতে আমাব শরীর কন্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সংগীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন

সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লত, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি, উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে, যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার

জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সংগীত আর কি শুনিব না? শুনিব কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসৃত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারসংগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক্ জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়ই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস-রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দাল্‌না রাঁধিয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কাঁটাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্ ভন্ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,—সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের

শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না, কিছু রস দাও ;—সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সর্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা বাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলো আম এমন কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে—পাকিলে পান্‌শে। কতকগুলো জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিযা ঠাণ্ডা কবিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোশা-মোদ-ববফ দিও—বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার!

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা। কদলীফলেব সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক—কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরেব প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্ম্মুখ—আমি ইঁহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসাবের নারিকেল। কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতির্ম্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দ্দিক্ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা

পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোব্‌ড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে—তোমার যৌবনমধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একটি মার্কাড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন্ বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোব্‌ড়া, স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্‌ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;—পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্‌ড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা, দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।*

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে কপালে নারিকেল যোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়—পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামা, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফোটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া, ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অগুর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতূরা। আমি অনেক দিন হইতে মানস করিযাছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব—কিন্তু এই অধম ধুতূরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতূরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি সাজিয়া দেয়—যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপক-দিগের নিকট দুই-চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিযা তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি—ইঁহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল

---

* কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে; কেন না, পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড!—ভীষ্মদেব।

কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায়, তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যেই অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া, ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন,—তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না—আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু বাঁধিবার বেলায় কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই আজ ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।—তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিক, ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি* বা উদর-দর্শন

বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি এই হিতবাদ মতে অমত করি না, বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র

---

* "ইউটিলিটি" শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না—কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই—অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র, ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—"ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা, "টিল্" শব্দে চাষ করা, "ইট্" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট-ই" পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, "তোমরা চাষ করিয়াই খাও।" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল! ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরূহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয়জন বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই,—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য।—"বৃহৎ"—অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বত-গুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।

"গহ্বর"—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।

ভাষ্য।—সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদর পূর্ত্তি।

"আধিভৌতিক"—অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।

"আধ্যাত্মিক"—যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুব্ধ হইয়া, কালযাপন করেন, তাঁহা-দিগের আধ্যাত্মিক উদরপূর্ত্তি হয়।

"আধিদৈবিক"—দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পুরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্ত্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।

ভাষ্য।—"বিহিত"—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।

এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্ত্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়্‌বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য।—১। "বিদ্যা"—বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ-পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে

না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

২। "বুদ্ধি"—যে আশ্চর্য্য শক্তিদ্বারা তূলাকে লৌহ, লৌহকে তূলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকে বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

৩। "পরিশ্রম"—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ু সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

৪। "উপাসনা"—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষযুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তনকে স্পষ্ট-বক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।

৫। "বল"—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক হাঁক,—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরাজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি,—দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্দ্ধ তিপ্পান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।

বল ষড়্বিধ, যথা :—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।

পাদ—পলায়নাদি।

চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত,—"বালানাং রোদনং বলং" ইত্যাদি।

ত্বাচ—প্রহারসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

৬। প্রতারণা—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।

এক, পণ্যাজীব। প্রমাণ—দোকানদার জিনিষ বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইঁহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইঁহাদিগের নাম "ভণ্ড"। ইঁহারা যে প্রতারক, তাহাব বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইঁহাবা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড়্‌বিধ উপায়ের দ্বারা উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য।—এই সূত্রেব দ্বাবা পূর্ব্বপণ্ডিতদিগেব মত খণ্ডন কবা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়্‌বিধ উপাযেব দ্বারা যে উদবপূর্ত্তি হইতে পাবে না, ক্রমে তাহাব উদাহবণ দেওয়া যাইতেছে।

"বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদবপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন?

"বুদ্ধি"—বুদ্ধিতে যদি উদবপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন?

"পবিশ্রম"—পবিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুবা কেরাণী কেন?

"উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই।

"বল"—বলে যদি হইত, তবে আমবা পডিয়া মাব খাই কেন?

"প্রতারণা"—প্রতাবণায যদি হইত, তবে মদেব দোকান কখন কখন ফেল হয কেন?

৬। উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য।—উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেবা লোকেব কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিত-সাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতিব হিতসাধন কবিযাছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিযাব হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশেব হিতসাধন কবিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয পুস্তক ও পত্রাদি প্রণযন দ্বাবা দেশের হিতসাধন কবিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পবিমাণে উদর-পূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইতেছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য।—এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দশনের একতা প্রতি-পাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা কবি, ইহা ভারতবর্ষেব সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,—আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়া-পরম্পরার একটি ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম—কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম—শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি—তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সে কালে ভাল ছিলে—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারি দিকে ঘুরে বেড়াই—প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে, আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গ জাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না—আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,—আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,—আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?—লইয়া কি করিব?—নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি—তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্য-শূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাহিরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি

ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে ? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে ? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না ?

তুমি কি ? তা আমি জানি না—আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু—আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন—জীবনের আশা—মরণের আশ্রয় । তোমাকে কখন জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে । কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে ?

তোমাকে কি পাইব না ? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে ? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না ? ভাল থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি—বোঁ-ও-ও ।

পতঙ্গ পড়িয়া গেল ।

..

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত !" আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম । কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া, তামাকু টানিতেছে । সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে । এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ । সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে । জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময় । আবার সংসার কাচময় । যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই । কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত । যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত । অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল । রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি । এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি । মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন ;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল । জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost" । ধর্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল । ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, "আন্টনি, ক্লিওপেত্রা" । রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত," ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো" । গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে । স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি । বহ্নি কি, আমরা জানি না । রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই । এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে । ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে । ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি ? তাহা কি, কিছু জানি না । তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি । আমরা পতঙ্গ না ত কি ?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, "বোঁ" করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

পঞ্চম সংখ্যা

আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না? তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফ্‌তার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুট-টক-বকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণু-কর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্‌ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায়, পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্‌কি টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না—আর নিন্দকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না—নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত।

ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না, প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন, এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল—আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার অনেক কারণ আছে—প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনা-মূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনবি?" সে বলিল, "শুনিব।" আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম—সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব—সে আমার অনুরোধে আফিম্ ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরের জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোহালঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, এবং ঘটোধ্নী। এক জন গব্যরস সৃজন করেন, আর এক জন হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়েরই নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগ, এবং গভীর-কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলা ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ও? সঙ্গ নিয়েছ কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর করিয়া আমি ফিরিয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পায় না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুথি ছিল—তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না—এখনও নাই। কিছুতে আমার মন নাই—আমার মন কোথা গেল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম—পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে, প্রথমতঃ অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়, এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্য বস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ, কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়, সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে, ধন পত্নীজারেও ভোগ করে, মান সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারে তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছ, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমত কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে—শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম। করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু

কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না। নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না—কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির"* উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ্ বড় ভালবাসেন—ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্য সম্পদ্ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও—কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেক্চর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝন্ঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া

---

* বাহ্য সম্পদ্।

যাউক ! মন ! মন আবার কি ? টাকা ছাড়া মন কি ? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই ; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্। হর হর বম্ বম্ ! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত ; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয় ; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁসিদার ; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথাচন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্ ! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল,—ছ্যাড়্ ছ্যাড্ ছ্যাড্ ছ্যাড্ ছ্যাড্ ছ্যাড্ ছ্যাড্! বাজা ভাই কাঁসিদার,—ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং ! আসুন পুরোহিত মহাশয় ! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্ কামার ! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিযাছি, একবার বাবা পঞ্চানন্দের* নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর ! হর হর বম্ বম্ ! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও ! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর !

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে ? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে ? কয় জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে ? কয় জন অপবিত্র পবিত্র হইযাছে ? এক জনও না ? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না—আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারতবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই ; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী ; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না ? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না ? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই ; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব ? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি ?

* পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে—পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়িজুড়ি, পোষাক এবং বেশ্যা—এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মাজ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ , অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার ?

ষষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রালোকে

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্রে, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে, এই স্ফুট-চন্দ্রালোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রৈলস্ শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন ! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিসবী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামসের সঙ্কেতস্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন ? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীত্ববাচক একটি 'ইনী' আছে ; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতে "পসারিণী" বলিয়াছে,. কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ ? তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম—একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত ! অমল-ধবল-কিরণরাশি সুধাংশো ! আর সকল তোমার থাক, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে—লোকে নিজে অক্ষমতানিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া, স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া,

লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে। আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব।

চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলকে ঝলক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব!

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নির্-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি. এ. না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর খাট—রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পট্টবসনাবৃতা, একটি বংশখণ্ডিকা! হরি হরি বল, ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি. এ. উপাধিধারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!!* প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন। তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-কুটীরের একমাত্র দণ্ডিকা একটি বংশ-খণ্ডিকা পাইয়াছেন, তিনি তাহার চিরবাঞ্ছিত হেমকূট পর্ব্বত নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষালাভার্থ বহু যত্নে কামস্কট্‌কা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শালিমানের ঊর্দ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্‌পান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দণ্ডিকার স্থাপন করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।

এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি, আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাও কর্ত্তব্য, তথাপি এরূপ বংশদণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গপ্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব, যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে—ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।

* বোধ হয়, এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।
—শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্জ্জটীর জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নামিত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে "ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং" বলিয়া আর তোমার স্তব স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দনকাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবাল-পালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শয়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী-মুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভর্ত্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া—এই শ্মশাননিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে?

শশী—যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না—আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাপ যখন বসন্ত-রাগে এক বৃন্তে চারি দিক্ দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে, তখন তুমিই তাহাকে মালতী লতাকে চুম্বন করিতে কানে কানে পরামর্শ দেও। আবার সেই তুমিই অসদভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না; তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।

তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ; যুবক যুবতীর যামিনী-যাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপধারী; তুমি পথিকের পথ-প্রদর্শক; গৃহীর নৈশ সূর্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাঁহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের শোভা। আর এই শ্মশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল; তুমি

ভালর ভাল, মন্দের মন্দ ; রসে রস, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী : শশী, আমি তোমায় বড ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই ! আজ এখানে বাসর যাপন—সকলে একবার হরি বল ভাই !

বম্ ভোলানাথ ! চন্দ্র যে পুরুষ ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল।

চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,* ইংরাজিমতে চন্দ্র শী। এখন উপায় ? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে ?

বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারেব লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমাব এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষ্ণৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন কবিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া কবেন, গোলাপ সহিত বারি-হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী ? এবং যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া—রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালেব পর্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি ? তবে ত সাহসকে হি শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে ? যে জোয়ান ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? আর যে বেড্‌ফোর্ড্—তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব না শী বলিব ? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলীযন্, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল—কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থিব করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট কর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক এক জন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেটরা এরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব ? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্তন-গায়িকা বলিল—"সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিব ?" এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্রস্তব্ধবৎ, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোন্‌গুলি হি, আর কোন্‌গুলিই বা শী ; তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্ত্তনকারিণীই হি এবং তাঁহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকল্পে ইট হন। তাহার নিত্যবিধিও আছে। যথা—ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কর্ম্মে ইট্। তাঁহারা বক্তৃতার সময়ে হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে ইট্ যাহা হউক,

* হি শী কাহাকে বলে ? শুনিয়াছি, দুইটি ইংরাজি সর্ব্বনাম—হি পুংলিঙ্গ—শী স্ত্রীলিঙ্গ।

—শ্রীভীষ্মদেব।

হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রূপ করিয়াছিল বলিয়া, যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুগ্ধ-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী—আর আমি—নসীবাবু কি না এক দিন বলিয়াছিলেন যে—"চক্রবর্ত্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখ্‌ছি"—সেই ভয়ে আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি, কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিম্বা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী—কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশকর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইঁহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কল্কিমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হরিসংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজী মতে, শী স্থির করিয়া, খোস্ বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সরিকতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিংবা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? আর অমন মুচ্‌কে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর্ তর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে? ইতি কোর্টশিপ্ সমাপ্ত :—

এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর।
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর॥

একবার হরি বল, ভাই! হরি হরি বোল।

আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এইবার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল—পূর্ব্বে

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,

এখন

চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।

চন্দ্রেব হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,

কিন্তু

কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমাব চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না ক'নে বড়, এই দেখ, বর বড—

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়,
চক্রবর্ত্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায়।
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্ত্তমান।
কমলের বাগানের সব মর্ত্তমান॥

দেখ শশী, এখন নির্জ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসারজ্বালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিষ-ক্ষেপরূপ হইবে। বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলাকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকাকারগণের সহিত দিন-ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ একদিন রাহু তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে নব বধুকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয়। সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ।

এখন এক বার,

কমল শশীর বাসরঘরে,
ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে !

এখন শশী, একবার এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি ! এক বার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি ! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্রপথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি ! একবার নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি ! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগনগবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি ! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি ; একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।

শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে ? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না—কখন একবার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জটিলতা-জাল-চ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি Lunatic* নাম ধরিলাম। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, তুমি পাষাণী—তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ ?—তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা এক বার টানিয়া, এক বার রাই মানিনী হইয়া বসো ! আমি এক বার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।† আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক ! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।

অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্ত্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব, পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার

* চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল।

† আমি জানি, কমলাকান্ত এক দিন প্রসন্ন গোয়ালিনীর পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দুধের জন্য।
—শ্রীভীষ্মদেব।

সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণাদি মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব, কুঞ্জলতা কানে ঝুম্‌কা দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চারি দিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুম্‌কা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর—আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসী বাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়,—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসী বাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসী বাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও "অসুখ", এজন্য আসিতে পারিলেন না, কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তা ভাই, বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উ বলিয়া ডাক।

তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্নপ্রতি-পালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু"—তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, "কু—উ।" যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উ"—কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনই ডাকিযা বলিও, "কু—উঃ।" যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিযা পড়িতেছে, তখনই তোমাব সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আব গাছে ধরে না—পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিযা গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে—তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল কবিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীবা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিবে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে - স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে,—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি"—কণ্ঠভরা গুন্‌গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন, হে কালামুখ! আবার "কু—উঃ" বলিযা ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আব যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহ-পুষ্পরূপিণী কন্যাগণে সেই লতার দোলনি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপব, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা—এ "কু—উঃ!" ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু—উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়,—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না; তোমাব চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে, কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহ-পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপ-মণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে—কু—উঃ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হষ্টিংস্ পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ!" ভাল, তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই।

গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না ; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পর্দা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ মাকিন্টশ্, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির* কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন—আর মেকলে রেটরিকের † পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ-স্বর কে শুনে ? দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা-মাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে ? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কান টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং পিড়িং বলেন, কি না ?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্টি, তাহাই পঞ্চম ? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,—সুরের পঞ্চম, আর আল্‌তাপরা ছোট পায়ের গুজ্‌রী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট ; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে ? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর—বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি—ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি ? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ি দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গজ্জন শুনিয়া, মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে—তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী। তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস্—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা, আমার পুঁজিপাটা এই আফিঙ্গের ডেলা ; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস্—আমিও তাই ; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস ? আমিই বা কারে ? বল্ দেখি, পাখী, কারে ?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি ; যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা ; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও জানি না ; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন ? আয়, ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

* দর্শন। † অলঙ্কার।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া, আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখি রে?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, লতাগুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান—আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরৎ পাঠান, গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা উষার সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট-পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীর সঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধুহিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন

সরোবরে মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমানুভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী; কখন উদ্ভিদ্, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর।* উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে; যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-গ্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা চিররঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুব্‌রে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোরু একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে। হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক। তুমি বৎসর বৎসর সোনার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান, সাইবিরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

* আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর—কেন না, উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে—যথা, নখর-নিকর হিমকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে।—এটি আমার নিজের রচনা।

—শ্রীভীষ্মদেব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোকে কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও* বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ শুনিয়া, হাসিলেন ; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীর ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না ; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রী-লোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না ; কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রূধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা ; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থ যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত ; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী ; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা,; এমন কি বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহা-দিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে,

* কোপর্নিকস্ P. D.

সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলকজগন্নাথকে দোলায় ; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষিবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কাণে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না ; পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে ; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্যবিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রককলাপ দেখিয়া জলদ-মুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রককলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর"কার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল ? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে ? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে ?

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে ? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইতেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্য-মালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তেক জন্য না হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি ;—আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকুড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায় ? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর ? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া, তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত ? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে অশক্ত ? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত

ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগ-নেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোকের আদর। এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গালাদেশে উল্কি-চিত্রিত মিশি-কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানব-সমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্যদ্বারা তাঁহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে, রূপই কামিনী-কুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদমণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটী গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্যসুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানস-পটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ে কাজ কি?

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দ্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিযা বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে!" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্! গুণ্ গুণাগুণ্! মেয়ে দেখিব।"

বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, "দিদি, একবার ঘোমটা খোল—নইলে, বর আসিবে না—লক্ষ্মী

আমার, চাঁদ আমার, সোণা আমার” ইত্যাদি। কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, “ঠান্‌দিদি, তুই যা!” কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌, গুণ্‌ গুণাগুণ্‌! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?”

কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, “ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।” ভ্রমর বলিলেন, “গুণ্‌ গুণ্‌, আপনার অনেক গুণ—ঘটকালীটা?”

কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, “তাও হবে।”

ভ্রমর—“বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড গুণ—গুণ্‌ গুণ্‌ গুণ্‌।”

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, “আগে বরের কথা বল—বর কে?”

ভ্রমর—“বর অতি সুপাত্র।—তাঁর অনেক গুণ্‌-ন ন্‌।”

“কে তিনি?”

“গোলাবলাল গন্ধোপাধ্যায়। তাঁর অনেক—গুণ্‌-ন্‌—ন্‌।”

এ সকল কথোপকথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড কুলীন, কেন না, ইহারা “ফুলে” মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাক্সামালীর সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই?

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, “আজি কালি ফুটিবে।”

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল; আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্র চলিল; স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী—শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীরের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল—বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল পিপ্‌ড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের

জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায় ? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ—হুম্ করিয়া অনেক মর্দানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর বরযাত্র, সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোম্‌টা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে—রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যূই, কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুম্‌কা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ী ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন—

"কমলকাকা—ওঠ বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ওকি, ঢুলে পড়্‌বে যে ?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল;—চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল ?—মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে—এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,—সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিত-সুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল ? সেখানে সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে—ধ্বংসপুরে ! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে—কি ? ভোগ ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি ? স্মৃতি ?

কুসুম বলিল, "ওঠ না—কি কচ্চো ?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁসে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা ?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা

বড় বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর সর, দধি দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে;—জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ, এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম—দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম—তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প—আকাশকুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালিনীর কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ, ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে

দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোকে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়।—দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।—মেছনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়্‌বো—বোঝা বিক্রি হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ—যে কেনে, তার পুনর্জ্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়- কে খরিদ্দার সাহস করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাঁধ্‌লে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়!" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরম পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে—সংসারের দিন সুখে কাটবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে।" কেহ বলিতেছে, "কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকন্না। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম, দর "জীবন সর্ব্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর, "জীবন সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব?" দালাল বলিল, "দু দিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে।" তখন "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসরু

গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব ষত্ব ণত্ব—ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্ব, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতিত্ব গুণত্ব পদার্থ—বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থ-তত্ত্ব নামে ঝুনা নারিকেল—খাইতে বড় কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে, ব্রাহ্মণীই পরম পদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ*—তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই, ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাব; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য, কি অনিত্য, যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার—দেখিবে, নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,—অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মারিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগ্‌বিতণ্ডাজনিত অধরসুধা-বৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ, ভট্টাচার্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে না রকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না—আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

MESSRS BROWN JONES AND
ROBINSON
NUT SUPPLIERS
ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY.
MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON,
Offer to the Indian Public
A Large Assortment of

* নৈয়ায়িকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব আর অত্যন্তাভাব।
শ্রীকমলাকান্ত।

NUTS.

PHYSICAL, METAPHYSICAL, LOGICAL, ILLOGICAL, AND SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS AND DISLOCATE THE TEETH OF ALL INDIAN YOUTHS WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন—"আয় কালা বালক, Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১ নম্বর এক্সেপেরিমেণ্ট—ঘুসি ; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের মাথা বা নরম হাড পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিযোগ সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে বা বৈদ্যুতীয় বলে বা চৌম্বক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা অকৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায় ; যথা বায়ুতে অম্লজান ও যবক্ষারজানেব সামান্য যোগ, জলে জলযান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও, এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে, পর্কশন্ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে।

অগ্রিম মূল্য দিও ; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।"

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল ?" সাহেবেরা বলিলেন, "ইহাকে বলে, Asiatic Researches." আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন ; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নীচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ

পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ব কদলী।

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম; দেখিলাম, যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেও—যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আবদার, তোমার কানে অবিরত খোসামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না—কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।

বিক্রেয়—অনন্ত যশ।

বিক্রেতা—কাল।

মূল্য—জীবন।

জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম—দেখিলাম, সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়—ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে; ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, "এও গোরু, কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে লাগিলাম—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে—আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নসী বাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্ত্তী মশাই—রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

একাদশ সংখ্যা

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ

ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি ? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকা-রূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তান-কুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজল-মণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্গশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়-ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা

দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সংকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো—" বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র প্রণামি দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পুরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি॥
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে॥
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি॥
দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে॥
জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে।
পাপতাপভয়শোকনাশিকে॥
মৃদুল গভীর ধীর ভাষিকে।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে॥
জয় হিমালয়নগবালিকে।
অতুলিত পূর্ণচন্দ্রভালিকে॥
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে॥
জয় মা কমলাকান্তপালিকে॥
নমোঽস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে।
নমোঽস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে॥
ব্রহ্মাণীন্দ্রাণি রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহি মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি॥
নমোঽস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দিনি নমোঽস্তু তে।
প্রিয়দাস্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধরে॥

ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোঽস্তু বিমোচিতঃ ॥*

দ্বাদশ সংখ্যা

একটি গীত

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"

প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়—দুধ যোগাবার বেলা হলো।"

কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো।"

প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বধু?"

কমলাকান্ত। "বালাই! যাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে"—

এসো এসো বধু এসো আধ আঁচরে বসো—

সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের বেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

"এসো এসো বঁধু এসো, আধ আচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।

"এসো এসো বঁধু এসো"†

* আর্য্যাস্তোত্র দেখ।

† পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হইবে

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাসপ্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদযে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়কামনা। মনুষ্যহৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ—মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধূ এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য—কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জনসমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত কবিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া; হৃদয় হৃদয়ে আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব—"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্বকর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু—সকলেই এ মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি—"এসো এসো বধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

"আধ আঁচরে বসো।"

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কন্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর, কুশকন্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি—আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর—আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব—দূরে আসনগ্রহণ করিও না—এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কল্কাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ—তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক—"এসো এসো বঁধু এসো—আধ আঁচরে বসো।"

"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ—কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ—কিন্তু আত্ম-

যশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে—যেখানে ফুলটি ফুটে, ফলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ—যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্ন-পদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে, গলে, পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া—কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট—কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ—চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি-রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা—নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে! হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে।"

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখভোগ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখভোগ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না—এতদিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে পারিত না—বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তরবৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্য্য হইত—জীবনযাত্রা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস-গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস-গণনা দুঃখবিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস-গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সুখহীন, আশাহীন উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার-সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ, সংসার-বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান

ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ—সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ—আমি কেন দিবস গণিব ?

গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ শাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই ? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই ? মনুষ্যত্ব মিলিল কই ? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই ? ঐক্য কই ? বিদ্যা কই ? গৌরব কই ? শ্রীহর্ষ কই ? ভট্টনারায়ণ কই ? হলায়ুধ কই ? লক্ষ্মণসেন কই ? আর কি মিলিবে না ? হায় ! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না ?

"মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলে পরি—"

বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন ? রূপ জড়পদার্থ কেন ? সকলই অশরীরী হইল না কেন ? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত ! যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন ? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না ? আমার শরীরে এত স্থান আছে—তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না ? তোমাকে কণ্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না ? হায় ! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।

আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি !

"আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো," পরে আদর, "আধ আঁচরে বসো," পরে ভোগ, "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি—"অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

"মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি।"

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

"আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অধৈর্য্য। এ সুখ কোথায়

রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব ? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব ; এ সুখ এক স্থানে ধরে না ; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পূরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব , মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই—এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন—আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন—তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।

সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকাব নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদযবিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।—আর কাতরোক্তি, কোথায বা নাই ? নবপ্রসূত পাক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণসুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি ? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায় ? সুখও দুঃখময—

"তোমায যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।"

এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা ! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত—গিয়াছে, কিন্তু, তাহাব বৃন্দাবন আছে—মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে—সুখের নিদশন গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনিই দুঃখে দুঃখী।

আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই ? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু, নিদর্শন কই ? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে ? সে গৌড় কই ? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই ? আর্য্যের ইতিহাস কই ? জীবনচরিত কই ? কীর্ত্তি কই ? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই ? সুখ গিয়াছে—সুখ-চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে ?

চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর-তর রব করিতেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায় ? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায় ? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায় ? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে

বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শা-ফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ, সেই অন্ধকারে—আঁধার আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

ত্রয়োদশ সংখ্যা

বিড়াল

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লু'র মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি—এখন বল কি?"

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুগ্ধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে—আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে

পাইলে কে চোর হয় ? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে—চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরেব দণ্ড হয় ; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন ?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নরদামায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে ? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে ?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া, তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে ? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব ? তবে আমার বেলা লাঠি কেন ? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী ? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহমার্জ্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!—' আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না ? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই ? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন ? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয় ?

পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে—আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

চতুর্দ্দশ সংখ্যা

ঢেঁকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি পারিতাম না—নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস্‌ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্য্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই—ঢেঁকি আছে—ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকার-নিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি—আর্য্যসাহিত্য, আর্য্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না—রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্য-সভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালে? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,—কোথায় না ঢেঁকি আর্য্য-সভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,—শ্রাদ্ধাধিকারী,—নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতা মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে।

ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়—অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? নাবস্তুনা বস্তুসিদ্ধিঃ?—বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধানার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম।

দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্মুহুঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public spirit? ভাবিলাম—না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন—কিন্তু কই, তাঁহার ত কিছু মাত্র Public spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখি না। আরও—মনের কথা লুকাইলে কি হইবে? আমিও—আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং, একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকারবিশেষের সেবনে আমার সেই গর্ত্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই—কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী—গোপাঙ্গনা-কুল-কলঙ্কিনী, এক দিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল তা বলিতে

পারি না,—স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নমান! পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোধ্নী রাক্ষসী! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে—বিবরলোক প্রাপ্তি! "আলু থালু কেশপাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"—হায়! তখন কি আমার হৃদয়-আকাশ মধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্যা হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি দধিদুগ্ধক্ষীরনবনীত-পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোধ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,—কাহাকেও গুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য "সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?"

চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল।

আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল—কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল!—ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ! —ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া—ঢক ঢক কচ্ কচ্! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ—তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ! এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়—হায়! কি করিব?—কাঁসার মল পরাই!

আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান,—নহিলে কেবল কাঠ—দারুময়—গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক।

বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে "ধান্য" ; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি ?—ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও ? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয় ? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে—তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান ? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার !

ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম—একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি ? ৺ননী বাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে—ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি—কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে—সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা—তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোথাও জমিদার রূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন ; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত—ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন—পিলে যকৃৎ ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন—অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি—সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—স্কুলবুক !

দেখিতে দেখিতে দেখিলাম—আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি—কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি ; নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল—এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল—এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম—"অশ্বমনোরথে।" স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র ! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি—পুরস্কার চাই কি ?"

আমি। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা।

দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না—আর যাহা চাহিলে, তাহা ত মর্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,—আটটার হিসাবে।

আমি দুর্ম্মুখ—বলিলাম, "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা ! সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে ? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।'

সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বক্‌শিশ হুকুম করিলেন,—এক সের অমৃত, আর এক ঘণ্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ,—আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে—"নেশাখোর!" "বিট্‌লে!" "পেটার্থী!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি। এক ঘণ্টা হইয়াছে—এখন বন্ধ কর।"

কমলাকান্তের পত্র

প্রথম সংখ্যা

কি লিখিব?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন* সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺ নসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীস, জুয়াচোর লোক আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনী-ধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপবে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন।" ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। এক জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম,

* "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন সঞ্জীববাবু পত্রিকার সম্পাদক।

কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম ; শব্দটি "বঙ্গদশন", অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ পূর্ব্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি" ; অর্থাৎ "A Guide to Eastern Bengal." এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে !

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয় ! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব, এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীশ্রী৺ নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসিবাবু শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন ! ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই। অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন ? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি ? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার ? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব ? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক ? স্থুল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব ? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন ? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ ? যদি কোটেশ্যন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতে আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যন, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।

যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় হায় জুসটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পুত্র

যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,* তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিজ্ঞ হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্ হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনি-মেগেজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড্ নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণ-মিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন-চরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য-সমালোচন-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোশনবীসপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোঽস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন; এবং আমি শপথ পূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা, সখি!" এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি

* ইউ—টিল—ইট—আই।

মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোশনবিসী রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্তি ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব! ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—এক তিল ছাড়িব না!

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিক্স্

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছ আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্স্ কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্স্ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্স্ সব্‌জেক্টরূপী আমা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোসামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোশামদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স্ লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যন নহে।

আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরিটাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী—বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কলু-পত্নীর হস্তমিশ্রিত খলি-মিশান জলিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতক্ষটা স্থিরচিত্ত

হইলাম—এখানে ত পলিটিক্‌স্ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্‌স্-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পলিটিক্‌স্‌প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স্—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্‌স্; কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত, হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্‌স্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুকুরের পেটটা দেখিলাম, নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, এক বার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।

তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্‌স্,—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যন! তখন মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক—কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল্ এজিটেশান সফল হইল;—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক

আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল—জাত পলিটিশ্যন, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্‌ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর একবার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন, হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই—এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্‌সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্‌ ম্যাক্‌ করিয়া ভাত খাইতেছে—দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যত ক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, তত ক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাব্‌না খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থুলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুকুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না—এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্‌স্‌। দুই রকমের পলিটিক্‌স্‌ দেখিলাম—এক কুক্কুরজাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন।

তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি—লিখিবার অনেক অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই—এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোসামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না—টাকা ছড়াইতে

হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মন-যোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে—কান্না নাই; আমোদ আছে—রাগ নাই। মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল—তারা হাসিল। মনে করিলাম—মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,—লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা মৌমাছি—বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন. লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন্‌গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে—বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম—(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)—এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন—লিখিব কি, মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক—বড় সদ্বক্তা—তাঁহার ঘ্যানঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কানের কাছে ঘ্যান্‌ঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—দপ্তর-মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষে আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর। তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে। আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ু সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া ভোঁ ভোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া, আমার শরন্নীরদ-নিন্দিত কুঞ্চিত শ্বেতকৃষ্ণ কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম! ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত—"পপাত ধরণীতলে!!!" এই সংসারসমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী—যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেন প্রভৃতির দ্বারাও কখন পরাজিত হয়েন নাই—হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।

তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে দ্বিরেফসত্তম ! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি—পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে—তুমি কেন ঘ্যান্ঘ্যান্ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর ?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম—"হে ভৃঙ্গ ! অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গবিক্ষেপকারিন্ ! হে দুর্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ডকারিন্ ! হে উদ্যানবিহারিন্—কেন তুমি ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতেছ ? হে ভৃঙ্গ ! হে দ্বিরেফ ! হে ষট্‌পদ ! হে অলে ! হে ভ্রমর ! হে ভোমরা ! হে ভোঁ ভোঁ—"

ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সাম্নে বসিল। তখন গুন্ গুন্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল—আমি অহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি—আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।

ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র ! আমার উপর এত চোট কেন ? আমি কি একাই ঘ্যান্ঘেনে ! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিব না ত কি করিব ? বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া ? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়রে ঘ্যান্ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার—তাঁর ঘ্যান্ঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ঘ্যান্—ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বস্‌বার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ ! যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ঘেনে। সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে—বড় জজ, ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি, মুন্সেফ—সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যান্ঘেনে, ঘ্যান্ঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন - সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন্ দেশে বৃষ্টি হয় নাই—এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি ; বড় চাকরি পাই না—এসো বাপু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি—রামকান্তের মা মরিয়াছে—এসো বাপু স্মরণার্থ ঘ্যান্ঘ্যান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না—তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যান্ঘ্যান্ করেন ; আর তুমি যে বাপু আমার ঘ্যান্ঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমিও কি করিতে বসিয়াছ ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যান্ঘ্যান্ করিতে বসিয়াছ। আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু ?

"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত ! তোমাদের জাতির ঘ্যান্ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে—

কেবল ঘ্যান্‌ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই—কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যান্‌ঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মানুষ মরে না, আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্ত্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল। সে যাক, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডূয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না—জিবে কাষ্টকি দিয়া ঘা কর—অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যান্‌ঘ্যান্ ভাল লাগে না।"

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে, মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু—পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে—তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্‌পদের—একখানি না, দুখানি না—ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে—ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যান্‌ঘ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে—

আপনার আজ্ঞাবহ
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চতুর্থ সংখ্যা

বুড়া বয়সের কথা

সম্পাদক মহাশয়। আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ফারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেনপ্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।

বুড়া বয়সের কথা লিখিব! লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়—আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি

করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি ; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি, এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি এক বার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁরই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয়ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দন্তসকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয়ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না ;—তথাপি, হয়ত আপনি প্রাচীন। নয়ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশনমুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে —আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে ; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চসমাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে, আমি বুড়া হইয়াছি কি না! বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন ; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই ; আমার সৌন্দর্য্য-মাখা, হীরা-বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই, প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুরে প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহা-দিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—

ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হউক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসা-পরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুর দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখশোধ। পৃথিবি! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃন্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরব-পীড়িত বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্তকাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণীসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক। তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্‌কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে যে, "বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু, সম্পদ্‌কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ-আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশকান্তি, হয়ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয়ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ শিখাইয়াছিলে, সে হয়ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয়ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া,

তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয়ত সেই তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তাঁর অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেবিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ,—হারাধন পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া ইহ-জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয়ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টকসকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীব মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দাসু মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ককণ্ঠ, পলিতকেশ, দন্তহীন, লে'লচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাসু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যেব বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান-বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্ম, পলিতকেশ, শুষ্কবাহু, কর্কশ-কণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যেব বাকি কি?

তবে স্থির, বনে যাওয়া হইবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসও সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিন্ত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি। প্রথম অজবিলাপে,

"ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনম্॥"*

---

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জন-রহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

এটি যৌবনের কান্না।

তার পর রতিবিলাপে,

"গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥"*

এটি বুড়া বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখন বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোল্‌ট্‌কে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন—টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিশ্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিয়ামেণ্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ্ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অস্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ

* তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে —আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয় যে, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের জন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোম্‌ত, স্পেন্সর, ফ্‌য়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

পঞ্চম সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে! বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস—না আমি সেই আমি আছি। তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা কি কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে—বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই—আর বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না—কাঁদিলে

বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে—লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে ;—এখন হাসিকান্না। ছি!—কেবল লোক হাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না—তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা—এখনও একা—কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম—করে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুব শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইযাছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে—পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে—যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবাব তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে—আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

খোসনবীস জুনিয়র প্রণীত

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে এক জন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছু কাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন এক জন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে, আমাকে এব ভিতর পূরিলে?"

চাপবাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয় হলফ পড।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্ববকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ··"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুবি। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পবমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পবমেশ্ববকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুব সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতাব, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্ববকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোযাক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness

কোর্ট বলিলেন, "O Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছ, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড সেবকশ্।"

উকীল বাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive."

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদমায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিল, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়!

পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল ; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব ; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি ?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি ?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এ সব Contempt of Court." হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি ?"

কমলা। আমি কি একটা জাতি ?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয় ?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে ?

কমলা। মারে কে ?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর ?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব ?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত ?"

এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায় ?

কমলা। কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা ?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা ?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা ?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে ?

কমলা। ছিল, যখন নসী বাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা ?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা ?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবা নাই। তারপর ?"

উকীল। তোমার পেশা কি ?

কমলা। আমার আবার পেশা কি ? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমা পেশা আছে ?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া ?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয় গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে ?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর ?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর ?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল ; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি ? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর ! ও কি বল্‌বে ?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন, পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি ? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী ? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর ! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই ?"

কমলা। দূর মাগি ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব, কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নবম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি, ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বলিতেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয় জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ; যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। দুধ দই চিনি নে?"

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের বেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল, তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপদাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন?—আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। এক দিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বকনা—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামুন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা, চিনি বই কি—নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সাম্‌নে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছ', তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?"

হাকিম তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। সিংওয়ালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ও সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার!

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্‌লে! গোরু তোমার!"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হলো!"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, witness hostile! permission দিন, আমি ওকে cross করি!"

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনূমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পূরিল। তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্র পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!'—উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জল্‌দি জল্‌দি বল—জল্‌দি জল্‌দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিন জনের, গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সে স্ত্রী-জাতির, শেষবয়সে উত্তরাধিকারীর, দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা-গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মলি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞ, হাঁ।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্ করিব।"

কমলা। একজন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস্ করিলেন, পবনাত্মজ মহাশয়। তার পর ক্রস্ করিলেন, কুমার বাহাদুর।*

---

* অঙ্গদ।

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন ?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায় !

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে ?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless !" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন, বাব ?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত বেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারিদিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার খাটের দিব্য, তোর দুধের বেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্ !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয় ! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন ?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিডম্বনা মাত্র।'* এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয় ? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে ! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোশনবীস জুনিয়র।

* শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত

মাস পাঁচ ছয় হইল, একদিন প্রাতে স্নানাদিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ গুড় ছোলা খাইয়া বসিয়া তামাকু টানিতেছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী আসিয়া উপস্থিত। সু বামহস্ত কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া রহিয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখীর খাঁচা। খাঁচাটা অতি সাবধানে মাটীতে রাখিয়া প্রসন্ন বসিল। রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত রঙ্গই জান ?

প্রসন্ন উত্তর করিল—কেন, রঙ্গ আবার কি দেখিলে ?

আমি। তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়া পাঁচজনকে বেচিয়া বেড়াও, এই ত এক রঙ্গ। আবার এতদিনের পর নূতন পাখী কেন ?

প্র। নূতন পুরাতন আবার কি ? আমি ত আর কখন পাখী পুষি নাই।

আ। সে কি প্রসন্ন ? আর কখন পাখী পোষ নাই কি ? আমিই যে তোমার খাঁচার পাখী—তোমার ঐ পরম ভাণ্ডের মধ্যে আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ক্ষীরোদ-শয্যাশায়ী অনন্ত পুরুষের ন্যায় সদাই যোগমুগ্ধ। ঐ ক্ষীরাধার ভাণ্ড আমার অনন্ত-শয্যারূপী খাঁচা। আমি ঐ খাঁচার ক্ষীরপায়ী পক্ষী। তাই বলি, আবার একটা পাখী কেন ?

প্র। দেখিলাম পাখীটা আর একটা পাখীর বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর খাইয়া মাটিতে পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল ; তাই পাখীটাকে খাঁচায় পুরিয়া আনিলাম।

আ। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করে, তাহার জন্য আবার দুঃখ কি ? সে ত ঘোর অত্যাচারী ? পিনালকোডের ৫১১ ধারানুসারে সে ষোল আনা চুরি এবং অনধিকার-প্রবেশের দায়ে দায়ী, তা জানিস্ ?

প্র। অমন কথা বল না ! ওর কিছু নাই বলিয়াই অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল। আহা ! যার নাই, তাকে যদি লোকে না দেবে ত সে কোথায় যাবে—আমরা মেয়েমানুষ এই ত বুঝি।

প্রসন্নের মুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়াবহ। আমার এককালে ভয় এবং রাগের সঞ্চার হইল। গরম হইয়া বলিলাম—

তবে বুঝি ওই পাখীটাকে তোর যথাসর্ব্বস্ব দিবি ? আমি বুঝি আমার এই দুগ্ধপুষ্ট তনুখানি গঙ্গ জলে ভাসাইয়া দিব ?

প্র। ও কি রকম কথা ? আমি কি তোমাকে তাই করতে বল্‌ছি ?

আ। নয়ই বা কেন ? ঐ পাখীটাই যদি তোর সব দুধ দই খেলে, তবে আমি বাতাস খেয়ে থাক্‌ব না Huxley সাহেবের protoplasm খেয়ে থাক্‌ব ?

প্র। কেন, তুমিও খাবে, ও-ও খাবে।

আ। না, প্রসন্ন, কমলাকান্ত সরিকিতে নাই।

প্র। সে আবার কি ?

আ। ভাগাভাগিতে আমি নাই। দায়ভাগের ভাগাভাগির ভয়ে আমি সংসারধর্ম্মই করিলাম না। আবার তোর ভাঁড়েও ভাগাভাগি ?

প্র। কেন, তুমিই ত সে দিন কত দান ধর্ম্মের কথা, কত হোমানুটি মটরসুঁটির কথা বলছিলে ?

আ। সে পরকে শেখাবার জন্য।

প্র। ও মা সে কি গো। আপনার বেলা লীলাখেলা পাপ পুণ্য পরের বেলা।

আ। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনও চিনিস্ নাই। তা সে সব কথা যাক্। পাখীটাকে ছেড়ে দে।

প্র। তা হবে না। যাকে একবার ঠাঁই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পারব না।

আ। সেটা ত তোদের জাতিরই ধর্ম্ম নয় ?

এবার প্রসন্ন রাগিল। বলিল—

কি, বামণ, তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর ? তোমার মতন দুর্ম্মুখ ত ভূ-ভারতে নাই ? তোমার কাছে আবার মানুষ আসে ?

এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যহ প্রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয় তাহা না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম—আচ্ছা, আমিও একটা পাখী পুষিব, আমার যা কিছু আছে সব তাকে দিব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল—আচ্ছা, আমিও এই বলে যাচ্চি, যে দিন তুমি পাখীকে পোষমানাতে পারবে, সেই দিন আমি আমার এই দুধের বেঁড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌ব।

এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বেরিয়ে গেল। কেঁড়ের দুধ চল্‌কে কাপড় বাহিয়া পড়িতে লাগিল। O what a fall was there !

আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখীর সন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিলাম, অনেক পাখীর দোকানে গেলাম। কোথাও মনের মতন পাখী পাইলাম না। শেষে এক দোকানে একটি পাখী মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পড়িল। আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, আমার ত একটি পয়সাও নাই; তবে কি বলিয়া পাখী কিনিতে আসিলাম ? কিছু অবসন্ন হইলাম, কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের দেশে কয়জন সম্বলবিশিষ্ট লোক আছে ? আর সম্বলহীন হইয়াও কে না বড় বড় সওদার চেষ্টায় ফিরিতেছে ? কে না বড় বড় পদ, লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ? কিন্তু তাহারা কেহই ত লজ্জা, অপমান, ঘৃণা, কিছুই অনুভব করে না ? তবে আমিই কেন লজ্জিত হই ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি এমন সময় একটা কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটা এইরূপ—Plateetud, Plateetud, Plateetud, বারম্বার এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া শব্দের কারণ জানিবার ইচ্ছা হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়ীতে আসিলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম উঠানে এক বচ্ছহীন বীরপুরুষ কতকগুলা মুর্গী জবাই করিতেছে—রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। একখানা ঘরের দাবায় একটা স্ত্রীলোক পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, এবং বিষম যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিতেছে। ঘরের চালে ডাঁড়ে বসিয়া একটা পাখী একবার

সেই রক্তের স্রোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। এক একবার স্ত্রীলোকটাকে ঠোকরাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া Plateetud, Plateetud করিতেছে। আমি গৃহস্বামীকে ডাকিলাম। গৃহস্বামী বাহিরে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাড়ীতে কাহার কোন পীড়া হইয়াছে?

গৃ-স্বা। হাঁ, আমার স্ত্রীর হাঁটুতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে। আমি সেইজন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়ীতে আজ দশজন লোক খাবে, আর এই বিপদ?

আ। আমি একটা ঔষধ দিতেছি; জলে গুলিয়া হাঁটুতে মালিশ করিয়া দেও, শীঘ্র আরাম হইবে। কিন্তু আমাকে কি দিবে?

গৃ-স্বা। আপনি কি চান?

আ। ঐ পাখীটা।

গৃ-স্বা। এখনি লইয়া যান। ওটাকে আমি খুব যত্ন করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু মহাশয়, এখন ওটা আমার ছেলেপিলেকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মারিয়া ফেলিতেছে। আপনি এখনই লইয়া যান।

তখন আমি বিষম গোলে পড়িলাম। আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? যে আফিঙ্গ দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া, সৃষ্টির সারভূত পদার্থস্বরূপ লাভ করিয়া আমি লোভ-পরিশূন্য সংসারবিরাগী বলিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন, সে আফিঙ্গ দিই কেমন করিয়া? কিন্তু না দিলেও নয়। প্রসন্নের কাছে আগে মুখ রাখা চাই, সে দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে এক ছিলিম তামাকুও দেয় না। সুতরাং ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে চক্ষু বুজিয়া ছোট্ট একটি গুলি গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখীটি লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা মন্দ করিলাম কি? উপকার করিয়া তাহার মূল্যস্বরূপ পাখীটা লইলাম? কে না লয়? ডাক্তার মহাশয়েরা দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে fee লয়েন না? উকীল মহাশয়েরা নিঃস্ব মোয়াক্কেলের নিকট হইতে fee লয়েন না? রাজ-পুরুষেরা দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে টেক্স লয়েন না? কুলকামিনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ লয়েন না? তবে আমিই কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম?

সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিঙ্গ খাইয়া পাখীর ডাঁড়টা সামনে ঝুলাইয়া তামুক খাইতে বসিলাম। ক্রমে আফিঙ্গ চড়িয়া উঠিল। তখন শুনিলাম পাখীটা বলিতেছে—আমাকে কেন তেমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে? Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি এই যে বেশ কথা কহিতে পার। তোমার নাম কি, বাড়ী কোথা?

পা। আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ, তুয়া কাকা। তোমাদিগকে uncleship শিখাইবার নিমিত্ত আমার এ প্রদেশে আগমন। Plateetud, Plateetud।

আ। তুমি তবে এ দেশীয় নও? তোমার বাড়ী কোথা?

পা। আপাততঃ এখান হইতে অনেক পশ্চিমে।

আ। আগে কোথায় থাকৃতে?

পা সে অনেক কথা। শুনিবে কি?

আ। শুনিব। আজ কাল অনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চ্চা করিয়া খুব সস্তাদরে নাম কিনচে, দেখি যদি আমিও কিছু করিতে পারি।

পা। শুনিয়' আমাকে ছাড়িয়া দিবে বল ?

আ। সে পরের কথা। আগে শুনি।

পা। আমি পাখী নই। আমি পশু। বহুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমাব বাস ছিল। তখন আমি শূকর ছিলাম। পাঁক ঘাঁটিতাম, পাঁক মাখিতাম, পাঁক খাইতাম। ক্রমে সেখানে মনুষ্যনামা এক প্রকার দ্বিপদবিশিষ্ট হিংস্রক জন্তু দেখা দিল। এবং পাঁকাল মাছ মনে কবিয় আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল।

আ। শূকরকে পাঁকাল মাছ মনে কবিল কেমন কবে ?

পা। শূকরও পাঁক ঘাঁটে, পাঁকাল মাছও পাঁক ঘাঁটে। অতএব শূকর এবং পাঁকাল মাছ এক।

আমার Whately's Logic জানা ছিল, ফস্ করে বলিলাম—ওটা যে fallacy of undistributed middle হল।

পা। Tut, fal-la-cy of un-dis-tri-bu-ted mid-dle ! ও ত logic-এর কথা ? Antiquities-এব সহিত logic-এর সম্পর্ক কি ? দিন কতক Antiquities চর্চ্চা কর, Weber সাহেবের গ্রন্থ পড়, তাহা হইলে আর কিছু আট্‌কাবে না, ও রকম খট্‌কা হবে না। দ্বিপদগণের তাড়নায় আমরা পলাইতে লাগিলাম। যত পলাই ততই শীত, আর ততই আমাদের গায়ে বড় বড় লোম দেখা দিতে লাগিল। Plateetud ; Plateetud.

আ। সেটা কি রকম করিয়া হইল ?

পা। দেখ, কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরাতত্ত্ব শেখা যায় না। শিবের কপালে চোক হইল কেমন করিয়া ? গণেশের ঘাড়ে হাতির মুণ্ড হইল কেমন করিয়া ? হিমালয় পর্ব্বতটা দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া ? কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইল কেমন করিয়া ? এ সব পুরাণের কথা, কে না বিশ্বাস করে ? তবে পুরাতত্ত্বের বেলা এত খট্‌কা কেন ? দেখ পুরাণ আর পুরাতত্ত্ব একই জিনিস। উভয়েই পুরা কাবত্বময়। একত্বেব কি চমৎকার প্রমাণ দেখ দেখি ! তবে দুইটি শব্দের শেষভাগে যে একটা প্রভেদ দেখিতে পাও, সে কেবল প্রত্যয়ভেদে ঘটিয়াছে।

আ। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণও জান দেখিতেছি।

পা। আমি জানিব না ত কি তুমি জানিবে ? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে তা জান ? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বই কাছে নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় Weber সাহেবের গ্রন্থে একথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

আ। কোবিদ্‌বর ! বলিয়া যান্ !

পা। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্রমধ্যস্থিত একটা গিরিগুহায় ঢুকিয়া রক্ষা পাইলাম। সেখানে খুব শীত। সেই শীতে আমাদের ভুঁড়ো পেট কুঁকড়ে গেল —আমরা সিংহ হইয়া গেলাম। এই দেখ সেই সিংহের কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝোটন আকারে বিরাজমান।

আ। আবার সেই রকম fallacy হল না ?

পা। দেখ, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এ সকল পুরাতত্ত্ব, ইহাতে fallacy

কোন ক্রমেই হইতে পারে না, তুমি সে সব কথা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ? তোমাকে আর শুনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম।

আ। দেখ, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু একটু আফিঙ্গ খাই বলিয়া সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে না।

পা। ওঃ! তুমি আফিঙ্গ খাও। তবে ত আমি তোমার একজন পরম সুহৃৎ, প্রধান শুভানুধ্যায়ী। আমি নিজে আফিঙ্গ খাই না বটে, আফিঙ্গ খেলে আমার পেট ফাঁপে, কিন্তু আফিঙ্গখোর মাত্রই আমার স্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপুত্র বলিলেই হয়। তবে শুন।

যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয় নিকটস্থ একটা দেশে আহার সংগ্রহ করিতে যাইতাম। কিন্তু শীঘ্রই সে দিকে কাঁটা পড়িল। একটা ভূতের মেয়ে এক দিন এমনি আমাদেব লেজ মুচড়াইয়া দিয়াছিল যে, লেজগুলা একেবারে চেপ্টা হইয়া গেল, আর সে দিকে যাইতে সাহস হইল না। কাজেই পেটের জ্বালায় আপনাপনি খাইতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হয় এই বকম কবিযা সমস্ত সিংহকুল নিঃশেষিত হইয়া যাইত। কিন্তু "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়"; ভাগ্যবলে আমাদের গায় পালক দেখা দিল। আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এদেশে ওদেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখিলাম, সেইখানে বাসা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম, অথবা তাড়াইয়া দিলাম। Plateetud, Plateetud.

আ। এদেশেও কি বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছ?

পা। করিয়াছি, কিন্তু পাকা পোক্ত রকম নয়।

আ। নয় কেন?

পা। এখানে এত বেশী খাই যে শীঘ্র উদরাময় জন্মিয়া যায়, বাড়ীতে না গেলে সারে না। আর গুহার ভিতর সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধাও খুব।

আ। আচ্ছা, তোমার দুইটি বই পা দেখিতেছি না। আর দুইটি পা কি হইল?

পা। সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বলিও না। সংক্ষেপে বলি—ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল। এবং মহানন্দপুর নামক আর এক স্থানে ঐরূপ কারণে আর একটা পা কাটা গিয়াছে! অতএব আমি পক্ষিরূপে একটি পশু। Plateetud, Plateetud।

এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আপ্‌শস্‌ হইল। থাকিলে শুনাইয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কি রকম লাভের কাজ। পরে পাখীটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কি ও Plateetud, Plateetud কর?

পা। এদেশে আসা অবধি আমি Plateetud বলিতে বড় ভালবাসি।

আ। কথাটার কোন অর্থ আছে কি?

পা। আছে বৈ কি। কথাটা plantain শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আ। বুঝিয়াছি, তুমি plantain খাইতে ভালবাস বলিয়া সর্ব্বদা Plateetud, Plateetud কর।

পা। তা নয়। আমি এদেশের যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই দেশের দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুগুলার ভাগ্যে Plantain বই আর কিছুই থাকে না। তাই তাহাদিগের edification-এর জন্য Plateetud বলি। বুঝলে ?

আ। আহা তুমি কি পরোপকারী।

পা। তার প্রমাণ ঐ নীচে দেখ।

দেখিলাম ডাঁড়ের নীচে, মেজের উপর পিপীলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কিল্ কিল্ করিয়া বেড়াইতেছে। পাখীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ও সব ত পিপীলিকা দেখিতেছি। ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই ?

পা। উহারা পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিতেও প্রায় পিপীলিকা, কিন্তু উহারা পিপীলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে। ঐ দেখ আমার ডাঁড় থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়িল আর বঙ্গজগুলা কিল্ কিল্ করিয়া মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া ঐ দুধটুকু খাইতে আসিল। আমার ডাঁড় হইতে যে দুই এক ফোঁটা দুধ পড়ে তাই খাইয়া উহারা জীবনধারণ করে। আমি উহাদের উপকারক নই ?

আ। শুধু উপকারক ? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেছ, তখন তুমি উহাদের প্রাণপুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা, সবই, কেন না উহারা উদরময় উদরসর্ব্বস্ব। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে ঐ যে কতকগুলার বড় বড় মাথা দেখিতেছি উহারা কে ? উহাদের মাথা অত বড় কেন ?

পা। মাথা বড় নয়। আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহারা মাথা ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। দেখিতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিষ্ট স্বজাতীয়দিগকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাঁড়ের নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বঙ্গজের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে ?

আ। এ তোমার বড় অন্যায়। তুমি ছোট ছোট কৃশাঙ্গগুলিকে যত্ন না করিয়া মোটা মোটাগুলাকে অনুগ্রহ কর ?

পা। দেখ, আমি প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও যত্ন কি অনুগ্রহ করি না। আমার সমস্ত যত্ন এবং অনুগ্রহ আমাতেই অর্পিত। তবে, মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভীষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া দেয়, তাই উহাদিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি। Plateetud।

আ। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভাল বাসে ?

পা। দানা নয়, খোসা, খোসা, খোসা, তার বেশী হজম করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমার ইতিহাস শুনিলে ত ?

আ। কেন, তুমি কোথায় যাবে ?

পা। আমি সেই মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া থাকিব।

আ। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট ?

পা। এখানে ত মুর্গী জবাই দেখিতে পাইব না, ছোট ছেলের নেড়া মাথা ঠোকরাইতে পাইব না। এখানে কি সুখে থাকিব ? আমাকে ছাড়িয়া দেও—আমি তোমাকে সর্ব্বদা আফিঙ্গ সরবরাহ করিব—Plateetud।

আ। সে ভাল কথা, কিন্তু দুই চারি দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না—আমার একটু জিদ্ আছে।

প্রসন্ন বলিয়া উঠিল—কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? ঐ দেখ তোমার পাখী কট্ করে শিকলি কেটে উড়ে গেল।

আমি চমকিয়া উঠিলাম। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—কে ও, প্রসন্নময়ি, কি মনে করে?

প্র। আর আদরে কাজ নাই। চল দুধ নেবে চল।

আ। এস। কিন্তু আগে একটা কাজ কর ত। ঐ ঝাঁটা গাছটা দিয়া ঐ বঙ্গজগুলাকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেও ত।

গোয়ালিনী মাগী তাহাই করিল।

সম্পাদকের নিবেদন

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রণীত ''চন্দ্রালোকে'' আর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত ''স্ত্রীলোকের রূপ'' ভিন্ন লেখকের রচনা বলে এই সংস্করণের অন্তর্ভূ'ত হয় নি। ''ঢেঁকি'' তখনও রচিতই হয় নি।

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫?)। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ছাড়া 'কমলাকান্তের পত্র' এবং 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' নামে দুটি নতুন অংশ এতে সংযোজিত হয়, আর প্রথম সংস্করণে পরিত্যক্ত রচনা দুটিও এই সংস্করণের অন্তর্ভূক্ত হয়।

'কমলাকান্ত'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯১ (?) খ্রীষ্টাব্দে। ''ঢেঁকি'' এই সংস্করণে যুক্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে 'কমলাকান্তে'র আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি।—সম্পাদক, ব. র. স.।

বিবিধ প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড

উত্তরচরিত

উত্তরচরিতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্ত্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও তৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্ম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতল-প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তর-চরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না, যাহা একবার বাল্মীকি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ কবি তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকের উপাখ্যানভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ব্বকবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন—কোন্ মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্ব্বগামী নক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই পূর্ব্বলেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য যে, কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যানভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ত্রৈলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়ন-কালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্ব্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বনপূর্ব্বক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবিগুরু বাল্মীকির সহিত কদাচ তিনি তুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম* করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ† বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবীপ্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই।

---

* ইদং গুরুভ্যঃ [কবিভ্যঃ] পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।—প্রস্তাবনা।

† দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥—সাহিত্যদর্পণে।

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠকসমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; কেন না, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া, স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিসুলভকৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে, কবি সংক্ষেপে পূর্ব্বঘটনার সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রীবিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারসৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ,—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নী বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,—জানে না যে,

————"সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিষর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো,
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"*

যাহার পক্ষে—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি,
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তে সুবচনানি সরোরুহাক্ষি,
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥†

* "এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি; কিম্বা কোন বিষপ্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার এরূপ অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে, অথবা মদ (মাদক দ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" নৃসিংহবাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

এই প্রবন্ধ নৃসিংহবাবুর অনুবাদের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। অতএব সে অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ না হইলেও তাহাই উদ্ধৃত হইবে।

† "কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পণস্বরূপ, কর্ণের অমৃতস্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধস্বরূপ।" ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,—

"আবিবাহসময়াদ্‌গৃহে বনে,
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতুরনুপাশ্রিতোঽন্যায়া,
রামবাহুরুপধানমেষ তে॥"*

যার পত্নী—

——"গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ।"+

তাহার কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ, কি জীবনসর্ব্বস্বধ্বংসাধিক যন্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্বপ্রফুল্লকর মধ্যাহ্নসূর্য্য—সেই বিরহযন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদম্বিনী,—যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ যদি সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল,—প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জ্বল, ফলপুষ্পপরিশোভিত বৃক্ষবাটিকাপরিমণ্ডিত এই সর্ব্বসুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা গর্ভিনী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই "চিত্রদর্শন" কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায় কথায় এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথার প্রসঙ্গমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন—তখন সীতার কেবল "হোদু অজ্জউত্ত হোদু—এহি পেক্‌খম্হ দাব দে চরিদং"—এই কথাতেই কত প্রেম! যখন মিথিলাবৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল! সীতা দেখিলেন,

"অম্মহে দলন্নবণীলুপ্‌পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেন দেহসোহগ্‌গেণ বিম্হঅথিমিদতাদদীসমাণসোম্মসন্দরসিরী অনাদরখুংডিদসঙ্করসরাসণো সিহণ্ডমুদ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জউত্তো আলিহিদো।"‡

* "রামবাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে, সর্ব্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে।" ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

+ "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃতশলাকাস্বরূপ, ইঁহারই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইঁহারই এই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহারস্বরূপ।" ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

‡ আহা! আর্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লপ্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌন্দর্য্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু

যখন রাম, সীতার বধূবেশ মনে করিয়া বলিলেন,

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-
র্দশনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ ॥—*

যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন,

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ ॥+

যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া কহিলেন,

অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতখেদা-
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি,
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা ॥‡

যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন,—

ভোদু, কুবিস্সং, জই তং পেক্খমাণা অত্তণো পহবিস্সং।§

তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় চিত্র-দর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে। লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা?" —মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের

ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত। পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন। আহা কি সুন্দর!

* "মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কি সুখীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও অনতি-নিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তলমনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রকিরণ-সদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিমবিলাস-রহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি অঙ্গদ্বারা তাঁহাদের আনন্দের একশেষ করিয়াছিলেন।" নৃসিংহবাবুর অনুবাদ। এই কবিতাটি বালিকা বধূর বর্ণনার চূড়ান্ত।

\+ "একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং উভয়ে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করিতাম।"

‡ "যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্, তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনকালে অত্যন্ত মর্দ্দনদায়ক, আর দলিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও দুর্ব্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।" নৃসিংহবাবুর অনুবাদ।

§ হৌক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাস।

স্মরণ—"স্মরামি ! হন্ত স্মরামি !" মন্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিতকরণ ইত্যাদি। সূর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে,—

সীতা। হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং।

রামঃ। অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে ! চিত্রমেতৎ।

সীতা। যধাতধা হোদু দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই।*

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনাশক্তিও উত্তম। কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রীগুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল সূচিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলি সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্যপরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতকগুলিন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যা রূপ। ভবভূতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ পরিচয়—দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী এবং ষষ্ঠাঙ্কে কুমারদিগের যুদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা আর একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি।

"বচ্ছ, এসো কুসুমিদকঅম্বতরুতণ্ডবিদবরহিণো কিন্নামহেও গিরি, জত্থ অনুভাবসোহগ্গমেত্তপরিসেসধূসরসিরী মুহুত্তং মুচ্ছন্তো তুএ পরুদিএণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আলিহিদো।"†

দুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন ! কি করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র সৃজিত করিলেন !

চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্ম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

* সীতা। হা আর্য্যপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা।

রাম। বিরহের এত ভয়—এ যে চিত্র।

সীতা। যাহাই হউক না—দুর্জ্জন হলেই মন্দ ঘটায়।

† বৎস, এই যে পর্ব্বত, যদুপরে কুসুমিত কদম্বে ময়ূরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে—উহার নাম কি ? দেখিতেছি, তরুতলে আর্য্যপুত্র লিখিত—তাঁহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের পরিশেষমাত্র ধূসর শ্রীতে তাঁহাকে চেনা যাইতেছে। তিনি মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন—কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ।

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বগুণবিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ, কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমাত্র। এই জন্য তাঁহার দোষগুলিনও মনোহর। কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহন্তা, তাহা বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃ-কথায় অতিবিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্নীত্ব দোষ নয়?

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম কবিয়াছেন।—যথা বালিবধ। কিন্তু তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসর্জ্জনাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীবামেব চবিত্র কোন্ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিযাছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহদ্ধর্ম্ম। গ্রীক ও বোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন, সে রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি গুণ। ব্রুটস কৃত আত্মপুত্রের বধদণ্ডাজ্ঞা এই গুণের উদাহরণ। যে রাজা প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত, সেই রাজার প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়ন-দিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবস্পীর ও দাতোকৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহরণ।

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জ্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজারঞ্জক ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়াই, এবং ইক্ষাকুবংশীয়দিগের কুলধর্ম্ম বলিয়াই তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ঢ্য। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন,

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥*

এবং দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন,

সত্যং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনম্ ব্রতং।
যৎ পূজিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা ॥†

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ,

---

* "প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বিসর্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না।" নৃসিংহবাবুর অনুবাদ।

† "লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাঁহাদের পক্ষে মহৎব্রতস্বরূপ। কারণ, পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"—ঐ

ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে, সীতা পবিত্রা,—

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্ ।

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কাবশতঃ পবিত্রা পতিমাত্রজীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না—যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।" এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমল-প্রকৃতি! ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন যে, উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমল-প্রকৃতি হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্ম্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। উদাহরণ ;—

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমিজনক-বংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতীপ্রশস্তশীলশালিনী! হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেবংবিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ!"*

এইরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না। মহাবীরপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সকলে কি এইরূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্চ্ছাও গেলেন না,—মাতাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশূন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পর্ব্বতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, "আমি

* "হা দেবি যজ্ঞভূমিসম্ভবে! হা জন্মগ্রহণপবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি বশিষ্ঠদেব এবং অরুন্ধতীসদৃশ প্রশংসনীয়চরিতে! হা রামময়জীবিতে! হা মহাবনবাসপ্রিয়সহচরি! হা মধুরভাষিণি! হা মিতবাদিনি! এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল!"—নৃসিংহবাবুর অনুবাদ।

সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ। অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, "তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।" যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্য্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতাবিসর্জ্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোক-সূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। "মর্ম্মাণি কৃন্তিত" ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি। এই স্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত এবং অনুবাদিত করিলাম।

তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্তু মাম্॥
সর্ব্বে তু শিরসা ভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥
শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বয়স্যান শত্রুসূদনঃ॥
বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ॥
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং।
ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরাজিতং॥

* * *

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়া পরিবর্জ্জিতং॥
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হতশোভং যথা পদ্মং মুখম্বীক্ষ্য চ তস্য তে॥
ততোঽভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্ব্বে রামস্ত্বশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ॥
তান পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেষ্বাসতেত্যুক্ত্বা ততো বাক্যং জগাদ হ॥
ভবন্তো মম সর্ব্বস্বং ভবন্তো জীবিতং মম।
ভবদ্ভিশ্চ কৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ।
ভবন্তঃ কৃতশাস্ত্রার্থা বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
সংভূয় চ মদর্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরেশ্বরাঃ॥
তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে কিন্নু রাজাভিধাস্যতি॥
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা॥
সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রং বো মা কুরুধ্বং মনোঽন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ত্ততে কথা॥

পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথা জনপদস্য চ ।
বর্ত্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥

*　　　*　　　*

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্ ।
ততো গৃহীত্বা বৈদেহীমযোধ্যামহমাগতঃ ॥
অয়ং তু মে মহান্ বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে ।
পৌবাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ ।
অকীর্ত্তির্যস্য গীযেত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ ॥
পতত্যেবাধমাল্লোঁকান্ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্ত্যতে ।
অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃ কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে ॥
কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্ ।
অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ ॥
[অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্ ।]
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥
নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোঽধিকং ।
স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথং ॥
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষযান্তে সমুৎসৃজ ।
গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ ॥
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ ।
তত্রৈনাম্বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম ।
ন চাস্মিন্ প্রতিবক্তব্য সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥
তস্মাত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয়ৈতৎ প্রতিবারিতে ॥
শাপিতা হি ময়া যূয়ং পাদাভ্যাং জীবনেন চ ॥
যে মাং বাক্যান্তরে ব্রয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন ।
অহিতানাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ ॥
মানয়ন্তু ভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনে স্থিতাঃ ।
ইতোঽদ্য নীয়তাং সীতা কুরুষ্ব বচনং মম ॥*

* অনুবাদ । তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের ন্যায় সুহৃৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে?" সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, "এইরূপই বটে —সংশয় নাই।" তখন শত্রুদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা কবিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম।

রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশযামিমাম্।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব॥
তৎ কিমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দুষযামি।
[সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুন্নময্য বাহুমাকর্ষন্]
অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালমযি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥

দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে, শুভলক্ষণ সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহারা ত্বরিত তাঁহার অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থানপূর্ব্বক মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে "আসনে উপবেশন কর" এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা, মিলিত হইয়া, যাহা বলি তাহার অর্থানুসন্ধান কর।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, "রাজা কি বলেন" ইহা ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুষ্কমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক! আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শুন—মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজনমধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজের সৎকুলে জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্বিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা।

* * *

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান্ অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্ত্তিতেছে। পৌরজনমধ্যে এবং জনপদে সুমহান্ অপবাদ হইয়াছে। লোকে যাহার অকীর্ত্তিগান করে, যাবৎ সেই অকীর্ত্তি লোকে প্রকীর্ত্তিত

উত্থায়। হন্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ, অদ্য পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্য, শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ, অসারঃ সংসারঃ, কষ্টপ্রায়ং শরীরং, অশরণোঽস্মি, কিং করোমি, কা গতিঃ। অথবা

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্।
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈর্ব্বজ্রকীলায়িতং স্থিরৈঃ॥

হা অম্ব অরুন্ধতি, হা ভগবন্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ, হা ভগবন্ পাবক, হা দেবি ভূতধাত্রি, হা তাত জনক, হা তাত, হা মাতরঃ, হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতে বিভীষণ, হা প্রিয়সখ মহারাজ সুগ্রীব, হা সৌম্য হনুমন্, হা সখি ত্রিজটে, দূষিতাঃ স্থঃ পরিভূতাঃ স্থঃ রামহতকেন। অথবা কোনামাহমেতেষামাহ্বানে।

তে হি মন্যে মহাত্মনঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

যোঽহম্

বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা-
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্য শোভাম্।
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ব্বীং
ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি॥

সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা। দেবি দেবি, অয়ং
পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসি পাদপঙ্কজস্পর্শঃ
ইতি রোদিতি।*

হইবে, তাবৎ সে অধমলোকে পতিত থাকিবে। দেবতারা অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, এবং কীর্ত্তিই সকল লোকে পূজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের যত্ন কীর্ত্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।

অতএব তোমরা দেখ, আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি! আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে? তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীর তীরে মহাত্মা বাল্মীকি মুনির স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,—আমার বচন রক্ষা কর—সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও—এ বিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমাপ্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি যে, যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শত্রু খ্যাতি নিত্য বর্ত্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা আমাকে সম্মান করিতে চাও, ——। তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও।

হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি; যিনি গাঢ় প্রণয়-

ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্যবীর্য্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য যে, উত্তরচরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র, রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান কাব্যের উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্য্যপরম্পরার সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন; সে সকল কার্য্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন

বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি সেই প্রিয়াকে মাংসবিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেই রূপ ছল ক্রমে করাল কালগ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে! এ অভাগাকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে? (উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। হায়! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না (চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যন্তেও কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র! হা ভগবন্ অগ্নে! হা নিখিল ভূতধাত্রি ভগবতি বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ)! হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! হা সৌম্য হনুমন্! হা সখি ত্রিজটে! আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্ব্বনাশ (সর্ব্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ন পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা পাপস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যেহেতুক আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগ বশতঃ ইষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ব্বক নির্দ্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল! (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথাগুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্ যুবকের কথা।

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটি দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এই সম্বন্ধে উইন্টর্স টেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে, শম্বুক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চরণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বুক পঞ্চবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্ব্বে একটি একটি বিষ্কম্ভক আছে। এগুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্ভক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভেই সুন্দর। যথা ;—

অধ্বগবেশা তাপসী। অয়ে, বনদেবতেয়ং ফলকুসুমপল্লবার্ঘেণ মামুপতিষ্ঠতে।(১)

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
নচ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্‌যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥ (২)

হরেস্ হেমান উইলসন্ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে যে, তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষাতেই নাই। উত্তরে উদ্ধৃত কবিতা এই কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র শম্বুকের সন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটীর বনে শম্বুককে পাইলেন, এবং

(১) অহো! এই বনদেবতা ফলপুষ্পপল্লবার্ঘের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

(২) গুরু বুদ্ধিমান্‌কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না।

খড়্গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বুক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর।

স্নিগ্ধশ্যামাঃ কচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

এতানি খলু সর্ব্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচণ্ডশ্বাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থান-পর্য্যন্তদীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তন্তে।

তথাহি

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরভোগভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

* * * *

অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি পর্য্যন্তৈরবিরলনিবিষ্টনীল-বহলচ্ছায়তরুণতরুষণ্ডমণ্ডিতানি অসম্ভ্রান্তবিবিধমৃগযূথানি। পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্ত-গম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

অপিচ

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা-
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা-
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ॥ (১)

---

(১) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রুক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝরঝরশব্দে দিক্ সকল শব্দিত হইতেছে; কোথাও পুণ্যতীর্থ, কোথাও মুনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য।

ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণদিগে চলিতেছে। এ সকল সর্ব্ব-লোকলোমহর্ষণ—অত্র গিরিগহ্বর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জ্জনপরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর গর্জ্জনকারী ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসে অগ্নি প্রজ্বলিত। কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।

প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

শম্বূক বিদায়ের পর পুনরাগমনপূর্ব্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রৌঞ্চাবত পর্ব্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না।

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাডম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥
এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥ (১)

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়কনায়িকাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, নাটকে বর্ণিতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য্য এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্য্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার, বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।

---

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর। মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধান কান্তি, অনতিপ্রৌঢ় বৃক্ষসমূহে শোভিত; এবং ভয়শূন্য বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীসকল বহুস্রোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ বেতসলতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে সুগন্ধি এবং সুশীতল করিতেছে; স্রোতঃ পরিপক্বফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্খলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে। গিরিবিবরবাসী যুবা ভল্লুকদিগের থুৎকারশব্দ প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে। এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

(১) এই পর্ব্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারশব্দিত বায়ুযোগধ্বনিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং ইহাতে সর্পেরা, চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বতকুহরে গোদাবরীবারিরাশি গদ্গদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘমালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক ততোধিক। গোদাবরী-সংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতাবিষয়িণী কথা কহিতেছে।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালসহকারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্ব্বসন্তাপহর্ত্তা কাল এই সন্তাপের শমতা সাধিতে পারে নাই।

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ (১)

এইরূপ মর্ম্মমধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই। এ আবার সেই জনস্থান; পদে পদে সীতাসহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কত কাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে পদে মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরীস্রোতঃস্খলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগুলিন্ দেখিল যে, আজি বড় বিপদ্। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, "ভগবতি! সাবধান থাকিও—আজ রামের বড় বিপদ্। দেখিও, রাম যদি মূর্চ্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু মৃদু তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিও।" রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ব্বসন্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন "ছায়া।"—এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতালপ্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাগিনী রামমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্তাবচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্য্যদেবের পূজা করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধূকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মুখ "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল কপোল-সুন্দর"—কবরী বিলোল—শারদাতপসন্তপ্ত কেতকীকুসুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়,

(১) অবিচলিত গভীরত্বহেতুক হৃদয়মধ্যে রুদ্ধ, এ জন্য গাঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবদ্ধ পাত্রমধ্যে পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

বন্ধনবিচ্যুত কিসলয়ের মত সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম! পূর্ব্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থানবনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখিত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!" রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, "আর্য্যপুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!" কি ভ্রম! আর্য্যপুত্র? কোথায় আর্য্যপুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেইখানে বিমান রাখিতে বলিলেন। রামের কণ্ঠস্বর মূর্চ্ছিতা সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন! বলিলেন, "একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, "কেন বাছা, একটা অপরিস্ফুট শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি?" সীতা বলিলেন, "কি বলিলে ভগবতি? অপরিস্ফুট? আমি যে স্বরেই চিনেছি, আমার সেই আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা—বলিলেন, "শুনিয়াছি, মহারাজ রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎসরের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না—"কই স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক?" বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন—

"দিঠ্‌ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃখু সো রাঅ।"—"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ক্রটি হইতেছে না।"

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। "দিঠ্‌ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ।" এইরূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্মপালনে ক্রটি হইতেছে না।" কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া, "সখি, আমায় ধর" বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে পুড়িতে, "সীতে! সীতে!"

বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, "ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা কর। আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

তমসা বলিলেন, "তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব।" এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। (১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

পরে সীতার পূর্ব্বকালের প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী সীতার পুত্রীকৃত করি-শাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে করিতে সেইখানে উপস্থিতা হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সে হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিশলয়স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎকল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ॥

সখি বাসন্তি, পশ্য পশ্য, কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যমপি অনুশিক্ষিতং বৎসেন।

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্পৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-
র্যৎস্নেহাদনরালনালনলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্॥ (২)

(১) "যা হউক তা হউক।" এই কথার কত অর্থগাম্ভীর্য্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে, "আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।" ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে, পাণিস্পর্শ সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক!" কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, "যা হবার হউক!" সীতা ভাবিয়াছিলেন, "রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জন করিয়াছেন,—বিসর্জ্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়া বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম—আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।" তাই ভাবিয়া সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন, "ভঅবদি তমসে! ওসরহ্ম, জই দাব মং পেক্খিস্সদি তদো অণব্ভণুণ্ণাদসণ্ণিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্সদি।" তবু "মম মহারাও!"

(২) যে নবোদ্গত মৃণালপল্লবের ন্যায় কোমল দন্ত দ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবলীপল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, সুতরাং এখনই সে যুবাবয়সের কল্যাণভাজন হইয়াছে।* * সখি বাসন্তি, দেখ, বাছা

এদিকে পুঞ্জীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজ পুত্রদিগকে মনে পড়িল। যে কেবল স্বামিদর্শনে বঞ্চিতা নহেন,—পুত্রমুখদর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্রমুখ-স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অণুবদ্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধকাকসিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ। (১)

সেই গোদাবরীশীকরশীতল পঞ্চবটী বনে, রাম, বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদ্‌গদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারি দিকে সীতার পূর্ব্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় একটি কদলীবনমধ্যবর্ত্তী শিলাতলে, পূর্ব্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্ব্বে পঞ্চবটীবাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন যে, সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ূরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটি দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালি দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিপীড়িত করিয়া,—সখীনির্ব্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?" কিন্তু সে কথা রামের কানে গেল না,—তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?" এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী "মহারাজ!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জ্জনবৃত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, "কুমারের কুশল," এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে

কেমন নিজ কান্তার মনোরঞ্জননৈপুণ্যও শিখিয়াছে। খেলা করিতে করিতে মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি পদ্মসুবাসিত জলের গণ্ডূষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শুণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে সিক্ত করিয়া, স্নেহে অবক্রদণ্ড নলিনীপত্রের আতপত্র ধরিতেছে।

(১) আমার সেই পুত্র দুটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জ্বল, যাহাতে মৃদুমধুর হাসির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, তাহা আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইল না!

লাগিলেন। বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, "দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে ?

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত,—এইরূপ শত শত প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে, তাহাকে—" বলিতে বলিতে সীতাস্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না; অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন, "আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন ?"

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না ?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।"

এই কথোপকথনের সমুচিত প্রশংসা করা দুঃসাধ্য। সীতাবিসর্জ্জন জন্য বাসন্তী রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণারূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন, সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল—আত্মপ্রসাদ, তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে, তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থই সীতাবিসর্জ্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।—মর্ম্মচ্ছেদ হউক, ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখিলেন যে, সে ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক্ একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম্ম রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাম এই কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্নীবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি ? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে ?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম "সীতে! সীতে!" বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতা বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল ? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে ?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জ্জনদুঃখ জ্বলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন ;—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীসৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণমাঞ্জলিঃ। (১)

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, "চণ্ডি জানকি, এই যে চারি দিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারি দিক্ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?" বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী সীতা তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কত বার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সীতা রামচন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র! তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার বার সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম।" এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতাপ্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দনিমীলিত-লোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি বাসন্তি! বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল!"

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। মর্ম্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জ্বলিতেছি, তাহাতে আবার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইতেছেন?

রাম বলিলেন, "সখি, প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গলসূত্রযুক্ত যে হাত আমি ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই তুহিনসদৃশ, বর্ষাশীকরতুল্য শীতল, কোমল লবলী-বৃক্ষের নবাঙ্কুরতুল্য হস্তই আমি পাইয়াছি!"

---

(১) সীতা গোদাবরীসৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন, তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন।

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ অদৃশ্য সীতা-হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চিরসম্ভাবসৌম্যশীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন; অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিত হস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃতশীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে মনে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ!" শেষে যখন রাম সীতার কর গ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শমোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না; আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল অবশ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি, তুমি একবার ধর।" সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন; লইয়া, স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, "কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইঁহার প্রতি এই অনুরাগ।"

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, কই, কোথা সীতা—সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, "আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব? আমি এখন যাই।" শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র যে চলিলেন?" তমসা বলিলেন, "চল, আমরাও যাই।" সীতা বলিলেন, "ভগবতি, ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল এই দুর্লভ জনকে দেখিয়া লই।" কিন্তু বলিতে বলিতে এক বজ্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কাণে গেল। রাম বাসন্তীর নিকট বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—" সহধর্ম্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে মনে বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! কে সে?" এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, "সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।" শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এতদিনে আমার পরিত্যাগ-লজ্জাশল্য বিমোচন করিলে!" রাম বলিতেছেন, "তাহারই দ্বারা আমার বাষ্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন করে, সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।"

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, "ণমো ণমো অপুব্বপুণ্ণজণিদদংসাণং অজ্জউত্তরচরণকমলাণং" এই বলিয়া প্রণাম করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকাল জন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র।"

তৃতীয়াঙ্কের সার মর্ম্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য, বিসর্জ্জনান্তে রাম সীতার পুনর্ম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক

হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, অন্য অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্ত্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

উত্তরচরিত সমালোচনা ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে যে, আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে, তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে নিমন্ত্রিত করিলেন। তদ্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাহার সহিত আলাপ করিলেন। দুহিতৃবিয়োগে জনকের শ্লোকক্লিষ্ট দশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া, বাল্মীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ করিলেন এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতা-চরণকালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে, ইহা— নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনামধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, "স্তনয়িত্নুরবাদিভাবলী-নামবমর্দ্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।" (১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে ;—

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোঽয়মুদীর্ণধন্বা।
দ্বেধাসমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥ (২)

---

(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহ-শিশুও হস্তি-বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ।

(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উত্থিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি দুই দিগ্ হইতে বায়ুসঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।

নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহু সেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দেখিযা লব ভাবিলেন, "কথমনুকম্পতে নাম?" ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, এ কথা অনেক ইউরোপীয় সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

লব কর্ত্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমবা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পাবিলাম না,—

পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃশ্যামৈর্নভোজৃম্ভকৈ-
রুত্তপ্তস্ফুবদাবকূটকপিলজ্যোতির্জ্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোবভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবাকীর্য্যতে
মীলন্মেঘতডিৎকডাবকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব॥ (১)

লবেব সহিত বামেব রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে একবার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, "লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ।" বৃদ্ধ সুমন্ত্রেব মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মন্টাগুব মুখে কীটদংশিত কুসুমকোবকের উপমা মনে পড়িবে।

ষষ্ঠাঙ্কেব বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহব। বিদ্যাধবমিথুন গগনমার্গে থাকিয়া লব-চন্দ্রকেতুব যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভবভূতির কাব্যেব "মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাসঘটিত বচনা আছে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিযা উঠে।" ভবভূতিব অসাধারণ দোষ নির্ব্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিযাছেন। আমরা পূর্ব্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসেব অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভকমধ্যে ঐরূপ দীর্ঘ সমাসেব বিশেষ আধিক্য। আমবা কযেকটি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টি;—

"অবিরলললিতবিকচকনককমলকমনীয়সন্ততিঃ অমরতরুতরুণমণিমুকুলনিকর-মকরন্দসুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ।"

পুনশ্চ বাণসৃষ্ট অগ্নি;—

"উচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুতবস্ফুলিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালাসম্ভারভৈরবো ভগবান্ উষর্ব্বুধঃ।"

পুনশ্চ, বারুণাস্ত্রসৃষ্ট মেঘ;—

"অবিরলবিলোলধুম্মন্তবিজ্জুল্লদাবিলাসমণ্ডিদেহিং মত্তমোরকণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।"

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা;—

"প্রবলবাতাবলিক্ষোভগম্ভীরগুণগুণায়মানমেঘমেদুরান্ধকারনীরন্ধ্রনিবদ্ধম্ একবারবিশ্ব-গ্রসনবিকটবিকরালকালকণ্ঠমুখকন্দরবিবর্ত্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্ব্বদ্বার-নারায়ণোদরনিবিষ্টমিব ভূতজাতং প্রবেপতে।"

---

(১) পাতালভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত, প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎকর্ত্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রিশিখরব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনা-দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা বিশেষ যে দোষ, তাহাও স্বীকার করি; কেন না, ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্বপরিপূর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিবস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধসম্বাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সস্নেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎ-প্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামানুজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টৃবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জনপদবাসী প্রজা ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে ঋষিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণকর্তৃক যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্টৃবর্গমধ্যে ছিলেন।

সীতা বিসর্জ্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গাপ্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমলসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবী কর্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম্ম?" নট-দিগকে বলিলেন, "তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।"

তখন সহসা দেবর্ষি কর্তৃক অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইল! গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জলমধ্য হইতে উঠিলেন—কে? স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, "দেখুন! দেখুন!" কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতীকর্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "উঠ, আর্য্যপুত্র!"

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্ব্বলোক-সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীত্যর্থে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীত হয়েন। যে সূচনায় ঋষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই "সীতার বনবাস" পাঠ করিয়া অবগত আছেন।—সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ

করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতা-শপথ দ বহু লোকের সমাগম হইল।

১০৯ সর্গ।

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥
পুলস্ত্যোঽপি তথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্ম্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ॥
সর্ব্ব এব সমাজগ্মুর্ম্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ॥
নানাদেশাগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথবীক্ষার্থং সর্ব্ব এব সমাগতাঃ॥
তদা সমাগতং সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলং।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্ব্বাষ্প কলা কৃত্বা রামং মনোগতং॥
তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়াতীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীং।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ॥
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাং॥
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্রুশুঃ।
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবং॥
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ॥
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি॥
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥

প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃত্যং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলন্তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং ন কিল্বিষং।
তস্যাহং ফলশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বননির্ঝরে ॥
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥

১১০ সর্গ।

বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জ্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং দেববর্ণিনীং ॥
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাক্যৈরকল্মষৈঃ ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥
লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী।
সেয়ং লোকভয়াদ্ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা ॥
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ॥
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে।
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ ॥
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বে চ পরমর্ষয়ঃ ॥
নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে হৃষ্টমানসাঃ।
দৃষ্ট্বা দেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ॥
প্রত্যয়ো মে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥
সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ॥

তং জনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ।
তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ।
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা॥
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাসায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তযে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতং।
ভূতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমং॥
ধ্রিয়মানং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ॥
তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীং।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ॥
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ॥
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ॥
সাধু সাধ্বিতি বৈ সীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং॥
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনং॥
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে॥
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ॥
কেচিদ্বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ॥
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥(১)

(১) সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থল গমনপূর্ব্বক ঋষিসকলকে আহ্বান করাইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, বামদেব, কশ্যপবংশোদ্ভব জাবালি, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শাক্ত, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, মহাযশা, মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত ও মহাযশা গৌতম, এবং অন্যান্য সংশিতব্রত মুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া

আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার

সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ, মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ, এবং সহস্র সহস্র বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারী ব্রাহ্মণসকল কুতূহলবশতঃ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি, তৎকালে সমাগত জনমণ্ডলী কৌতুকদর্শনার্থ পর্ব্বতবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, ইহা শ্রবণ করিয়া সীতাসহিত শীঘ্র আগমন করিলেন। সীতাও কৃতাঞ্জলি, বাষ্পাকুলনয়না এবং অধোমুখী হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে করিতে সেই ঋষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেই স্থলে অতি মহৎ সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপরে দুঃখজ অতিমহৎ শোক হেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জনসকলের বিপুল হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতকগুলি উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল।

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতা সহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে দাশরথি! ধর্ম্মচারিণী, সুব্রতা এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন; তুমি অনুজ্ঞা কর। এই দুর্দ্ধর্ষ যমল জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না; ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছি; যদ্যপি এই জানকী দুশ্চারিণী হয়েন, তাহা হইলে আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত না হই। কায়মনে এবং কর্ম্মদ্বারা আমি পূর্ব্বে কখনই পাপাচরণ করি নাই; যদ্যপি জানকী নিষ্পাপা হয়েন, তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। হে রাঘব! আমি পঞ্চ ভূত ও ষষ্ঠস্থানীয় মনেতে সীতাকে বিশুদ্ধ বিবেচনা করিয়াই বননির্ঝরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণা শুদ্ধচারিণী লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন।

হে রাজনন্দন! যেহেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও এই শপথার্থ আদেশ করিয়াছি।

অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে আর নাই।

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

রাম বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক জগৎস্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার পবিত্র বাক্যতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহীও লঙ্কামধ্যে পূর্ব্বকালে দেবগণ সমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন, তজ্জন্যই আমি ইঁহাকে গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই জানকীকে আমি পবিত্র জানিযাও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। আর যমল কুশীলব আমারই পুত্র, আমি তাহা জানি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষ বলবান্। জগন্মধ্যে পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক।

অনন্তর সীতা-শপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ বায়ুগণ সকল সাধ্যগণ দেবগণ সকল পরমর্ষিগণ নাগগণ পক্ষিগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সে স্থলে আগমন করিলেন। রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ ঋষিগণকে দেখিয়া পুনর্ব্বার বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পবিত্র ঋষিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্ধশালিনী সীতার প্রতি আমার প্রীতি থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।

তখন দিব্য গন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্ব্বপাপপুণ্য-সাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহ্লাদিত করিল। পূর্ব্বকালে সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কাষায়-বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন। যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামার্চ্চন করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। "আমি রাম ভিন্ন জানি না", আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিতবিক্রম, দিব্য রত্নালঙ্কৃত নাগগণ কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত, দিব্যকান্তি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আবির্ভূত হইল এবং

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক কাব্যে উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না, তদুভয়মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। অনেক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনামধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক আছে। তথাপি ঐ সকলকে অপকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণনা করিতে হয়। কেন না, সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফ লয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিমধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন

সেই স্থলে পৃথিবীদেবী দুই বাহুদ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন।

সিংহাসনারূঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবগণের অতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উত্থিত হইল। সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া অন্তরীক্ষগত দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া, "সীতা সাধু সীতা সাধু যাঁহার এইরূপ চরিত্র" ইত্যাদি নানাপ্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলগত সেই সকল মুনিগণ ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ ও মহাকায় দানবগণ এবং পাতালে নাগগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হৃষ্টমনে শব্দ করিতে লাগিলেন; কাহারা বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত সেই সকল ঋষি প্রভৃতির সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া এই প্রকার সমাগম হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্ত্তে সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল।

কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণা যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি?* কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ঐবান্‌হো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট্ কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ—সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়, তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা।" যদি তাহা সত্য হয়, তবে "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।" চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্তশুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না—চুরি ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ।" চোর বলিল, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।" ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।" চোর বলিল, "তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।"

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, "তুমি চুরি করিও না; কেন না, চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" চোর বলিবে,

* বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুশ্পিন্' খেলার একই দর।

"যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্, আমি চুরি করিব না। কিন্তু যেখানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সেখানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।"

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে—কেন না, লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্য্যে সে বীতরাগ হয়।

"আত্মপরায়ণতা মন্দ—তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।" এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে ভারতবর্ষের আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, কোন নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজকর্ত্তা বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারিকর্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক যে, উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্ত্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থ কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথক্ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এইরূপ যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী,

স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি-গুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতক দূর পাইয়াছেন।

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্রসৃষ্টি-চাতুর্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবধিই তাঁহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড় পদার্থকে রূপবান্ করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে মানবীরূপিণী। সেই রূপগুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্রসৃজনের ক্ষমতার পবিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজন-কৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনী শক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ্ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রসশব্দটি ব্যবহার করিয়া বিপদ্ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়ী ভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া, ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার-স্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদিপরিজ্ঞাপক রস নাই;

কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্য্যেব মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য! অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়ী ভাব" নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজি আলঙ্কারিকেরা তাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে স্নেহ উচ্ছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনী শক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে, চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোত্থিতা, কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুণ্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননাসঙ্কুচিতা; কখন অনুতাপবিবশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একেবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। যখন সীতা বলিলেন, "অম্মহে—জলভরিদমেহত্থণিদগম্ভীরমইসলো কুদোণু এসো ভারদীণিগ্ঘোসো! ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উস্মাবেদি!" তখন বোধ হইল, জগৎ সংসার সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটি মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা, মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রামবিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয়খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের বিলাপ, দেস্দিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ এবং ইউরিপিদিসের নাটকে আল্‌কেস্তিষের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ—সেইখানে কবি

দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতিচমৎকারিণী। তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্ব্বোধ্যতাদোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচনা দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জ্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয় বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।

গীতিকাব্য*

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ, সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা অংশবিশেষে কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্যমধ্যে গণ্য করি, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য় আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

* অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা।

দেখা যাইতেছে যে, এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপ-যোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ, এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus," "Manfred," "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor"কে নাটক বলিলে অন্যায় হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীতপরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে দেখা গিয়াছে, অনেক খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্রে গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে 'Excursion" এবং "Childe Harold"কে ঐ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ডকাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্ সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্যপ্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায় যে, কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি—স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।* অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয়, অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তরচরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনীমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্যগুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ

* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন রবীন্দ্রবাবুর কাব্য সকল প্রকাশিত হয় নাই।

রামবিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে, রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পরসম্বন্ধীয় বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্তসম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুষঙ্গিকতাবশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত

কাব্যরসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্র-চিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে, কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে, এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাঁহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া থাকি যে, নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তখন আর আমাদের ভয় বা কুতূহল থাকে না; কেন না, আমরা আগেই জানি যে, এই অজেয়, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।

এমত অবস্থাতেও যে পূর্ব্বকবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেবচরিত্রকে মনুষ্য-চরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বেষাদির বশীভূত; মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্যপ্রকৃত দেবতারাও তাই। শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ

অবতারস্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় মানবধর্ম্মাবলম্বী। মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। এই মানুষিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; কেন না, কবি মানুষিক বলবুদ্ধিসৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই, এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে এমন একখানি এবং ইংরাজিতে একখানি মহাকাব্য আছে যে, দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে, মূল বিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং Paradise Lost নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিলটনের নায়ক দেবপ্রকৃত ঈশ্বরবিদ্রোহী সয়তান, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুচরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিলটন কোন পক্ষকেই সম্যক্ প্রকারে মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্যরসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য্য হইয়াও, লোকমনোরঞ্জনে তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্ব্বিক পাঠ করেন না; আনুপূর্ব্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিলটনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ, মনুষ্যচরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর সুখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে—তাহাদের উল্লেখ আনুষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখ দুঃখের অনধীন, নিষ্পাপ; যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র বর্ণিত হয় নাই।

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তদ্ভিন্ন পর্ব্বত, পর্ব্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেব দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্রদায়ের লোক সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তাবিরত; দ্বিতীয়, বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বরচিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায় কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্ত্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দূষ্য; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ, ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্ম্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্ব্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত

বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্তশুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে; পরস্পরে পরস্পরের সহায়।

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্‌টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্‌টন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্য বিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্যায়; "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি কবিতার্দ্ধের সঙ্গে মন্টাগুর উচ্চারিত "Like the bud bit by an envious worm" &c. ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়ে হাড়ে মানব। মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবীদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয় কুসুমসুকুমার।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি "কবিওয়ালার" প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছু নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও

কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই ; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র ; যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকাব সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্‌ল্ ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদমতপ্রিয় বক্‌লের সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প ; মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন, এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি ? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিমবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত ; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি ! সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তার পর ভারতবর্ষের অনার্য্য শত্রুসকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত ; ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্ত রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে ? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্য্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল ; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল ভক্তিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র, এ অবস্থা কাব্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন ; উভয়েই চঞ্চলা ; ভারতবর্ষ ধর্ম্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচারশক্তি ধর্ম্মমোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্ম্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন এবং উর্ব্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্ত্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখ-পরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যলেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর এক দল, বাহ্যপ্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্যহৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। এক দল মানবহৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন। আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্যচরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতিকে ধরিয়া লওয়া যাউক। জয়দেবাদির কবিতায় সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়দলশ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহ-লোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ় তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানু-সারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্যহৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ।

জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর। বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্নসমীরণের নিশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্ন-শ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্যলেখকগণকে একটি তৃতীয়শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব-কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়, মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব-শক্তি হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়-পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth.

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প*

একদল মনুষ্য বলেন যে, এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা সুখাভিলাষী, তাহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ, কেহ বলেন ধর্ম্মে, কেহ বলেন অধর্ম্মে; কাহার সুখ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধুর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও—ঘটী বাটী পিত্তল কাঁসাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্নে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্য্যতৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখন এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্য্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপসংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দর্য্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যেটুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্য্য-জনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্ব্বসুখাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শনপ্রিয় বা কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখ চিরনূতন, এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারক-দিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গীত গাইয়া মুষ্টিভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট্ বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লোকি, মেকলে প্রভৃতি

---

* সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি প্রণীত। কলিকাতা।

অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাদুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান ; এই গণ্ডমূর্খ দঙ্গের মধ্যে আধুনিক অর্দ্ধশিক্ষিত কতকগুলি বাঙ্গালি বাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রাজপুরুষ-চূড়ামণি গ্লাডষ্টোন, স্কটলণ্ডজাত মনুষ্যদিগের মধ্যে হিউম্, আদম স্মিথ, হণ্টর, কর্লাইল থাকিতে ওয়ল্টর স্কটকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্পবিদ্যা আছে, সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য সৃজনেব বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণ মাত্র আছে—আর কিছু নাই ; যথা আকাশ।

আর কতকগুলির, বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে ; যথা পুষ্প।

কতকগুলির, বর্ণ ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে ; যথা উরগ।

কতকগুলির, বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে ; যথা কোকিল।

মনুষ্যের বর্ণ, আকার, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী—বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাঁহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দেওয়া হইয়াছে।

সৌন্দর্য্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙ্গালির কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙ্গালির বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না।

স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ ;—পূর্ব্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান-সন্ততি লইয়া গর্ত্তমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিষ্কৃতি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা বাঙ্গালির দারিদ্র্যজন্য। সৌন্দর্য্য অর্থসাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যনুসারে আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলদুর্গোৎসবের ব্যয়, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা

করিলেও সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ ; যে ধর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট মর্ম্মরপ্রস্তুত হর্ম্ম্যও গোময় লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পের দুর্দ্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া শত মুদ্রায় কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকলনবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রসংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে, অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল-মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল, সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। নৃত্য গীত—সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল। সৌন্দর্য্যবিচারশক্তি, সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনসুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।

দ্রৌপদী

(প্রথম প্রস্তাব)

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্ব-মনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিক দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র

ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণগুলিন পরিস্ফুট, দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণসকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্য জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদীচরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ, কেন না, মহাভারত অনন্ত সাগরতুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে! তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ যে, যে সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে; সেই বিশোষ্যমানা কুমারী লাভার্থ দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীরসকল লক্ষ্য বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না, এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহাকবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য, কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন যে, তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই—কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয়, তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবলপরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ডপ্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারীকুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু

দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদ-রাজতুল্য পিতার, ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল, শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রযোজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায় বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাবসিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রাতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,

"হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে, কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, দাসত্ব স্বীকার করিবেন না।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায় দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তির নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবুদ্ধির কারণ হইয়াছিল; দ্রৌপদীতে ইহা ধর্ম্মবুদ্ধির কারণ হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।" স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম—দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।" কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র-সাগরের তল পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন,

"হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!" এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প প্রবল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানুরাগিণী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সে স্থানটি এত সুন্দর যে, যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম।

"হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়; কেন না, প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্ত্তৃক লালিত, উহার দাস-পুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ভ বচনপরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধু-সৌবীরাধিপতি ভূতলে পাতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন, তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশ্যে ভৎর্সনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠের যোগ্য।

দ্রৌপদী

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

দশ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদী-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য আর্য্যনারী-চরিত্র হইতে দ্রৌপদীর-চরিত্রের যে গুরুতর প্রভেদ, তাহা যথাসাধ্য দেখান গিয়াছিল। কিন্তু দ্রৌপদীর চরিত্রের মধ্যগ্রন্থি যে তত্ত্ব, তাহার কোন কথা সে সময়ে বলা হয় নাই। বলিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখন বোধ হয়, সে কথাটা বলা যাইতে পারে।

সে তত্ত্বটার বহির্বিকাশ বড় দীপ্তিমান্—এক নারীর পঞ্চ স্বামী অথচ তাঁহাকে কুলটা বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন উপায় দেখা যায় না। এমন অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য কোথা হইতে হইল ?

আমাদিগের ইউরোপীয় শিক্ষকেরা ইহার বড় সোজা উত্তর দিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়েরা বর্ব্বর জাতি—তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহপদ্ধতি পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, সেই কারণে পঞ্চ পাণ্ডবের একই পত্নী। ইউরোপীয় আচার্য্যবর্গের আর কোন সাধ্য থাকুক আর না থাকুক, এ দেশ সম্বন্ধে সোজা কথাগুলা বলিতে বড় মজবুত।

ইউরোপীয়েরা এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্যজগতে আর কিছু হইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালি তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। যত অনুসন্ধান হইতেছে, তত নূতন নূতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির তুলনায়, অন্ততঃ আকারে, ইউরোপীয় গ্রন্থগুলিকে গ্রন্থ বলিতে ইচ্ছা করে না। যেমন হস্তীর তুলনায় টেরিয়র, যেমন বটবৃক্ষের তুলনায় উইলো, কি সাইপ্রেস, যেমন গঙ্গা সিন্ধু গোদাবরীর তুলনায় গ্রীক কবিদিগের প্রিয় পার্ব্বতী নির্ঝরিণী, মহাভারত বা রামায়ণের তুলনায় একখানি ইউরোপীয় কাব্য সেইরূপ গ্রন্থ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র, ধর্ম্মসূত্র,

দর্শন, এই সকলের ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, অভিধান, ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে আজিও ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই লিপিবদ্ধ অনুত্তরণীয় প্রাচীন তত্ত্বসমুদ্র মধ্যে কোথাও ঘুণাক্ষরে এমন কথা নাই যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ ছিল। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একা দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকত বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না—সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিত! তাই বলিতেছিলাম—এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার স্থূল তাৎপর্য্য কি, এ কথার মীমাংসা করিবার আগে বিচার করিতে হয় যে, এ কথাটা আদৌ ঐতিহাসিক, না কেবল কবিকল্পনা মাত্র? সত্য সত্যই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল, না কবি এইরূপ সাজাইয়াছেন? মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আমি স্বীকার করিয়াছি ও বুঝাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়াই যে উহার সকল কথাই ঐতিহাসিক, ইহা সিদ্ধ হয় না। 'যাহা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, তাহা ঐতিহাসিক নহে —এ কথা ত স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দ্রৌপদী-চরিত্র প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না—দ্রৌপদীকে লইয়াই মৌলিক মহাভারত! তা হউক—কিন্তু মৌলিক মহাভারতে যত কথা আছে, সকলই যে ঐতিহাসিক এবং সত্য, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ। যে সময়ে কবিই ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাসবেত্তাও কবি, সে সময়ে কাব্যেও ইতিহাস বিমিশ্রণ বড় সহজ। সত্য কথাকে কবির স্বকপোলকল্পিত ব্যাপারে রঞ্জিত করা বিচিত্র নহে। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন, ইহা না হয় ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকার করা গেল—তিনি যে পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী, ইহাও কি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

এই দ্রৌপদীর বহুবিবাহ ভিন্ন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থসমুদ্রমধ্যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে স্ত্রীগণের বহুবিবাহের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিধবা হইলে স্ত্রীলোক অন্য বিবাহ করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এক কালে কেহ একাধিক পতির ভার্য্যা ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্যের প্রতি হস্তে ছয়টি করিয়া দুই হস্তে দ্বাদশ অঙ্গুলি আছে; কখন দেখা গিয়াছে যে, কোন মনুষ্য চক্ষুহীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, মনুষ্যজাতির হাতের আঙ্গুল বারটি, অথবা মনুষ্য অন্ধ হইয়া জন্মে। তেমনি কেবলি দ্রৌপদীর বহুবিবাহ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, পূর্ব্বে আর্য্যনারীগণ-মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর মহাভারতেই প্রকাশ যে, এরূপ প্রথা ছিল না; কেন না, দ্রৌপদী সম্বন্ধে এমন অলৌকিক ব্যাপার কেন ঘটিল, তাহার কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মহাভারতকার পূর্ব্বজন্মঘটিত নানাবিধ অসম্ভব উপন্যাস রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন, যাহা সমাজ মধ্যে একেবারে কোথাও ছিল না, যাহা তাদৃশ সমাজে অত্যন্ত

লোকনিন্দার কারণ স্বরূপ হইত সন্দেহ নাই, তাহা পাণ্ডবদিগের ন্যায় লোকবিখ্যাত রাজবংশে ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কবির এমন একটা কথা, তত্ত্ববিশেষকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গড়িয়া লওয়া বিচিত্র নহে।

গড়া কথার মত অনেকটা লক্ষণ আছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর ঔরসে পঞ্চ পুত্র ছিল। কাহারও ঔরসে দুইটি, কি তিনটি হইল না। কাহারও ঔরসে কন্যা হইল না। কাহার ঔরস নিষ্ফল গেল না। সেই পাঁচটি পুত্রের মধ্যে কেহ রাজ্যাধিকারী হইল না। কেহই বাঁচিয়া রহিল না। সকলেই এক সময়ে অশ্বত্থামার হস্তে নিধন পাইল। কাহারও কোন কার্য্যকারিতা নাই। সকলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এক একবার আসিয়া একত্রে দল বাঁধিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। আর কিছুই করে না। পক্ষান্তরে অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন, কেমন জীবন্ত।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চ বিবাহ গড়া কথাই হইল, যদি দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের ভার্য্যা ছিলেন, তবে কি আর চারি পাণ্ডব অবিবাহিত ছিলেন? ইহার উত্তর কঠিন বটে।

ভীম ও অর্জ্জুনের অন্য বিবাহ ছিল, ইহা আমরা জানি। কিন্তু নকুল সহদেবের অন্য বিবাহ ছিল, এমন কথা মহাভারতে পাই না। পাই না বলিয়াই যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাঁহাদের অন্য বিবাহ ছিল না, এমন নহে। মহাভারত প্রধানতঃ প্রথম তিন পাণ্ডবের অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ও ভীমার্জ্জুনের জীবনী; অন্য দুই পাণ্ডব তাঁহাদের ছায়া মাত্র—কেবল তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করে। তাঁহাদের অন্য বিবাহ থাকিলে সেটা প্রয়োজনীয় কথা নহে বলিয়া মহাভারতকার ছাড়িয়াও যাইতে পারেন। কথাটা তাদৃশ মারাত্মক নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হওয়ার পক্ষে আমরা উপরে যে আপত্তি দেখাইয়াছি, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক গুরুতর।

এখন, যদি দ্রৌপদীর পঞ্চবিবাহ কবিরই কল্পনা বিবেচনা করা যায়, তবে কবি কি অভিপ্রায়ে এমন বিস্ময়করী কল্পনার অনুবর্ত্তী হইলেন? বিশেষ কোন গূঢ় অভিপ্রায় না থাকিলে এমন কুটিল পথে যাইবেন কেন? তাঁহার অভিপ্রায় কি? পাঠক যদি ইংরেজদিগের মত বলেন, "Tut! clear case of polyandry!" তবে সব ফুরাইল। আর তা যদি না বলেন, তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সেই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার আগে কোন বিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাস্পদ লোকের একটি উক্তি আমি উদ্ধৃত করিব। কথাটা প্রচারে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্রকে" লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ইহলোকে বিচরণ করিয়াছিলেন, একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু মহাভারতপ্রণয়নের পূর্ব্বকাল হইতেও যে, শ্রীকৃষ্ণে একটি অতিমানুষ ঐশী শক্তির আবির্ভাব লোকের বিশ্বাসিত হইয়াছিল, তাহাও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথম হইতেই মহাভারতগ্রন্থেও যে সেই বোধের একটি অপূর্ব্ব প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; বস্তুতঃ তাহাই সম্ভবপর। তবে আমাদের বোধ হয়, মহাভারতরচয়িতা কর্ম্মকাণ্ড বেদব্যাখ্যা প্রভৃতি তাঁহার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে অর্জ্জুন এবং ভদ্রাকে আদর্শ নর-নারী করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরে অচল ভক্তি এবং তজ্জাত ঈশ্বরের নেতৃত্বে প্রতীতিই যে আদর্শ পুরুষের প্রকৃত

বল, তাহাও প্রদর্শনার্থ নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণে একটি বিশেষ ঐশী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সে ঐশী শক্তিটি কোন পার্থিব পাত্রে কোন দেশের কোন কবি কর্ত্তৃকই কখন ধৃত হয় নাই। আদি কবি বাল্মীকিও তাহা ধরিবার চেষ্টা করেন নাই—মহাভারতকার সেই কাজে অধ্যবসায় করিয়াছিলেন, এবং তাহা যতদূর সম্পন্ন হইতে পারে, ততদূর সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই, মহাভারত গ্রন্থখানি পঞ্চম বেদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ ঐশী শক্তিব নাম 'নির্লিপ্ততা'। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপী 'নির্লেপ'।"*

এই "নির্লেপ" বৈরাগ্য নহে অথবা সাধারণে যাহাকে "বৈরাগ্য" বলে, তাহা নহে। আমি ইহার মর্ম্ম যতদূর বুঝি, গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

আসক্তি বিদ্বেষ রহিত এবং আত্মার বশীভূত ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা (ইন্দ্রিয়ের) বিষয় সকল উপভোগ করিয়া সংযতাত্মা পুরুষ শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব নির্লিপ্তের পক্ষে ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগ বর্জ্জন নিষ্প্রয়োজন। এবং বর্জ্জনে সংক্লেপই বুঝায়। বর্জ্জনের প্রয়োজন আছে, ইহাতেই বুঝায় যে, ইন্দ্রিয়ে এখন আত্মা লিপ্ত আছে—বর্জ্জন ভিন্ন বিচ্ছেদ এখনও অসাধ্য। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয় বিষয়ের উপভোগী থাকিয়াও তাহাতে অনুরাগশূন্য, যিনি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে বিজিত করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ বিষয়ের উপভোগ করেন, তিনিই নির্লিপ্ত। তাঁহার আত্মার সঙ্গে ভোগ্য বিষয় আর সংশ্লিষ্ট নহে। তিনি পাপ ও দুঃখের অতীত।

এইরূপ "নির্লেপ" বা "অনাসঙ্গ" পরিস্ফুট করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন—নির্লিপ্ত বা অনাসক্তকে অধিকমাত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। এই জন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য বরাঙ্গনামধ্যবর্ত্তী করিয়াছেন। এই জন্য তান্ত্রিকদিগের সাধন প্রণালীতে এত বেশী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর আবির্ভাব। যে এই সকল মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিয়া তাহাতে অনাসক্ত রহিল, সেই নির্লিপ্ত। দ্রৌপদীর বহু স্বামীও এই জন্য। দ্রৌপদী স্ত্রীজাতির অনাসঙ্গ ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপিণী। তৎস্বরূপে তাঁহাকে স্থাপন করাই কবির উদ্দেশ্য। তাই গণিকার ন্যায় পঞ্চ পুরুষের সংসর্গযুক্তা হইয়াও দ্রৌপদী সাধ্বী, পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা। পঞ্চ পতি দ্রৌপদীর নিকট এক পতি মাত্র, উপাসনার এক বস্তু, এবং ধর্ম্মাচরণের একমাত্র অভিন্ন উপলক্ষ্য। যেমন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার নিকট বহু দেবতাও এক ঈশ্বর মাত্র—ঈশ্বরই জ্ঞানীর নিকট এক মাত্র অভিন্ন উপাস্য, তেমনি পঞ্চ স্বামী অনাসঙ্গযুক্তা দ্রৌপদীর নিকট এক মাত্র ধর্ম্মাচরণের স্থল। তাঁহার পক্ষাপক্ষ, ভেদাভেদ, ইতরবিশেষ নাই; তিনি গৃহধর্ম্মে নিষ্কাম, নিশ্চল, নির্লিপ্ত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহাই দ্রৌপদী-চরিত্রে অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য। তবে ঈদৃশ ধর্ম্ম অতি-দুঃসাধনীয়। মহাভারতকার মহাপ্রাস্থানিক পর্ব্বে সেটুকুও বুঝাইয়াছেন। তথায় কথিত হইয়াছে যে, দ্রৌপদীর অর্জ্জুনের দিকে কিঞ্চিৎ পক্ষপাত ছিল বলিয়া তিনি সেই

* এডুকেশন গেজেট, ১৮ বৈশাখ ১২৯৩।

পাপফলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিলেন না—সর্ব্বাগ্রেই পথিমধ্যে পতিতা হইলেন।

বোধ হয়, এখন বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর ঔরসে কেবল এক একটি পুত্র কেন? হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন ধর্ম্ম, যাহীব তাহাতে বিরতি অধর্ম্ম। পুত্র উৎপন্ন হইলে বিবাহ সফল হইল, না হইলে, ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু ধর্ম্মের যে প্রয়োজন, এক পুত্রেই তাহা সিদ্ধ হয়। একাধিক পুত্রেব উৎপাদন ধর্ম্মার্থে নিস্প্রয়োজনীয়—কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিব ফল মাত্র। কিন্তু দ্রৌপদী ইন্দ্রিয়সুখে নির্লিপ্ত, ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, স্বামিগণেব সঙ্গে তাঁহার ঐন্দ্রিয়িক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। স্বামীর ধর্ম্মার্থ দ্রৌপদী সকল স্বামীর ঔরসে এক এক পুত্র গর্ব্ভে ধারণ কবিলেন, তৎপরে নির্লেপবশতঃ আব সন্তান গর্ব্ভে ধারণ করিলেন না। কবির কল্পনার এই তাৎপর্য্য।

এই সকল কথার তাৎপর্য্য বোধ করি, কেহই এমন বুঝিবেন না যে, যে স্ত্রীলোক অনাসঙ্গ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই পাঁচ ছয়টি মনুষ্যকে স্বামিত্বে বরণ করিবে—তাহা নহিলে ধর্ম্মের সাধন হইবে না। তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, মহাপাতকে পড়িলেও পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্রৌপদীর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্ত্রীলোকের পক্ষে তেমন মহাপাপ আর কিছুই নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছিল বলিয়া, তিনি সেই মহাপাপকেও ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন।

আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, দ্রৌপদী ধর্ম্মবলে অত্যন্ত দৃপ্তা, সে দর্প কখন কখন ধর্ম্মকেও অতিক্রম করে। সেই দর্পের সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়জয়ের কোন অসামঞ্জস্য নাই। তবে তাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

অনুকরণ*

জগদীশ্বরকৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক, "বাইমেনা" জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধে মনুষ্য বটে, কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা কোন্ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ববাদী। আমরা ইংরেজী সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব

* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

নব্য বাঙ্গালিচরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন এই সকল একত্র করিয়া, দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেক্‌সন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ, খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি এই মহাত্মাদিগের মতে মনুষ্যের মধ্যে নব্য বাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—তেমনি পশুচরিত্রসাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণবাবুর ন্যায়, যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণবাবুকে বলি যে, আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন?—গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ। ইহারা সম্বাদপত্ররূপ, ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরেজ চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে, বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে, সমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, বসের বাজারে চোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থসর্ষপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

কিন্তু যিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করুন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ-বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণবাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন—বাঙ্গালির হিতার্থ। সেকালে আর একালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—একালের দোষনির্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। একালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই—করাও নিষ্প্রয়োজন, কেন না, আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পলকের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি।

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদি-সম্মত। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালি, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই—সে সকল কথা আজিকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, রাজনারায়ণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে

শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্য জাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ের, বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই; কেন না, ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্‌সন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদয় রোমক-সাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমকসাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়ক-সকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অমিতবলধারী বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ মহাভারতে অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছেন, এবং ভরত শত্রুঘ্ন নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু, ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী; যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জ্বলন্ত; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুরে

বভ্রুবাহন কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে ; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্যবিন্ধনে পরিণত হইয়াছে ; দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন ; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে।

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা য়ুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে য়ুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেবেন্সের নাটক, হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্ম্মনীতি, অন্তনৈনদিগের রাজধর্ম্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাট্‌গণের স্থাপত্য কীর্ত্তি। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র, রোমক ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অনুকরণ ; ইউরোপীয় শাসন-প্রণালী, রোমকীয়ের অনুকরণ। কোথাও সেই ইম্পিরেটর, কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী ; কোথাও ফোরম, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও য়ুনানী রোমক মূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল ; এক্ষণে অনুকরণাব... পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয় ; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ য়ুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কার্য্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই ; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে ; এবং বাঙ্গালির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি ?

উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐরূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণপ্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর্য্যবংশসম্ভূত, আর্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন, তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসিদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর; ইংরেজরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য, এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে, দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি, এবং এই জন্যই রাজনারায়ণবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক-গুলিকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র্য-ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি এক প্রকার হইত—মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণজ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যেই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্নপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তি কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না, সুতরাং কার্য্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সামকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য

অনেক, এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্রবৈচিত্র্য, কার্য্যবৈচিত্র্য, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য্য, অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র্যহানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্য-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ঘটে না, সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে, যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকলপ্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার, কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল সাপেক্ষ, দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্রদোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষি-পালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা।

শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ-পথে আসিল ;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear : for several virtues
Have I liked several women ;
.........but you, O you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best !

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা ; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতি প্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভালবাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই ; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণা-বিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব মল্লিকার উপর ; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর ; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর ; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে ; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা ; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord, how it looks about ! Believe me, sir,
It carries a brave form. But 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা ;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলাব সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিবন্দা বলিতেছে,

O dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble : I have no ambition
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পাবি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখ-কাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল ; কেন না, শৈশবের পব পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন ? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে ; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা ; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়াই, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি।

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man that e'er I saw, the first
That e'er I sigh'd for :

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না, নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower, I would not wish
Any companion in the world but you ;
Nor can imagination form a shape,
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ :

Hence, bashful cunning !
And prompt me, plain and holy innocence !
I am your wife, if you will marry me ;
If not, I'll die your maid : to be your fellow
You may deny me ; but I'll be your servant,
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর", মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে

তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অদ্ধপধে সুমবিঅ এদস্স হথত্তংসিণো মিণালবলঅস্স কদে পডিণিবুত্তম্হি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে—

"ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?"—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না, যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না, প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম, কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা, দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র, মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়—"অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজ-মহিষী, মাতৃপদে আরোহণোন্মুখী, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী, এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক

ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পব তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধূ।
এক্কক্কস্মঅ চরিএ ভণাদু কিং এক্কএক্কস্মিং॥

তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ, নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া—কেন না, দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামিকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার-পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে; কেন না, মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহম্ভোঃ" শুনিতে পান নাই! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেস্‌দিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি—প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্‌দিমোনা গরীয়সী! স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্ত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত,

লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুম্মে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মখিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্‌দিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেস্‌দিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন," ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

O good Iago,
What shall I do to win my lord again?
Good friend, go to him; for, by this light of heaven,
I know not how I lost him. Here I kneel:

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেস্‌দিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" যখন দেস্‌দিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্তজন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেস্‌দিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম। আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।" তখনও দেস্‌দিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে—কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যানকাব্য, কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না, কেন না, এরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অমূল্য বলিলেও হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যানকাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেস্‌দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা

> ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং
> বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
> হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
> প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

বাঙ্গালির বাহুবল

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্ব্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেন না, বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসা প্রবন্ধান্তরে করা গিয়াছে। থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্তবংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী গ্রীক জাতি শতদ্রু অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে, সেই বীরেরা আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন; জানা আছে যে, তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা ভারতভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিন শত বৎসরে পশ্চিমভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালির পূর্ব্ববীরত্ব, পূর্ব্বগৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন পশ্চিমভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ্ সকল প্রণীত হইতেছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্ব্বসম্পদ্‌শালিনী নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্য্যভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত। (১) কেবল ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে, সমস্ত আর্য্য বীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখণ্ডসকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্রসকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্ত সাঙ বঙ্গদেশপর্য্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন. এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্ব্বল অনার্য্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

প্রথম। কিম্বদন্তী আছে যে, দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি দেশী গ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লালসেনের অধিকার দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত যে, অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" দেখ।

প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশীপ্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণে সে মত পরিত্যক্ত হইতেছে। (১)

তৃতীয়। লক্ষ্মণসেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায় যে, সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

অতএব পূর্ব্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ সাঙ সমতট-রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খর্ব্বাকৃত, দুর্ব্বল-গঠন ছিল।

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি ?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে, যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্ব্বল, সেই সেই কারণ যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি ?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির দুর্ব্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে, ভূমি উর্ব্বরা হইলে আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন ব্যবসায়, বল, সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য, মনুষ্যকে সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিরত রাখে, এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ব্বর দেশ আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ব্বরতায় ন্যূন নহে। সে সকল দেশের লোক দুর্ব্বল নহে।

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্ব্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে

(১) See Introduction to Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall, p. xxxv. Note 2.

পারে। (৩) আর যাঁহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীর্য্য জানেন, তাঁহারা তাপকে দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

অনেকে মোটামুটি বলেন যে, জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ।

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এ দেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাউল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এজন্য "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে।

শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে ষ্টার্চ, গ্লুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রোজেন-প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূমভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্—"ভেতো" জাতির শরীর দুর্ব্বল। ময়দায় গ্লুটেন শতভাগে দশভাগ থাকে; (৪) মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ (৫); এবং ভাতে ৭ কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে। (৬) সুতরাং বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইবে বৈ কি!

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশত্রু—বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির শরীর দুর্ব্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয়সুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি?

---

(৩) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its eastern districts, has become proverbial : and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified by observations. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England.

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, is on the average of the year, about twice as great as in that of London ; but the relative humidity of the former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the driest months of an European climate.—Bengal Administration Report, 1872-73, Statistical Summary.—page 5-6.

(৪) Johnstone's *Chemistry of Common Life*, Vol. 1, p. 100.

(৫) Ibid, p. 125.

(৬) Ibid, p. 101.

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্ব্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুজা যায়। কিন্তু জলের বা বায়ুর মৃত্তিকার কোন্ দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই।

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না যে, অল্পকালে সে দুর্ব্বলতা দূর হইবে। তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এমত কোন নিশ্চয়তা নাই যে, কোন কালে এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে, গোধূমাদির চাষ এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবে। এমন কি, কালে জলবায়ুরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এক্ষণে মনুষ্যবাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন, তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আবাস ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা— সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পরিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোমনগরীর নিম্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ জমিযা যাইত। এব, এক সময়ে ক্রমাগত চল্লিশ দিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কৃষ্ণসাগরে (Euxine Sea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত যে, তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নামমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুষ্ক করায় এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্য্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল যে, ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত! এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে বহুসংখ্যক ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশ ছিল,—এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্নমাত্র নাই। লাব্রাডর এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত—কিন্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মানেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছেন। (১)

এ সকল পরিবর্ত্তনের অতি দূর সম্ভাবনা। না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ; কেন না, দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।

(১) *The Scientific American.*

তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই ? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটি উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই ?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার ইউরোপ আসিয়া জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবল ব্যতীতও উন্নতি ঘটে।

দ্বিতীয় উত্তরে আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্ব নগরে, সর্ব্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই ? এই প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, **শারীরিক বল বাহুবল নহে।**

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্য জাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে ? এক একজন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল কেন ? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালিচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে যে, তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের অপূর্ত্তিজন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি

মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে যে, সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্যসুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে, সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে, তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়ঃ বোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

ভালবাসার অত্যাচার

লোকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ-দয়া-দাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমা-দিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে, সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যে ভালবাসে, সে যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধিকারী নহে। রাজাই কেবল অধিকারী, এই জন্য যে, তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসৎবিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমা-দিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন।* যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত

* যদি রাজার এমন অধিকার আছে, স্বীকার করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে আপনার চিকিৎসা করিবে না বা যে অল্প বয়সে বা বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে, রাজা তাহার দণ্ড করিতে

হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই অধিকারী ; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেরই অধিকার আছে যে, সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তিমত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা, পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কায্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে না। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বাসনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতি-পাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিরা নীতিবেত্তা নহেন ; নীতিবেত্তারা এবিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না, এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী, আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এ বিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকূটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তমপদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য-মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটি নিতান্তই ভাল-বাসার অত্যাচার, এবং হিন্দুসমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ নববঙ্গবাসীদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্ত্তব্য যে, কতকগুলি ভাল-বাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেকগুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

অধিকারী। আর রাজার যদি এরূপ অধিকার স্বীকার করা না যায়, তবে চড়ক বন্ধ, সতীদাহ বন্ধ-প্রভৃতি আইনের সমর্থন করা যায় না।

যাহা হউক, মনুষ্যজীবন ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচার পীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ, সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায় ধর্ম্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায় সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও পীড়ন অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা, কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন বা কেহ তেমন সদাসর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না, অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না, ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজি পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গোস্বামীর সম্মুখে মাংসভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না, জানেন যে, ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজি পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড়পদার্থকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচাব আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে; কেন না, অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ম্মের অত্যাগার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয়, জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রণয়ের দ্বারাই প্রণয়ের অত্যাচার শমিত

হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহা ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ যে, স্বার্থপরতাশূন্য স্নেহ দুর্ল্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না, কেন না, পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শনমাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন, যে ধনের কামনা করে না, তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে এবং তন্মধ্যে কোন কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুত্রমুখদর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল, সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে, মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখদর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে মাতা স্বার্থপর, কেন না, আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়সুখের অভিলাষী, এই জন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের, স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতে হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য স্নেহ মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য, দাম্পত্য ব্যতীত পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটি মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখদর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী! যে প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, তত দিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফুর্ত্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্ল্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন। অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটি মাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পর-সম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।" এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রাবলম্বন করিলেই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন তাঁহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত যে, আমি কেবল আপন সুখের জন্য হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথকৃত রামনির্ব্বাসন মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্দ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে, ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে, পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা-মাতা স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ সত্য-পালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাঁহার যশঃ কীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়া-ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্যমাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ দস্যুর প্ররো-

চনায় সুহৃদ্‌কে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

সেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়; কেন না, সত্য নিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম কর যে, যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক, তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা তাঁহার তৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক, তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? সত্যপালনের একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্মসংস্কার-নীতিতে। আমরা আত্মসংস্কারনীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্ম-নীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে তত দূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্ত-জনিত জনসমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা-দোষযুক্ত যে অনিষ্ট, তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি, একই চরম। উভয়ের সাধ্য, অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যত দিন না সার্ব্বজনীন প্রেমস্বরূপ হয়, তত দিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ, কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।

জ্ঞান

ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে যে অর্থে "ফিলসফি" শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,—কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানের উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তরবিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা; ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। ইহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ,—কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্ব্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দর্শনের অন্তর্গত।

সংসার দুঃখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্ব্বদা মনুষ্য-সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যাহা কিছু সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্যজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র—যখন তুমি সমরজয়ী হইলে, তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিলে। কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ —প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আর্য্যমতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনন্ত দুঃখে কোনরূপে কাটাইয়া, প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল—তথাপি ক্ষমা নাই—আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে,—আবার জন্মিতে হইবে,—আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই?

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়, যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার, সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবন-রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কর—প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল—ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র।

ভারতবর্ষীয় উত্তর এই যে, প্রকৃতি অজেয়—যত দিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন দুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধবিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন।

সেই জ্ঞান কি? আকাশকুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—কেন না, আকাশ কি, তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি, তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ের সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি?

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে, পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে, ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে, এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্ব্বিষয় অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু অন্তর্জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন এরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ এরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনা প্রত্যক্ষে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর, ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার, এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে, গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-জ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকার গৃহে তুমি যদি যূথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে যে, গৃহে পুষ্পাদি আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে আমরা প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি

(১) গৃহ, পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থবিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

কোন ব্যক্তি সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালেব মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয়, তাহা অধিকাংশ লোকেরই নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যে, তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিযাছেন, তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণুমাত্র যে অন্য পরমাণুমাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়, সংখ্যাদি আর্য্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগেব বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপব নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য, তাহার উপদেশ,—আর্য্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাগাদি কোন কোন আর্য্য দার্শনিক ইহাকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকাব করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথায় বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তি-বিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে সেই জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে, কে বিশ্বাসযোগ্য, কে নহে। কোন্ প্রমাণের উপব নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুব কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে যে, অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ যে, মনু অভ্রান্ত ঋষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে, মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুব ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতকগুলি উপদেশ গ্রাহ্য কর, তাহারই আর কতক-গুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ

সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতিকেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটি পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য। ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য—আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য, ইহা আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞা। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিতদিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে, উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে যে, অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা-গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকার গৃহে থাকিয়া যূথিকা-ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না যে, গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল।

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। (১) অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্ত্র দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আর্য্যবুদ্ধি! যাহা এত কালে হ্যুম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে—দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে, আমরা এমন বলিতেছি যে, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই—আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা,—কাল, আকাশ, ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,—যথা,

(১) এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।

বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমান-পদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এদেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কাণফোড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে, যখন দুর্গ কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে।

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে এই ধর্ম্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্ম্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্ম্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্ম্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে "বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সাংখ্যদর্শন" ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নির্ব্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।*

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা তৎপরবর্ত্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই।

সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন্ কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিম্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন্ কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

* বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে।

কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমরা "নিরীশ্বর সাংখ্যকেই" সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি-প্রণীত যোগশাস্ত্রকে· সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই।

সাংখ্যদর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্যপ্রবচনকে অনেকেই কাপিল সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যে আছে। ঐ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বসমাস, ভোজবার্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্যপ্রদীপ, সাংখ্যতত্ত্ব-প্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কপিল অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং যাহা কাপিল সূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

কতকগুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে সৃষ্ট করিয়াছেন। সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টিমধ্যে কত কৌশল কে না দেখিতে পায়?

আবার কতকগুলি লোক আছেন. তাঁহারাও বিজ্ঞ—তাঁহারা বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না—তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিবে. ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সেগুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর এমন সকল নিয়ম করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি ও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদকসেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক—তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? কতকগুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ ·অনিষ্টকারী কার্ব্বণিক আসিড-প্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিষবীজ কখন্ আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেকগুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা

আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণ্ডমূর্খ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রিদিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থূলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, তত দিন যে মনুষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব?

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও দুঃখ পাইব না, এমত দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্ত্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে যে, স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্ত হওয়াতেও দুঃখ। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে মাল্থসের মত, ইহার একটি প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী (৬ অধ্যায়, ৭ সূত্র), এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে, বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন (ঐ, ৮)। দুঃখ হইতে তাদৃশ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মে না (ঐ, ৬)। অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সূত্র "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।"

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্য্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি নাই; কেন না, আবার সেই সকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এরূপ উপায় সর্ব্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া

গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না (১ অধ্যায়, ৪ সূত্র)।

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্‌তের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনর্জ্জ্বালিত হইতে পারে বলিয়া তুমি যদি জলকে অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্ম-পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া, এবং জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখ নিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না (৩ অধ্যায়, ৫২-৫৩ সূত্র)। আত্মা বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখনিবৃত্তি বলেন না ; কেন না, যে জলমগ্ন তাহার আবার উত্থান আছে (ঐ, ৫৪)।

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখনিবৃত্তি।

অপবর্গই বা কি? "দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ।" (তৃতীয় অধ্যায়, ৬৫ সূত্র)। সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পরপরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব। "অপবর্গ" ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ম্মকলঙ্কিত বা সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত, এমন মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্য দর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বিবেক

আমি যত দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্যপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি,—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন "তুমি" বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞান-গোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ-দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে ; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে ; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকার মাত্র।

সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, তাহাই বেদনা। সাংখ্য-মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, "মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল সেই আত্মা।" এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাই প্রায় সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উঁহারা মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন।

শরীবাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। শারীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমাব বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে ; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষকে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোঽয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে (১ অধ্যায়, ১৫ সূত্র)। অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার নহে (ঐ, ১৪ সূত্র)। "ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ শ্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরাজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই ; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে ; দেশব্যবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলীপুত্র নগরে থাকে, আর একজন শ্রুঘ্ননগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ। পুরুষের দুঃখ কেন?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিকপাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বাতদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ (৬, ৭০)।

সাংখ্যের মত এই। যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হয়, যদি আত্মাই সুখ-দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই "যদি"গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটিবিষ্ট এখনই বলিবেন,—

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কিসে জানিতেছ? শারীর তত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশবিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে সুখদুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখদুঃখভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তদ্বিষয়ে অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে, দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪র্থ। দেহধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার জরামরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে, এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায়।

প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? প্রকৃতিবিষয়ে যে অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি-পুরুষসম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই শক্তি" (Knowledge is Power); হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই মুক্তি"। দুই জাতি দুইটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে এক পথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তি-অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানেই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আর্য্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়, কখন মহামঙ্গলকর, কখন মহৎ অমঙ্গলের কারণ দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্রসকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল—প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্য্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক এবং সূত্রগ্রন্থসকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুষঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে তাহার উন্নতি হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি

আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একেবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার বলিলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্ম্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সৃষ্টি

অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য। অনাদিকাল এইরূপ আছে, না কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন ?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট, জগৎকর্ত্তা একজন আছেন। সামান্য ঘট-পটাদি একটি কর্ত্তা ব্যতীত হয় না ; তবে এই অসীম জগতের কর্ত্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে ?

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন ; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ কর্ত্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইঁহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে ; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক্ তত্ত্ব, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্ তত্ত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, "আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়া মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।"

এখনকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্ মত অযথার্থ, কোন্ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন না ; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(ক)র কারণ (খ) ; (খ)র কারণ (গ) ; (গ)র কারণ (ঘ) ; এইরূপ কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক স্থানে অন্ত পাওয়া যাইবে ; কেন না, কারণশ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটি ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে ; সেই বৃক্ষ একটি বীজে জন্মিয়াছে ; সেই বীজ অন্য বৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল, সেই বৃক্ষও আর একটি বীজে জন্মিয়াছিল। এইরূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটি আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন (১৭৪)।

জগদুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে ই বিশ্বসংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই ;—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

১। পুরুষ।

২। প্রকৃতি।

৩। মহৎ।

৪। অহঙ্কার।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯। পঞ্চ তন্মাত্র।

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০। একাদশেন্দ্রিয়।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫। স্থূল ভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ এবং আকাশ স্থূল ভূত। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। "আমি" জ্ঞান অহঙ্কার। মহৎ মন।*

স্থূল ভূত হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এই জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে, ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। তবে "আমিও" আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে (Cogito ergo Sum.) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

মনের সুখ দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে।

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণসকলে যে সৃষ্টিক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র।

বেদে কোথাও সাংখ্যদর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় না। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে সৃষ্টিকথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টিকথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐরূপ। কেবল পুরাণে আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষ্ণু, ভাগবত এবং লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বে সাংখ্য-দর্শনের সৃষ্টি। মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন্ অংশ নূতন, কোন্ অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিত করা ভার। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মস্তোত্র আছে, তাহা সাংখ্যানুকারী।

---

* Mind নহে ; Consciousness.

সাংখ্য-প্রবচনে বিষ্ণু, হরি, রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। পুরাণে আছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—নিরীশ্বরতা

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বব বলিয়া খ্যাত; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলব এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে, সাংখ্যমতাবলম্বীরা আদিবিদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে, ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিল সূত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক।

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সূত্র এই— "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব।

সূত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন, প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ৮৯ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, "যৎ সম্বন্ধসিদ্ধং তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।" অতএব যাহা সম্বন্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসম্বন্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পাবেন। ৯০।৯১ সূত্রে সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন যে, ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন—ঈশ্বর আছেন, এমত কোন কোন প্রমাণ নাই; অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বর্ত্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না।

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে, ঈশ্বর নাই। যে বলে যে, ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এই দুইটি পৃথক্ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার ও চতুষ্কোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুষ্কোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত: কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহারা ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস, তাহা ভ্রান্তি। "কোন পদার্থ আছে, এমত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে," ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে, সে ভ্রান্ত।

অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,—তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,—কিন্তু আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই।

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল, ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে, চেতনাদি মানসিক বৃত্তিসকল শরীর হইতে বিযুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার, নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নাই।

সে প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেকগুলি সূত্র একত্র করিয়া, সাংখ্য-প্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মর্ম্ম সবিস্তারে বুঝাইতেছি।

তিনি বলেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ (১, ৯২), প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। ৫, ১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত' কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তু নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটিকে দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ৫, ১১)।

যদি এই সূত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর যে, তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়টি হাত ছিল, তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই—তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটি হাত ছিল? বলিবে, মানুষমাত্রেরই দুই হাত, এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য।

এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে না।

তৃতীয় প্রমাণ—শব্দ। আপ্তবাক্য শব্দ। বেদেই আপ্তোপদেশ। সাংখ্যকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে, সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বর-

কৃত নহে (শ্রুতিরপি প্রধান-কার্য্যত্বস্য। ৪, ১২) ; কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন, তিনি দেখিবেন, এ অতি সঙ্গত কথা। এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে, বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা (মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। ১, ৯৫)।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল।

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন—বদ্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১, ৯৩); উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ (১, ৯৪)।

সৃষ্টিকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই। পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন যে, যদি ঈশ্বর কর্ম্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন, পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারে? যদি সুবিচার করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না? ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বারানুমানের প্রয়োজন কি?

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন।

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পরপরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাকি রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেকে বলেন, কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, ৫৭ সূত্রে সূত্রকার বলেন, "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" সে কি প্রকার ঈশ্বর? "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা," ৩, ৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই?

বাস্তবিক এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সত্ত্ববিশাল ঊর্দ্ধলোকেও মুক্তি নাই; কেন না, তথা হইতে পুনর্জ্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন যে, জগৎকারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই; কেন না, তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান আছে (৩, ৫৪)। সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি "সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা।" ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগৎস্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। "সর্ব্বকর্ত্তা" অর্থে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বসৃষ্টিকারক নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বেদ

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে অথচ ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি।

মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম্ম, এবং অবস্থা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু; অশক্য, অপ্রমেয়, যাহা বেদ হইতে ভিন্ন, তাহা পরকালে নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, শব্দ স্পর্শ রূপ গন্ধ, চতুর্ব্বর্ণ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ, সেই সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য। যে বেদজ্ঞ, সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ, জ্ঞানীদেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তর্গত সর্ব্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য, তাহাও বেদ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম্ম, প্রবর্ত্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র ঐ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময় ও ঋগ্‌যজুঃসামাত্মক বলা হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বেও আছে যে, বেদ শব্দ হইতে সর্ব্বভূতের রূপ নাম কর্ম্মাদির উৎপত্তি।

ঋক্‌সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, "বেদ হইতে অখিল জগতের নির্ম্মাণ হইয়াছে।"

এইরূপ সর্ব্বত্র বেদের মাহাত্ম্য। কোন দেশে কোন ধর্ম্মগ্রন্থের, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই ঈদৃশ মহিম কীর্ত্তিত হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্ব্বগামী বা উৎপত্তির মূল, তাহা কোথা হইতে আসিল? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই।—এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে, ইহা ঈশ্বরপ্রণীত, সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য! সকলেই বেদ মানেন, কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই। যথা—

(১) ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে, বেদপুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।

(২) অথর্ব্ববেদে আছে, স্তম্ভ হইতে ঋগ্ যজুষ্ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল।

(৩) অথর্ব্ববেদে অন্যত্র আছে যে, ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।

(৪) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।

(৫) ঐ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত।

(৬) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে, অগ্নি হইতে ঋচ্, বায়ু হইতে যজুষ্, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদের উৎপত্তি ; ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐরূপ আছে। এবং মনুতেও তদ্রূপ আছে।

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে, বেদ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে, প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি।

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে, বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মার) নিশ্বাস।

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিন বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদাদি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১২) শতপথ ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে যে, মনঃসমুদ্র হইতে বাক্‌রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন।

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু।

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্‌দেবী বেদমাতা।

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ভাগবত পুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐরূপ।

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে ঋচ্ ও যজুষ্, জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূর্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।

(১৭) মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে আছে যে, সরস্বতী এবং বেদ, বিষ্ণু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

(১৮) অথর্ব্ববেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদে আছে যে, আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ব্ববেদের ঐরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ এবং আরণ্যকে এবং স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসে বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে, এ সকলে বেদের সৃষ্টত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে—কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী। তাঁহাদিগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে ঋগ্বেদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন।

(২০) সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও বেদার্থপ্রকাশ নামে তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন যে, কাল আকাশাদি যেমন নিত্য, সেইরূপ বেদ। ব্যবহারকালে কালিদাসাদিবাক্যবৎ পুরুষ বিরচিত নহে বলিয়া নিত্য। এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২১) মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী।

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয়।—মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়।

গোতমসূত্রের ভাবে বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা তাঁহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুঝা যায় না।

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্যের এই মত।

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় ; কেহ বলেন, বেদ সৃষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য-প্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না ; কেন না, বেদেই তাহার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে—যথা "স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানা ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।" যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না ; যিনি বদ্ধ, তিনি অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে ? সাংখ্যকার বলেন, হইতে পারে, যথা—অঙ্কুরাদি (৫, ৮৪)। যাঁহারা হিন্দু-দর্শনশাস্ত্রের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহাদিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্রা, ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতাপ্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল, তবে আবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, "দেখ, তোমরা যদি বেদকে সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, ইহা মনুষ্যকৃত ; কেন না, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।" যদি এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন ? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে বোধ হয়, এতবড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। এক দল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম বেদমূলক, তোমরা এ সনাতন ধর্ম্মে ভক্তিহীন কেন ? তোমরা বেদ মান না

কেন ? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন ? সমুদায় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত। এই দুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্ম্মে থাকা উচিত ? না সকলেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত ? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব ? না মানিব না ? যদি মানি, তবে কেন মানিব ?

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিযা ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা বেদ মানিবে কেন ? বেদ মানিও না।" এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদভক্ত, দার্শনিকমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিযাছিলেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল, যাঁহার যেমন ধারণা, তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এই প্রশ্নেব উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাইতেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজী শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীযতার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি নব্যেবাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবাব জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে, এ প্রশ্ন বৌদ্ধেবা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে।

বেদ মানিব কেন ? এই প্রশ্নের বিচারসমবে মহাবথী মীমাংসক জৈমিনি। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক গৌতম। নৈয়ায়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়াযিকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন, বেদ আপ্তবাক্য মাত্র। নৈয়ায়িকেরা মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য প্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।

মীমাংসকেরা বলেন যে, সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্ত্তা অস্মর্য্যমান। সকল কথা লোকপরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে, কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই, ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে, প্রলয়পূর্ব্বে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, বেদকর্ত্তা কাহা কর্ত্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে, বেদবাক্যসকল, যেমন কালিদাসাদিবাক্য, তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষের বাক্য। বাক্যত্বহেতু, মন্ত্রাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহার গুরু ; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন যে, মহাভারতাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল যে, মহাভারতের

কর্ত্তা যে ব্যাস, ইহা স্মর্য্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, "ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত।" ইতি পুরুষসূক্তে বেদকর্ত্তাও নির্দ্দিষ্ট আছেন। আর মীমাংসকেরা বলেন যে, শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে; কেন না, শব্দসামান্যত্ববশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন যে, গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে, ইহা গকার, অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে, সে প্রত্যভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ববশতঃ, যেমন ছিন্ন, তৎপরে পুনর্জ্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে, পরমেশ্বর অশরীরী, তাঁহার তাল্বাদি বর্ণোচ্চারণ-স্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে, পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে।

মীমাংসকেরা এ সকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিবে কেন? এই তর্কের তিনটি মাত্র উত্তর প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়—

প্রথম। বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে যে, ইহা অপৌরুষেয় নহে। যথা "ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত, এই জন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্ভূত, কিন্তু যেখানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না, তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এবিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া যে স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয়। বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামান্য সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশে এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে, আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের অগৌরব হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ব্বাচনাত্মক তত্ত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে, তাহাও আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

১। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্ভে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ২। ৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা

যমিমাং পুষ্পিতাং বাচম্প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।
ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥

৩। ভাগবতপুরাণে নারদ বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে বেদ ত্যাগ করে। ৪। ২৯, ৪২।

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্॥
যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

৪। কঠোপনিষদে আছে যে, বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না—যথা

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পূর্ব্বগামী পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।*

ভারত-কলঙ্ক

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল, এইজন্য। "Effeminate Hindoos" ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে—মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে

* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেবকৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে।

তাহা ন্যূন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে—দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।

আমরা স্বীকার করি যে, এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন "পুরাণ" বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে, তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

ভাগ্যক্রমে ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা সেকন্দর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবন-লেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়, মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্ম্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণ-নৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত দুইটি কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও শিরিয় দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা

হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্‌ষ্টোন বলেন যে, হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য,—যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্ম-ধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতি-পদানত ?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের সংস্রবে আসিয়াছে তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুল-রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বরজাতি কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচ শত ঊনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দিন ঘোরী কর্তৃক উত্তরভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য-জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর-ভারতরাজ্য অপহরণ করে, তাহারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরব্য বা তুরকীবংশীয়দিগের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।*

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরা কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,—রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণনকালে তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্তৃক যেরূপ গ্রীকসৈন্যহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি ভারতবর্ষের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লিক, শক, হুন, আরব্য, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধুপারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই;—আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়,—গ্রীকলিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেন না, সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায় "ভাল মানুষ" শব্দের অর্থ—ভীরুস্বভাবের লোক, অকর্ম্মা। "হরি নিতান্ত ভাল মানুষ।" অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ।

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কস্মিন্ কালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবাই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ—হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকালিক ইটালীয়, এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগকে কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায়, আধুনিক ভারতবর্ষীদিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীন-দিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এতকাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয়, স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়সঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধমাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশবাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদিগের বিবেচনা "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি?" স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান।

স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে, পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।*

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেকগুলিন স্পৃহনীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহনীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম ধনসঞ্চয়ে একব্রত হইয়া কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত, কি যদু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে, উভয়মধ্যে কাহারও কার্য্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে, হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতা লাভে অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব, এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার

* আমরা এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভক্ত জাতি ছিল না। মীবার-রাজপুত-দিগের অপূর্ব্ব কাহিনী যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যোন্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ফলও চমৎকার। মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুসম্বন্ধে যথার্থ।

রাজ্য সম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা!

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জ্ঞেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাস্থা। বাহ্য সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতি বিমুখ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত, শত্রু বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে "আমাদের দেশে ভিন্নজাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টিপ্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না, আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত বা অন্য কারণে রাজ্য রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসীক, শক বা বাহ্লিক, কোন প্রদেশখণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাহাকে পূর্ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্য্যের সঙ্গে আর্য্য-

জাতীয়, আর্য্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্নজাতীয়;—মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ;—সকলের সঙ্গে সকলের বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ,—হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য আর এইরূপ অকর্ত্তব্য, তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গলসাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতি-সাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গলমাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে

বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন্ কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্যজাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিক কালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবতী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদিমধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যেরূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লিক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি মক্ষিকা-সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম ; আর এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে ? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোর্ম্মির উপর সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ব্বতপার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষবাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্রী একত্র কর্ম্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায় ? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে ?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে ? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত, জাঠ, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্নবংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি ; বাঙ্গালি বেহারী একবংশীয় হইলে, ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি ; মৈথিলি কনোজী এক ভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক ; যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক

বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতিপ্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয় কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দুরাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাসকীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপি মার্হাট্টা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রুপারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল। ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসীর হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠাতার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে, যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা।* ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা

মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না যে, তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের

* এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।

মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে, সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে, দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল—এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে, সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে, দুঃখই বা কি, সুখ কি।

কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন, আধুনিক ভারত পরাধীন, এ কথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটি মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক যে, প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী?

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতাই যে সুখ, তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে, সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার।

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন—"Liberty" "Independence", তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে, দুইটি শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই ইহা বুঝায়, এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্ন-দেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে বা সেরাজদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জর্ম্মান। তৃতীয় উইলিয়াম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনোপার্টি কর্সিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্বো-বংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোমসাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্ব্বরজাতীয় সম্রাট্ আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে, এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, বলা যাইতে পারে। যদি প্রথম জর্জ-শাসিত ইংলণ্ডকে বা ত্রেজান-শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহাজাঁহা-শাসিত ভারতবর্ষকে বা আলীবর্দ্দি-শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে যে, শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্ত্তৃগণ স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি?

ইহা নিশ্চিত যে, ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকজিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসকল পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়ার্স বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক্ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না—ভারতবর্ষের রাজা ভারতবর্ষে নাই। অন্য দেশে। যে দেশের রাজা অন্যদেশের সিংহাসনারূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটি স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পরিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্, স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজা দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ, ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন; —হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথম জেমস্ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পূর্ব্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা Independence শব্দের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা, এবং Liberty শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাবসূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতায় প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতায় প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব।

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতিপীড়নশূন্য, তাহা স্বাধীন।

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা, প্রথম জর্জের

সময়ে হানোবর, মোগলদিগের সময়ে কাবুল। পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে; যথা, নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ঔরঙ্গেবের সময়ে ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধুনিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য-পারতন্ত্র্যজন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক—পশ্চাৎ স্বাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্যদেশবাসী হইলে দুইটি অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা; প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন, সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটি দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট হইত, তাহার সন্দেহ নাই; কেন না, যাহা রাজার নিকটবর্ত্তী, তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটিও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। "হোমচার্জেস" বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই এইরূপ ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র,—অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে, তাহার ফল ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান করিলেন, তাহাতে উভয় মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, উভয়ের অপ্রীতি ও তেজোহানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্মসুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজাসকল তাঁহাদিগের নিকট অবনত, তাঁহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসীদিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে, তাহা এ দেশীয় কোন লোকই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণপীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশে শাসনকর্ত্তা। কিন্তু এ সকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে, প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; রাজব্যবস্থা নির্ব্বাচন, বিচার ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি, এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কর্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরি। এখনও যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা নাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাদিগের উপরও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বদা রাজা ছিলেন, এমত নহে। বোধ হয়, আদ্যকালে ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রভৃতি সঙ্কর-জাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই—কেন না, তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃতরূপে রাজপুরুষপদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল মাগাজিনে একটি প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকারে ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে যে, রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজ-শাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটি দোষ কি প্রকার বর্ত্তমান ছিল দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপরাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতি অপরাধীর জন্য অন্য বিচারালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! ইংরেজের জন্য পৃথক্ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্ নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ দেশী লোককে বধ করিলে আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট?

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র

প্রধানতম বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—"রামরাজ্যে" তিনি কোথা থাকিতেন ?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণরাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শূদ্র, কখন কখন রাজসিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচারকার্য্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,—প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচারকার্য্য শূদ্রের দ্বারা হইত ? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে, এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার-কার্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদসকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে; কেন না, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এইমাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন এক দিকে ক্ষতি, তেমন আর এক দিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে, আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্নজাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্নজাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

বিদেশনিবাসী রাজশাসিত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী, তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী, তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী, তাহাই বিবেচ্য।

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে, তত্তৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্রদোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল।

৬। আধুনিক ভারতে কার্য্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি যে, আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণ প্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি

নারদবাক্য

মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই ; এক একটি শাসনকর্ত্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জণ্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, মহতী কীর্ত্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত যবনরাজাধিরাজ সিলিউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না।) ইতিহাসে তিন জন সাম্রাজ্য-নির্ম্মাতা বিশেষ পরিচিত—শার্লমান, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটর। আলেক্জণ্ডর, নাপোলিয়ন বা ক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই ; কেন না, তাঁহাদের কীর্ত্তি তাঁহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী বা তাহাও নহে। গজ্‌নবী মহম্মদের প্রায় সেইরূপ। আরবসাম্রজ্য ও মোগলসাম্রজ্য এক এক জনের নির্ম্মিত নহে। কিন্তু মগধসাম্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নির্ম্মিত। এবং পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডেরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন।

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে যে, রাজনীতিবিশারদ ইংরেজেরও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে, হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিক তত্ত্ব যে তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভুত হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এ জন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। ঐ কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন, তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না।

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মহারাজ! কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? . . . নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্য-

দিগের গূঢ় মন্ত্রণাসকল ভেদ করিত পারে না ? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন ? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন ? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন ? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন ?”

সর জর্জ কাম্বেল সাহেব “আত্মানুরূপ” ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে, নারদবাক্য আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দূরদৃষ্ট এই যে, বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে—বিস্মার্ক, গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি, টিয়র প্রভৃতি উদাহরণ। পরে,—

“একাকী বা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না ? মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচলিত থাকে ?”

ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন যে, “মন্ত্রণাবিশেষ জনপদমধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেইগুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে ছাপাই।” পরে—

“স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন ?”

আমাদিগের অনুরোধ যে, প্রাচীন ঋষির এই বাক্য ইংরেজেরা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্য্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে,—

“কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে ? কারণ, প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।”

বিলাতী শাসনকর্ত্তা কিম্বা তাঁহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে—

“অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন ?”

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্‌প্রকারে অনুবর্ত্তী। সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ইংরেজেরা এক একটা কমিটি নিযুক্ত করেন কেন ? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে আছে। তৎপরে—

“সহস্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ?”

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে—পণ্ডিত কোন্ কাজে লাগে ? মিল পার্লিয়ামেণ্টে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—ওয়েষ্টমিনষ্টর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু লাপ্লাস কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভার্য্যার বিনিময়ে দুগ্ধবতী গো লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত, পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নারদ বলিয়াছেন বটে যে, “কোন প্রকার

বিপদ্ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।" এ কথা সত্য বটে, অতএব বিপদ্‌কালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ ;— দুঃখের দিনে পণ্ডিত।

পরে নারদ বলিতেছেন, "দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদকযন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন ? তথায় শিল্পীগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষসকল ত সর্ব্বদা সতর্কতাপূর্ব্বক কালযাপন করে ?"

মিউটিনির পূর্ব্বে ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন, তবে তাদৃশ বিপদ্ ঘটিত না। সর হেনরি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন বলিয়া লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সির রক্ষা হইয়াছিল।

"প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না ?"

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

"নির্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না ? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।"

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস করে নাই।

"সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে ? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে ?"

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টুয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ও ক্যানিং ভারতীয় রাজগণকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন।

পরে নারদ পেনশুন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন,

"মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন ?"

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে—

"শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ?"

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। "অবিলম্বে" কাহাকে বলে, প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাঁহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন "অবিলম্বে" প্রুসীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের মত "মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য" ত্রিবিধ বলের সম্যক্ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নারদবাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন।

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে,—

"যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন ?"

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করুন।

নিম্নলিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য ;—

"সৈন্যদিগের ব্যবসায়ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া, তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যাত্রা করিয়া থাকেন ?"

নিম্নলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন,—

"পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন ?"

নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যস লয়লার যোগ্য—

"স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রপ্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন ?"

পরে,—

"বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণকালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন ?"

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল একজন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে সব হারাইয়াছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য্য, সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া তাঁহার কৃত রণজয়সকল বিফল করিয়াছিলেন।

"এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন ?"

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটি বাক্যে সমুদায় রাজকার্য্য নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে—

"আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?"

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা—

"আয়ব্যয়নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয়সকল পূর্ব্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছে ?"

আমরা জানিতাম, এটি ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সৃষ্টি ; কিন্তু তাহা নহে।

পরে—

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে ?"

এই কথা নারদ যেমন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি।

অনেকের বোধ আছে, "ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেণ্ট"টি ভারতবর্ষে একটি নূতন কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন—

"রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাত হইয়াছে ? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ?"

এ কথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ ঘটিত না।

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়।

"কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ দান করিয়া থাকেন?"

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায় না—অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ—বীজাভাবে ভরসাশূন্য। যে পায়, সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে অর্থশাস্ত্র অনবগত, সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে—রাজার ব্যবসায়, সমাজের অনিষ্টকারক। অর্থশাস্ত্রঘটিত যে আপত্তি, তাহা আমরা অবগত আছি এবং মহাভারতকারও অবগত ছিলেন। এই জনাই নারদের ঐ বাক্যমধ্যেই তিনটি গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম—"আবশ্যক হইলে" ঋণ দিতে বলিতেছেন—ইহার অর্থ যে, যাহাকে না দিলে চলে না, তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট ঋণ পাইতে পারিবে, তাহাকে ঋণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ "অনুগ্রহস্বরূপ" দিবেন—অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাঙ্ক্ষায় দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ নিয়ম না করিলে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও ঋণ লইবার সম্ভাবনা—বঞ্চক জাতি সর্ব্বত্রই আছে। আর ঋণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে, তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজকোষ হইতে ঋণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ "শতসংখ্যক" ঋণ দিবে—ইহার ঊর্দ্ধ দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জীবননির্ব্বাহার্থে যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা ঋণস্বরূপ দিতে পারেন। ততোধিক ঋণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটি নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন।

নিম্নোদ্ধৃত নীতি, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইতেছে;—

"হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া, কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন?"

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না—তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না, বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বভাব এই। আর রাজদর্শন প্রজাগণের দুর্লভ হইলে, তাহাদিগের সকলপ্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না।

হিন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বৎসরে একটা দরবার বা "লেবী" হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত।

পরে,—

"দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপ্রকাশপূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না?"

তাহা হইলে দুর্ব্বল শত্রুও বলবান্ হইয়া উঠে। এই দোষে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ "নিম্নদেশ" অর্থাৎ হলাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড যে আমেরিকা উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এইরূপ।

তৎপরে,

"দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত্রসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকে না ?"

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও এ কথা জিজ্ঞাসা করি।

নারদ যে চতুর্দ্দশ রাজদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও শ্রবণযোগ্য,—যথা,

"নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ।"

আর একটি বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—

"অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন ?"

এই প্রকার সারবান্ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে।

প্রাচীনা এবং নবীনা

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। "এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর," ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজিকালি হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটি ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময় ; উদাহরণ—মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালি লেখকের পাল। আবার দিনকত ধুম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর ; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওকবৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, সেগুলি চলিত হইল না ; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালি স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য ; পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং

ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালি যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালি যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি ভাল, না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখক-দিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালে শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস্ স্ত্রীগণ ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট—

—Gospel light first dawned
From Bullen's eyes—

ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদিগের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ত্ব কীর্ত্তন কালে এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে, এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম, কিন্তু এ কথাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে পুরুষই মনুষ্য-জাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভবিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; কেন না, স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্য ভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে।—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজবিধাতৃ—

দিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি ; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি, পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতি-শাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান ; একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, একস্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেইই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য ; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয় ; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল ; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত, পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা, স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী, তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না, তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি ; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ, স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব ; সহমরণ বিধি, বহুকালপ্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী ; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজিকালি পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক বা ইংরাজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দুরকৌটা মনে পড়িবে ; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসাপেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে ; হাতে পৈছা, কঙ্কণ, এবং শঙ্খ (যাহার জুটিল, তাহার বাউটি নামে সোনার শঙ্খ)—মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জ্জনী বা রন্ধনের বেড়ি ; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দূরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি ; এবং মস্তকের

ঠিক মধ্যভাগে, পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে, খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবম্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না; কেন না, তাঁহারা "পোড়ারমুখো" "ডেকরা" ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং "আবাগী" "শতেক খুয়ারী" প্রভৃতির শব্দ আধুনিক "সখী" "ভগিনী" স্থানে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন-প্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দূর মিশি মল মাদুলি, কিছুই নাই; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধনসকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসাপেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তি-পুরে ডুরে, রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ-বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতা বেড়ি ঝাঁটা কলসীর পরিবর্ত্তে, সূচ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে, কবরী মূর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দ্দমরঙ্গিণীগণ সাবান সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন, কলকণ্ঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেকরা সর্ব্বনেশে নহে; তত্তৎস্থানে সম্বোধন-পদসকল দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বেআদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এক অপূর্ব্ব লাবণ্য-বিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনা-দিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। রুগ্ন শয্যাশায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশু—

গণের প্রতি অযত্ন হয়, সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাঁহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবায় দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতিপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকালমৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকালপর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন যে, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না; ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি ঘৃণিতরূপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন।

গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্দ্ধেক দাস-দাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহু ব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না।

পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্মিক বলিতেছি না,—বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, সেইগুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে ,তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দাভয়ে, তত ধর্ম্মভয়ে নহে।

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজি সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোক-দিগেরও বাড়িয়াছে, এজন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে; দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশালী নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্টকরণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্ মনে করেন।

ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখাপড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল, ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে

লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়, প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়, অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে, ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়, এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে, তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, ততদূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন, এজন্য ধর্ম্মাংশে তাঁহারা প্রাচীনাদিগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?*

তিন রকম

নং ১

বঙ্গদর্শনে "নবীনা এবং প্রাচীনা" কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা, তাহা লিখি। জানেন না যে, সম্মার্জ্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন্ দিকে ভারি হইবে?

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি।

* "নবীনা ও প্রাচীনা।" এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিনখানিতে লিখিত হইয়াছিল।

প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন ; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন ; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন পিতা-মাতাকে ; নবীনের ভক্তি করা পত্নী বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন ; তোমাদের দেবতা টেস ফিরিঙ্গি, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোণার বেনে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে তোমরা অনেকেই ধান্যেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে ব্রাণ্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ সম্বন্ধীর উপর বর্ত্তিয়াছে, অপত্যস্নেহ ঘোড়া কুক্কুরের উপর বর্ত্তিয়াছে ; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্ত্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি ? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ্ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস ; তোমরা শুধু অলস নও—তোমরা বাবু ! তবে ইংরেজ বাহাদুর নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই, বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের ? তোমাদের ধর্ম্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শুঁড়ি, আর একদিকে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে ; তোমরা ধর্ম্মদড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিতেছ—গরিব "নবীনা" খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্ম্মের ভয় কি ? তোমরা কি মান ? ঠাকুর দেবতা ? যিশুখ্রীষ্ট ? ধর্ম্ম মান ? পাপ পুণ্য মান ? কিছু না—কেবল আমাদের এই আলতাপরা মলবেড়া শ্রীচরণ মান ; সেও নাথির জ্বালায়।

শ্রীচণ্ডিকাসুন্দরী দেবী।

নং ২

সম্পাদক মহাশয় ! আপনাদের শ্রীচরণে এ কিঙ্করীকুল কোন্ দোষে দোষী ? আমরা কি জানি ?—আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে "নবীনার" প্রতি এত কটূক্তি কেন ?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি, তাতে বাঙ্গালির মেয়ে, জাতিতে কাঠমল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি—দোষ না থাকিবে কেন ? তবে কতকগুলি দোষ আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে ?

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী—তাহার কারণ, আমরা স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা এত স্থান গ্রহণ করিয়াছেন যে, অন্য ধর্ম্মের আর স্থান নাই।

আর—শেষ কথা, আমরা কি ধর্ম্মভীতা নহি? ছি! ধর্ম্মভীতা বলিয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধর্ম্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধর্ম্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি—অন্য ধর্ম্ম জানি না। লেখাপড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন্ ধর্ম্মে বাঁধিবেন? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া এই পাতিব্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি বাধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমাদের কোন ধর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন?

লেখাপড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখাপড়ায় কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্ম্মশিক্ষা, লেখাপড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসর্জন শিখিয়াছি, লেখাপড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখাপড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখাপড়া শিখিব কখন?

ছি! দাসীদিগের নিন্দা।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

নং ৩

ভাল, কোন্ রসিকচূড়ামণি "নবীনা এবং প্রবীণা" লিখিলেন?

লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য—একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে,—কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজরি তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে, তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না, জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশূন্য বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে।—কপালখানা! আবার বলেন কি না, কাজ করে না!

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;—দিব কি, তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদর—এর একটি আধমণি বস্তা—আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত!

ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিবেন ? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি ? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখাপড়া শিখিয়া,—ধর্ম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি। আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগেব সঙ্গে অবস্থার বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন ; আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে আমরা "দ্বিতীয় সংসার" করিব—জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিবেন,—বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমট টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচাব করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন, সুখের সীমা থাকিবে না।—আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব—বয়সকালে ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—সেমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিব—সাধের ধর্ম্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে ? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব—মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষৎ বসের দোলনে দোলাইয়া, এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব—তখন ? তখন কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে ?

বড়াই ছাড়িয়া তাই কর ; তোমরা অন্তঃপুরে এস—আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাত শত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ ! বলিতে লজ্জা করে না ?

শ্রীবসময়ী দাসী।

দ্বিতীয় খণ্ড

ধর্ম্ম এবং সাহিত্য*

আমি প্রচারের একজন লেখক। তাহা জানিয়া প্রচারেব একজন পাঠক আমাকে বলিলেন, "প্রচারে অত ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভাল লাগে না। দুই একটা আমোদের কথা না থাকিলে পড়িতে পারা যায় না।"

আমি বলিলাম, "কেন, উপন্যাসেও কি তোমার আমোদ নাই? প্রতি সংখ্যায় একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া থাকে।"

তিনি বলিলেন, "ঐ একটু বৈ ত নয়।"

তিন ফর্ম্মা প্রচার, তাহার কখন এক ফর্ম্মা উপন্যাস, কখন বেশী, কখন কম। তাহাও অপ্রচুর! তারপর তিন ফর্ম্মার যেটুকু থাকে, তাহারও কিয়দংশ কবিতা ইত্যাদিতে কতকটা ভরিয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক কোণে এক আধটা পড়িয়া থাকে। তথাপি এই পাঠকের তাহা ভাল লাগে না। বোধ হয়, আরও অনেক পাঠক আছেন যাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ তিক্ত লাগে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা, ধর্ম্ম কেন তিক্ত লাগে, উপন্যাস রঙ্গরস কেন ভাল লাগে?

আমাদিগের ইচ্ছা, পাঠক আপনি একটু চিন্তা করিয়া ইহার উত্তর স্থির করেন। আপনা আপনি উত্তর স্থিব করিলে তাঁহাদিগের যত উপকার হইবে, কেহ কোন প্রকার শিক্ষা দিয়া সেরূপ উপকার করিতে পারিবে না। তবে আমরা তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারি।

সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষকের দ্বারা ধর্ম্ম যে মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অপ্রীতিকর বটে। এদেশের আধুনিক ধর্ম্মের আচার্য্যেরা যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাত ও রক্ষিত করেন, তাহার মূর্ত্তি ভয়ানক। উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য, আত্মপীড়ন, ইহাই অধ্যাপক ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম। গ্রীষ্মকালে অতিশয় উত্তপ্ত ও তৃষাপীড়িত হইয়া যদি এক পাত্র বরফজল খাইলাম, তবে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হইল! জ্বরবিকারের রুগ্ন শয্যায় কষ্টে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, ডাক্তার আমার প্রাণ-রক্ষার্থে যদি ঔষধের সঙ্গে আমায় পাঁচ ফোঁটা ব্রাণ্ডী খাওয়াইলেন, তবেই আমার ধর্ম্ম গেল!† আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্য্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্য্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম্ম থাকে না। ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্ম্মা, স্বার্থপর, লোভী, কুকর্ম্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জ্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি নহে—একটা

---

* প্রচার, ১২৯২, পৌষ।

† অনেক হিন্দু এই জন্য ডাক্তারি ঔষধ খান না।

পৈশাচিক কল্পনা। অথচ আমরা বাল্যকাল হইতে ইহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। পাঠক যে ইহাকে পিশাচ বা রাক্ষসের ন্যায় ভয় করিবেন, এবং নাম শুনিবামাত্র পরিত্যাগ করিবেন, ইহা সঙ্গত বটে।

যাঁহারা "শিক্ষিত" অর্থাৎ যাঁহারা ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাঁহারা এটাকে ধর্ম্ম বলিয়া মানেন না, কিন্তু তাঁহারা আর এক বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা ইংরেজির সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মটাও শিখিয়াছেন। সে জন্য বাইবেল পড়িতে হয় না, বিলাতী সাহিত্য সেই ধর্ম্মে পরিপ্লুত। আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করি না করি, ধর্ম্ম নাম হইলে সেই ধর্ম্মই মনে করি। কিন্তু সে আর এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিবিশেষ। পরমেশ্বরের নাম হইলে সেই খ্রীষ্টানের পরমেশ্বরকে মনে পড়ে। সে পরমেশ্বর এই পবিত্র নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বিশ্বসংসারের রাজা বটে, কিন্তু এমন প্রজাপীড়ক অত্যাচারী বিচারশূন্য রাজা কোন নরপিশাচেও হইতে পারে না। তিনি ক্ষণকৃত অতি ক্ষুদ্র অপরাধে মনুষ্যকে অনন্ত-কালস্থায়ী দণ্ডের বিধান করেন। ছোট বড় সকল পাপেই অনন্ত নরক। নিষ্পাপেরও অনন্ত নরক—যদি সে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করে। যে কখন খ্রীষ্ট নাম শুনে নাই, সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা যাহার সাধ্য নহে, তাহারও সেই অপরাধে অনন্ত নরক। যে হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছে, তার সেই হিন্দুজন্ম তাহার দোষ নহে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাকে যেখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সেইখানেই সে আসিয়াছে, যদি দোষ থাকে, তবে সে পরমেশ্বরের দোষ, তথাপি সে দোষে গরিবের অনন্ত নরক। যে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে জন্মিয়াছে বলিয়াই খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহার সে ঈশ্বরকৃত জন্মদোষে তাহারও অনন্ত নরক। এই অত্যাচারকারী বিশ্বেশ্বরের একটি কাজ এই যে, ইনি রাত্রিদিন প্রজাবর্গের মনের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, কে কি পাপসঙ্কল্প করিল। যাহার একটুকু ব্যতিক্রম দেখিলেন, তাহার অদৃষ্টে তখনই অনন্ত নরক বিধান করিলেন। যাহারা এই ধর্ম্মের আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়াছে, তাহারা চিরদিন সেই মহাবিষাদের ভয়ে জড়সড় ও জীবন্মৃত হইয়া দিন কাটায়। পৃথিবীর কোন সুখই তাহাদের কাছে আর সুখ নহে। যাঁহারা এই পৈশাচিক ধর্ম্মটাকে ধর্ম্ম বলিতে শিখিয়াছেন, ধর্ম্মের নামে যে তাঁহাদের গায়ে জ্বর আসিবে, ইহা সঙ্গত।

সাধারণ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এই সকল দোষেই ধর্ম্মালোচনার প্রতি সাধারণ লোকের এত অননুরাগ জন্মিয়াছে। নহিলে ধর্ম্মের সহজ মূর্ত্তি যেরূপ মনোহারিণী, সকল ত্যাগ করিয়া সাধারণ লোকের ধর্ম্মালোচনাতেই অধিক অনুরাগ সম্ভব। আমারও বিশ্বাস যে, জগতে তাহাই হইয়া থাকে; কেবল এখনকার বিকৃতরুচি পাঠকদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যেগুলি ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দু খ্রীষ্টীয়ানদের দোষে তাঁহাদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে, সেগুলি ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। ধর্ম্মের মূর্ত্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে,—আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্ত্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন্ বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে?

যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন, তিনি এক বার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন ? যদি সেই সকলে যে বিস্ময়কর ঘটনা আছে, তাহাতেই তাঁহার চিত্তবিনোদন হয়, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বসৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন্ সাহিত্যে কথিত হইয়াছে ? একটি তৃণে বা একটি মাছির পাখায় যত আশ্চর্য্য কৌশল আছে, কোন্ উপন্যাস-লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে ? আর ইহার অপেক্ষা যাঁহারা উচ্চদরের পাঠক, যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর ? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্ম্মের মোহিনী মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়।

পাঠক বলিবেন, "এ কথা সত্য হইতে পারে না ; কেন না, নাটক নবেল পড়িতে ইচ্ছা হয়, পড়িয়াও আনন্দ পাই। কই, ধর্ম্মপ্রবন্ধ পড়িতে ত ইচ্ছা হয় না, পড়িয়াও কোন আনন্দ পাই না।" ইহার উত্তর বড় সহজ। তুমি সাহিত্য পাঠে অনুরক্ত এবং তাহাতে আনন্দ লাভ কর, তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি চিরকাল সেই সকল বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়াছ, কাজেই তাহাতে আনন্দ লাভ কর। যে সকল বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তুমি সেগুলির অনুশীলন কর নাই, এজন্য তাহার আলোচনায় তুমি আনন্দ লাভ কর না। কিন্তু এখন সেগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কেন না, তাহাতেই সুখ। সাহিত্যের আলোচনায় সুখ আছে বটে, কিন্তু যে সুখ তোমার উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্য হওয়া উচিত, সাহিত্যের সুখ তাহার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।

কিন্তু ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, গোড়ায় কিছু দুঃখ কষ্ট না করিয়া কোন সুখই লাভ করা যায় না। বিলাসী ও পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্ম্মালোচনার যে অসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, তাহার উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় যে ধর্ম্মমন্দিরের নিম্ন সোপানে যে সকল কঠিন ও কর্কশ তত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত কর। অতএব আপাততঃ ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ কর্কশ বোধ হইলেও তাহার প্রতি অনাদর করা অনুচিত।

চিত্তশুদ্ধি*

হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী অথবা হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মের অনুসন্ধানের ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই তত্ত্বের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করি। হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত আর কোন তত্ত্বই ইহার ন্যায় মর্ম্মগত নহে। সাকারের উপাসনা বা নিরাকারের উপাসনা, একেশ্বরবাদ বা বহুদেবে ভক্তি, দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ বা ভক্তিবাদ, সকলই ইহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। চিত্তশুদ্ধি থাকিলে সকল মতই শুদ্ধ, চিত্তশুদ্ধির অভাবে সকল মতই অশুদ্ধ। যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্ম্মই নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্ম্মেই প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সার, খ্রীষ্টধর্ম্মের সার, বৌদ্ধধর্ম্মের সার, ইসলামধর্ম্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎধর্ম্মেরও সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টীয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটিভিষ্ট্। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্ম। তবে প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম্মেই ইহা প্রবল। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তিনি হিন্দু নহেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত বিধি-বিধানানুসারে কার্য্য করিলেও তিনি হিন্দু নহেন।

এই চিত্তশুদ্ধি কি, তাহা দুই একটা লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতেছি। চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। "ইন্দ্রিয় সংযম" ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। উদাহরণ, ঔদরিকতা একজাতীয় ইন্দ্রিয়পরতা, কিন্তু এ ইন্দ্রিয়ের সংযমবিধিতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, পেটে কখন খাইবে না বা কেবল বায়ু ভক্ষণ করিবে বা কদর্য্য আহার করিয়া থাকিবে। শরীররক্ষার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে পরিমাণে এবং যে প্রকার আহারের প্রয়োজন, তাহা অবশ্য করিতে হইবে, তাহাতে ইন্দ্রিয়সংযমের কোন বিঘ্ন হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম তত কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সংযতেন্দ্রিয়ের পক্ষে উত্তম আহারাদিও অবিধেয় নহে, যদি তাহাতে স্পৃহা না থাকে।† স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ে আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়সংযম। আত্মরক্ষার্থে বা ধর্ম্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই; যে না করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্ম্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।

এমন অনেক লোক দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের

* প্রচার, ১২৯২, ফাল্গুন।

† রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ গীতা। ২য় অ। ৬৪।

অর্থ। রাগ দ্বেষ হইতে বিমুক্ত আত্মবশ্য যে ইন্দ্রিয়গণ, তদ্দ্বারা বিষয়সকল উপভোগ করিয়া বিধেয়াত্মা ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা লোকের নিকট প্রতিপত্তির জন্য কিম্বা ঐহিক উন্নতির জন্য অথবা ধর্ম্মের ভাণে পীড়িত হইয়া তাহারা সংযতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের দাহ বড় প্রবল। আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা কখনও স্খলিতপদ না হইলেও তাহারা ইন্দ্রিয়সংযম হইতে অনেক দূরে। যাঁহারা মুহুর্মুহুঃ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে উদ্যোগী ও কৃতকার্য্য, তাঁহাদিগের হইতে এই ধর্ম্মাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প। উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকের অগ্নিতে দগ্ধ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না—যখন রক্ষার্থ বা ধর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়াছে। তদভাবে যোগ তপস্যা কঠোর সকলই বৃথা। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য হিন্দু পুরাণেতিহাসে ঋষিদিগের সম্বন্ধে ভূরি ভূরি রহস্যোপ-ন্যাস আছে। স্বর্গ হইতে একজন অপ্সরা আসিল, আর অমনি ঋষি ঠাকুরের যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি অমনি নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত করণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল উপন্যাস হইতে আমরা এই একটি চমৎকার শিক্ষা প্রাপ্ত হই যে, যোগে বা তপস্যায় ইন্দ্রিয়সংযম পাওয়া যায় না। কার্য্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্ম্মেই ইন্দ্রিয়সংযম লাভ করা যায়। প্রত্যহ অরণ্যে বাস করিয়া, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপাদানসকল হইতে দূরে থাকিয়া, সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া, মনে করা যায় বটে যে, আমি ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়াছি, কিন্তু যে মৃৎপাত্র অগ্নি-সংস্কৃত হয় নাই, সে যেমন স্পর্শমাত্রে টিকে না, এই ইন্দ্রিয়সংযমও তেমনি লোভের স্পর্শমাত্রে টিকে না। যে প্রত্যহ ইন্দ্রিয়চরিতার্থের উপযোগী উপাদানসমূহের সংসর্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কখন জয়ী, কখন বিজিত হইয়াছে, সেই পরিশেষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিয়াছে। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের এই একটি অতি নিগূঢ় কথা কহিলাম।

কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধির তাহার অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ আছে। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্য কারণে তাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমারগুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাঁহাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ্ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, চিরকাল অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকনে। সে জন্য না করেন এমন কাজ নাই, তদ্ভিন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা নিকৃষ্ট। ইঁহাদের নিকট ধর্ম্ম কিছুই নহে, কর্ম্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর নাই, জগৎ থাকিলেও তাঁহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন, এই কথা বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন

আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন পরেতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে ডোরকৌপীন ধারণ করিয়া সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি, বিশ্বামিত্রকে একটি গাভীদান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যে রাজা, অঙ্কগত কপোতের বিনিময়ে আপনাব মাংস কাটিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল।

ইহা অপেক্ষাও চিত্তশুদ্ধির গুরুতর লক্ষণ আছে। যিনি সকল শুদ্ধির স্রষ্টা, যিনি শুদ্ধিময়, যাঁহার কৃপায় শুদ্ধি, যাঁহার চিন্তায় শুদ্ধি, যাঁহার অনুকম্পা ব্যতীত শুদ্ধি নাই, তাঁহাতে গাঢ় ভক্তি চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ইন্দ্রিয়সংযমই বল, আর পরার্থপরতাই বল, তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাবের চিন্তা এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত কখনই লব্ধ হইতে পারে না। এই ভক্তি চিত্তশুদ্ধির মূল এবং ধর্ম্মের মূল।

চিত্তশুদ্ধিব প্রথম লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য হৃদয়ে শান্তি। দ্বিতীয় লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য মনুষ্যে প্রীতি। তৃতীয় লক্ষণ, ঈশ্বরে ভক্তি। অতএব চিত্তশুদ্ধির স্থূল লক্ষণ ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা।

ভক্তি-প্রীতি-শান্তি-লক্ষণাক্রান্ত এই চিত্তশুদ্ধি হিন্দু শাস্ত্রকারেরা কিরূপে বুঝাইয়াছেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত ভগবদুক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১০ ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১১ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১২ ॥
নিষেবিতানিমিত্তেন সধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥ ১৩ ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৪ ॥

মদ্ধর্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্ ॥ ১৫ ॥
যথা বাতরথো ঘ্রাণমাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগবতং চেত আত্মানমবিকাবি যৎ ॥ ১৬ ॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিডম্বনম্ ॥ ১৭ ॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মান মীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
দ্বিষতঃ পবকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈবস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ১৮ ॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিযযোৎপন্নযানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চাযাং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ১৯ ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চযেত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্বর্বাস্থতম্ ॥ ২০ ॥
আত্মনশ্চ পবস্যাপি যঃ কবোত্যন্তবোদবং।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভযমুল্বণম্ ॥ ২১ ॥
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালযম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়।

ইহার অর্থ

"মা। নিগুর্ণ ভক্তিযোগ কিরূপ, তাহাও বলি, শ্রবণ করুন। আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্ব্বান্তর্যামী যে আমি, আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানবহিতা এবং ভেদদর্শনবর্জ্জিতা মনেব গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নিগুর্ণ ভক্তিযোগেব লক্ষণ। ১০। যে সকল ব্যক্তিব এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি, তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব), সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিবেকে কিছুই গ্রহণ কবিতে চাহেন না। ১১। মা। ঐ প্রকাব ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরমপুরুষার্থ আব নাই। মানবি। ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুসঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২। মা! ঐ প্রকার ভক্তির সাধন বলি, শ্রবণ করুন। ধনাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যনৈমিত্তিক স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিত্য শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিষ্কামে অনতিহিংস্র অর্থাৎ একবারে হিংসাদি বর্জ্জন না করিয়া পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত পূজাপ্রকরণ দ্বারা। ১৩। আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্পর্শন, পূজন, স্তবকরণ, বন্দন, সকল প্রাণীতে আমার ভাব চিন্তাকরণ, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, মহৎ ব্যক্তিদিগকে বহু সম্মানকরণ, দীনের প্রতি অনুকম্পা,

আত্মতুল্য ব্যক্তিতে মৈত্রতা, যম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নিয়ম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় দমন, আত্মবিষয়ক শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্ত্তন, সরলতাচরণ, সতের সঙ্গকরণ এবং নিরহঙ্কারিতা প্রদর্শন। ১৪। ঐ সকল গুণ দ্বারা ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ হয়, এবং সেই পুরুষ আমার গুণ শ্রবণমাত্রে বিনা প্রযত্নে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ১৫। ফলতঃ যেমন গন্ধ বায়ুযোগে স্বস্থান হইতে আসিয়া ঘ্রাণকে আশ্রয় করে, তাহার ন্যায় ভক্তিযোগযুক্ত অবিকারী চিত্ত বিনা প্রযত্নেই পরমাত্মাকে আত্মসাৎ করে। ১৬। এই প্রকার চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মদৃষ্টি দ্বারাই হয়, আমি সকল ভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সর্ব্বপ্রাণীতেই সতত অবস্থিত আছি, অথচ কোন কোন ব্যক্তি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। ১৭। পরন্তু আমি সর্ব্বপ্রাণীতে বর্ত্তমান ও সকলের আত্মা এবং ঈশ্বর; যে ব্যক্তি মূঢ়তাপ্রযুক্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার কেবল ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। সে পরদেহে আমাকে দ্বেষ করে এবং অভিমানী ভিন্নদর্শী ও সকল প্রাণীর সহিত বদ্ধবৈর হয়, সুতরাং তাহার মন শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ১৮। হে অনঘে! যে ব্যক্তি প্রাণিসমূহের নিন্দাকারী, সে যদি বিবিধ দ্রব্য ও বিবিধ দ্রব্যে উৎপন্নাদি ক্রিয়া দ্বারা আমার প্রতিমাতে আমার পূজা করে, তথাচ আমি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হই না। ১৯। মা! এমত বিবেচনা করিবেন না যে, প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করা বিফল। পুরুষ যে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিত যে আমি, আমাকে আপনার হৃদয়মধ্যে জানিতে না পারে, তাবৎ পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মে রত হইয়া প্রতিমাদিতে অর্চ্চনা করিবে। ২০। পরন্তু যে মূঢ় আপনার ও পরের মধ্যে অত্যল্পও ভেদ দর্শন করে অর্থাৎ যাহার আপনার দুঃখের তুল্য পরের দুঃখ অনুভব হয় না, আমি সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুস্বরূপ হইয়া ঘোরতর ভয় বিধান করি। ২১। অতএব পুরুষের কর্ত্তব্য যে, আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জানিয়া দান, মান ও সকলের সহিত মিত্রতা এবং সমদৃষ্টি দ্বারা সকলকে অর্চ্চনা করে। ২২।"*

চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি হিন্দুধর্ম্মের সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। হিন্দুদিগের স্মরণ থাকে যেন যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রতিমাদি পূজায় কোন ধর্ম্ম নাই। সে স্থলে প্রতিমাদির পূজা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল। ভক্তি ও প্রীতি কার্য্যকারিণী বৃত্তি। কিন্তু কেবল কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনে ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে না। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপ উপলব্ধ হয় না, এবং চিত্তশুদ্ধির সকল পথ পরিষ্কার হয় না। শারীরিক বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের উপযোগী ক্ষমতা জন্মে না এবং হৃদয়ও শান্তিলাভ করে না। অতএব চিত্তশুদ্ধি, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্যেরই ফল।

* শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ। অনুবাদে মূলাতিরিক্ত দুই একটা শব্দ আছে।

গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি

১। রামবল্লভবাবুর ভিক্ষাদান*

আমি বাবাজির চেলা, এবং ভিক্ষার ঝুলির বর্ত্তমান অধিকারী। বাবাজির গোলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি ভিক্ষা করিয়া নানা রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি ভিন্ন আর কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমাকে সেগুলি দিয়া গিয়াছেন। আমিও খয়রাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আগে নমুনা দেখাই।

একদা বাবাজির সঙ্গে রামবল্লভবাবুর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমরা "রাধে গোবিন্দ" বলিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলাম। রামবল্লভবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বাবাজি। একবার হরিনাম কর।"

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রামবল্লভবাবু হরিনামের কি ধার ধারেন। কিন্তু হরিপ্রেমে গদ্গদ বাবাজি তখনি একতারা বাজাইয়া আরম্ভ করিলেন, "তুমি কোথায় হে। দয়াময় হরি। একবার দেখা দাও হরি।—"

গীত আরম্ভ হইতেই সেই বাবু মহাশয় রঙ্গ করিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হরি কোথায়, বাবাজি?"

আমি মনে করিলাম, প্রহ্লাদের মত উত্তর দিই, "এই স্তম্ভে।" ইচ্ছা করিলাম, প্রভু স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া দ্বিতীয় হিরণ্যকশিপুর মত এই বাবুটাকে ফাড়িয়া ফেলুন—নরসিংহের হস্তে নরবানরের ধ্বংস দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত করি। কিন্তু আমি প্রহ্লাদ নহি, চুপ করিয়া রহিলাম। বাবাজি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "হরি কোথায়। তা আমি কি জানি। জানিলে কি তোমার কাছে আসি? তাঁহারই কাছে যাইতাম।"

রামবল্লভ। তবু তাঁর একটা থাকবার যায়গা কি নাই? হরির একটা বাড়ী ঘর নাই?

বাবাজি। আছে বৈ কি? তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন।

বাবু। বৈকুণ্ঠ এখান থেকে কত দূর, বাবাজি?

বাবাজি। তোমার আমার নিকট হইতে অনেক দূর।

বাবু। নিকট তবে কার?

বাবাজি। যাহার কুণ্ঠা নাই।

বাবু। কুণ্ঠা কি?

বাবাজি। বুঝেছি—কালেজের সাহেবেরা টাকাগুলো ঠকাইয়া লইয়াছে। আমাকে দিলে বেশী উপকার হইত, হরিনাম শিখাইতাম। এখন অভিধান খোল।

বাবু। ঘরে অভিধান নাই। এক জন চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাবাজি। অভিধান তোমার কখন ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতে অত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?

* প্রচার, ১২৯১, পৌষ।

বাবু। অহো—সেই কুণ্ঠা! কুণ্ঠা—কুণ্ঠিত। যেখানে কেহ কুণ্ঠিত হয় না, সেই বৈকুণ্ঠ? * এমন স্থান কি আছে?

বাবাজি। বাহিরে নাই—ভিতরে আছে।

বাবু। ভিতরে—কিসের ভিতরে?

বাবাজি। মনের ভিতরে। যখন তোমার মনের এরূপ অবস্থা হইবে যে, ইহজগতে আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবে না—যখন চিত্ত বশীভূত, ইন্দ্রিয় দমিত, ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, হৃদয়ে শান্তি উপস্থিত হইবে, যখন সকলেই বৈরাগ্য, সকলেই সমান সুখ,—তখন তুমি পৃথিবীতে থাক বা না থাক, সংসারে থাক বা না থাক, তুমি তখন বৈকুণ্ঠে।

বাবু। তবে বৈকুণ্ঠ একটা শহর টহর কিছু নয়—কেবল মনের অবস্থা মাত্র। তবে না বিষ্ণু সেখানে বাস করেন?

বাবাজি। কুণ্ঠাশূন্য নির্ব্বিকার যে চিত্ত, তিনি সেইখানে বাস করেন। বৈরাগীর হৃদয়ে তাঁহার বাসস্থান—এই জন্য তিনি বৈকুণ্ঠনাথ।

বাবু। সে কি? তিনি যে শরীরী। যাঁর শরীর আছে, তাঁর একটা বাসস্থান চাই।

বাবাজি। শরীরটা কি রকম বল দেখি?

বাবু। তাঁকে তোমরা চতুর্ভুজ বল।

বাবাজি। তা বটে। তাঁহার চারি হাত বলি। মনে কর দেখি, চারি হাতে কি কি আছে!

বাবু। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।

বাবাজি। একে একে। আগে পদ্মটা বুঝ। কিন্তু বুঝিবার আগে মনে কর, ঈশ্বর করেন কি?

বাবু। কি করেন?

বাবাজি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। সৃষ্টি-বাদ দুই রকম আছে। এক মত এই যে, আদৌ জগতের উপাদান মাত্র ছিল না, ঈশ্বর আদৌ উপাদান সৃষ্ট করিয়া, পরে তাহাকে রূপাদি দিয়াছেন। আর এক মত এই যে, জগতের উপাদান নিত্য, ঈশ্বর কল্পে কল্পে তাহা রূপাদিবিশিষ্ট করেন। এই দ্বিতীয়বিধ সৃষ্টির শক্তি জগতের কেন্দ্রে। শুনিয়াছি, সাহেবদেরও না কি এমনই একটা মত আছে। † সৃষ্টির মূলীভূত এই জগৎকেন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রে নারায়ণের নাভিপদ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। বিষ্ণুর হাতে যে পদ্ম, তাহা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রতিমা।

বাবু। আর তিনটা?

বাবাজি। গদা লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। শঙ্খ ও চক্র স্থিতিক্রিয়ার প্রতিমা।

* বাবাজির ব্যাকরণ অভিধানে কত দূর দখল, বলিতে পারি না। বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর একটি নাম। পণ্ডিতেরা বলেন, বিবিধা কুণ্ঠা মায়া যস্য স বৈকুণ্ঠঃ। কিন্তু বাবাজি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও শাস্ত্রসম্মত।

† **La Placian hypothesis**

জগতের স্থিতি, স্থানে ও কালে। স্থান, আকাশ। আকাশ শব্দবহ, শব্দময়। তাই শব্দময় শঙ্খ আকাশের প্রতিমাস্বরূপ বিষ্ণুহস্তে স্থাপিত হইয়াছে।

বাবু। আর চক্র?

বাবাজি। উহা কালের চক্র। কল্পে কল্পে, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে কাল বিবর্ত্তনশীল। তাই কাল ঈশ্বর-হস্তে চক্রাকারে আছে। আকাশ, কাল, শক্তি ও সৃষ্টি, জগদীশ্বর চারি ভুজে এই চারিটি ধারণ করিতেছেন। এখন বুঝিলে, বিষ্ণুর শরীর নাই। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কুণ্ঠাশূন্য ভয়মুক্ত বৈরাগী, ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা বলিয়া অনুক্ষণ হৃদয়ে ধ্যান করে।

বাবু। তাই বলিলেই ত ফুরাইত। সবাই ত তা স্বীকার করে, আবার এ রূপকল্পনা কেন?

বাবাজি। সবাই স্বীকার করিবে, কলিকাতা ইংরেজের; তবে আবার একটা মাস্তুল খাড়া করিয়া তাতে ইংরেজের নিশান উড়াইবার দরকার কি? পৃথিবীর সবই এইরূপ কল্পনাতে চলিতেছে; তবে আমার মত মূর্খের ভক্তির পথে কাঁটা দিবার এত চেষ্টা কেন?

বাবু। আচ্ছা, যথার্থই যদি বিষ্ণু অশরীরী, তবে নীল বর্ণ কার? অশরীরীর আবার বর্ণ কি?

বাবাজি। আকাশের ত নীল বর্ণ দেখি—আকাশ কি শরীরী? ভাল, তোমাদের ইংরেজি শাস্ত্রে কি বলে? জগৎ অন্ধকার, না আলো?

বাবু। জগৎ অন্ধকার।

বাবাজি। তাই বিশ্বরূপ বিষ্ণু নীলবর্ণ।

বাবু। কিন্তু জগতে মাঝে মাঝে সূর্য্যও আছে—আলোও আছে।

বাবাজি। বিষ্ণুর হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি আছে। কৌস্তুভ—সূর্য্য; বনমালা—গ্রহ-নক্ষত্রাদি।

বাবু। ভাল, জগৎই কি বিষ্ণু?

বাবাজি। না। যিনি জগতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, তিনিই বিষ্ণু। জগৎ শরীর, তিনি আত্মা।

বাবু। ভাল, যিনি অশরীরী জগদীশ্বর, তাঁর আবার দুইটা বিয়ে কেন? বিষ্ণুর দুই পরিবার, লক্ষ্মী আর সরস্বতী।

বাবাজি। অভিধান কিনিয়া পড়িয়া দেখ, লক্ষ্মী অর্থে সৌন্দর্য্য। শ্রী, রমা প্রভৃতি লক্ষ্মীর আর আর নামেরও সেই অর্থ। সরস্বতী জ্ঞান। বিষ্ণু সৎ, সরস্বতী চিৎ, আর লক্ষ্মী আনন্দ। অতএব রে মূর্খ! এই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে প্রণাম কর।

সর্ব্বনাশ! রামবল্লভবাবুকে, তাঁহার স্বভবনে, "রে মূর্খ!" সম্বোধন! রামবল্লভবাবু তখনই দ্বারবান্‌কে হুকুম দিলেন, "মারো বদ্‌জাত্‌কো!"

আমি বাবাজির ঝুলি ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়া দুই জনে সরিয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবাজি! আজিকার ভিক্ষায় পেলে কি?"

বাবাজি বলিলেন, "বদ পূর্ব্বক জন ধাতুর উত্তর ক্ত করিয়া যা হয়, তাই। ভিক্ষার ধনটা ঝুলির ভিতর লুকাইয়া রাখ।"

শ্রীহরিদাস বৈরাগী

২। পূজাবাড়ীর ভিক্ষা*

নবমী পূজার দিন বাবাজিকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশ্য ইহা সম্ভব যে, তিনি পূজাবাড়ীতে হরিনাম করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সেই অমূল্য অমৃতময় নামের বিনিময়ে তিনি সন্দেশাদি লোষ্ট্র গ্রহণপূর্ব্বক, বৈষ্ণবদিগের বদান্যতা এবং মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিবেন। এক মুঠা চাউল লইয়া যে হরিনাম শুনায়, তার চেয়ে আর দাতা কে? এই সকল কথার সবিশেষ আলোচনা মনে মনে করিয়া, আমি পূজ্যপাদ গৌরদাস বাবাজির সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। যেখানে পূজাবাড়ীতে দ্বারদেশে ভিক্ষুকশ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে, সেইখানেই সন্ধান করিলাম, সে পাকা দাড়ির নিশান উড়িতে ত কোথাও দেখিলাম না। পরিশেষে এক বাড়ীতে দেখিলাম, বাবাজি ভোজনে বসিয়া আছেন।

দেখিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম না। বৈষ্ণব হইয়া শক্তির প্রসাদ ভক্ষণ তেমন প্রশস্ত মনে করিলাম না। নিকটে গিয়া বাবাজিকে বলিলাম, "প্রভু! ক্ষুধায় ধর্ম্মের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বোধ হয়।"

বাবাজি বলিলেন, "তাহা হইলে চোখের ধর্ম্ম বড় উদার। একথা কেন হে বাপু?"

আমি। শক্তির প্রসাদে বৈষ্ণবের সেবা!

বাবাজি। দোষটা কি?

আমি। আমরা কৃষ্ণের উপাসক—শক্তির প্রসাদ খাইব কেন?

বাবাজি। শক্তিটা কি হে বাপু?

আমি। দেবতার শক্তি, দেবতার স্ত্রীকে বলে। যেমন নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মী, শিবের শক্তি দুর্গা, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, এই রকম।

বাবাজি। দূর হ! পাপিষ্ঠ! উঠিয়া যা! তোর মুখ দেখিয়া আহার করিলে আহারও পণ্ড হয়। দেবতা কি তোর মত বৈষ্ণবী কাড়িয়া ঘরকন্না করে নাকি? দূর হ।

আমি। তবে শক্তি কি?

বাবাজি। এই জলের ঘটিটা তোল দেখি।

আমি জলপূর্ণ ঘটিটা তুলিলাম।

বাবাজি একটা জলের জালা দেখাইয়া বলিলেন, "এটা তোল দেখি!"

আমি। তাও কি পারা যায়?

বাবাজি। তোমার ঘটিটা তুলিবার শক্তি আছে, জালাটা তুলিবার শক্তি নাই। ভাত খাইতে পার?

আমি। কেন পারিব না? রোজ খাই।

* প্রচার, ১২৯২, বৈশাখ।

বাবাজি। এই জ্বলন্ত কাঠখানা খাইতে পার ?

আমি। তাও কি পারা যায় ?

বাবাজি। তোমার ভাত খাইবার শক্তি আছে, আগুন খাইবার শক্তি নাই। এখন বুঝিলে দেবতার শক্তি কি ?

আমি। না।

বাবাজি। দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা.আপনার করণীয় কাজ নির্ব্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ কবিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, বহনশক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী।

আমি। এ সব কি কথা ? যে শক্তিতে আমি ঘটি তুলিলাম বা ভাত খাই, তাহা আমি ত চক্ষে কখন দেখি না। কই, আমার সে শক্তি এই দুর্গাঠাকুরাণীর মত সাজিয়া গুজিয়া গহনা পরিয়া আমার কাছে আসিয়া বসুক দেখি ? আমার বৈষ্ণবী তাহা করিয়া থাকে, সুতরাং আমার বৈষ্ণবীকেই আমার শক্তি বলিতে পারি।

বাবাজী। গণ্ডমূর্খেরা তাই ভাবে। তুমি শরীরী, তোমার শক্তি তোমার শরীরে আছে। তাহা ছাড়া তোমার শক্তি কোথাও থাকিতে পারে না।

আমি। দেবতারা কি ? শরীবী ? তবে তাহাদিগের শক্তিও নিরাকার ?

বাবাজি। শরীরী এবং অশরীরী, উভয়েরই শক্তি নিরাকার। কিন্তু একটা একটা করিয়া কথা বুঝ। প্রথমে বুঝ যে, ইন্দ্রাদি দেবতা সকলেই অশরীরী।

আমি। সে কি ? ইন্দ্র যদি অশরীরী, তবে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অপ্সরা-দিগের নৃত্যগীত দেখে কে ?

বাবাজি। এ সকল রূপক। তাহার গূঢ়ার্থ না হয় আর একদিন বুঝাইব। এখন বুঝ, যাহা হইতে বৃষ্টি হয়, তাহাই ইন্দ্র। যাহা দাহ করে, তাহাই অগ্নি। যাহা হইতে জীবের বা বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহাই রুদ্র।

আমি। বুঝিলাম না। কেহ বগমোতে মরে, কেহ ডুবিয়া মরে, কেহ পুড়িয়া মরে, কেহ পড়িয়া মরে, কেহ কাটিয়া মরে। কোন জীব কাহাকে খাইয়া ফেলে, কেহ কাহাকে মারিয়া ফেলে। কোন বস্তু গলিয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু শুকাইয়া ধ্বংস হয়, কোন বস্তু গুঁড়া হইয়া যায়, কেহ শুষিয়া যায়। ইহার মধ্যে কে রুদ্র ?

বাবাজী। সকলের যে সমষ্টিভাব , অর্থাৎ সব একত্রে ভাবিলে যাহা ভাবি, তাই রুদ্র।

আমি। তবে রুদ্র একজন, না অনেক ?

বাবাজি। এক। যেমন এই ঘটিতে যে জল আছে, আর এই জালায় যে জল আছে, আর গঙ্গায় যে জল আছে, সব একই জল, তেমন যেখানেই ধ্বংসকারীকে দেখিবে, সর্ব্বত্রই একই রুদ্র জানিবে।

আমি। তিনি অশরীরী ?

বাবাজি। তা ত বলিলাম।

আমি। তবে মহাদেবমূর্ত্তি গড়িয়া তাঁহাকে উপাসনা করি কেন ? সে কি তাঁর রূপ নয় ?

বাবাজি। উপাসনাব জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। তুমি এই নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিতে পার?

আমি চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না। সে কথা স্বীকার করিলাম। বাবাজি বলিলেন, "যাহারা সেরূপ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, তাহারা পারে। কিন্তু তার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, সে কি উপাসনা হইতে বিরত হইবে? তাহা উচিত নহে। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে, সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এসব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা, সহজ উপায়। তুমি যদি এমন একটা মূর্ত্তি কল্পনা কর যে, তদ্দ্বারা সংহারকারিতার আদর্শ বুঝায়, তবে তাহাকে রুদ্রের মূর্ত্তি বলিতে পার। তাই রুদ্রের কালভৈরব রূপ কল্পনা। নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই।

আমি। এ ত বুঝিলাম। কিন্তু যেমন আমার শক্তি আমাতেই আছে, রুদ্রের শক্তি অর্থাৎ রুদ্রাণী রুদ্রেই আছে। শিব দুর্গা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গড়িয়া পূজা করে কেন?

বাবাজি। তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না। অগ্নিতে যে কখন হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে, অগ্নিতে হাত পুড়িয়া যাইবে। পাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া, যে আর কখন অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে, আগুনের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক্ করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপ চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রূপ-কল্পনা করিতে হয়।

আমি। কিন্তু বৈষ্ণব বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকে, রুদ্রের উপাসনা করে না। অতএব রুদ্রাণীর প্রসাদ ভোজন আপনার পক্ষে অকর্ত্তব্য।

বাবাজি। বিষ্ণু আমাকে যে উদর দিয়াছেন, রুদ্রাণীর প্রসাদে যে তাহা পূরিবে না, এমন আদেশ কিছু করেন নাই। কিন্তু সে কথা থাক। রুদ্রাণী বিষ্ণুরই শক্তি।

আমি। সে কি? রুদ্রাণী ত রুদ্রের শক্তি?

বাবাজি। বিষ্ণুই রুদ্র।

আমি। এ সব অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বা রুদ্র, তিন জন পৃথক্। একজন সৃষ্টি করেন, একজন পালন করেন, একজন লয় করেন। তবে বিষ্ণু রুদ্র হইলেন কি প্রকারে?

বাবাজি। যে বাবুর বাড়ী বসিয়া আমি ভোজন করিতেছি, ইনি করেন কি জান?

আমি। জানি। ইনি জমিদারি করেন।

বাবাজি। আর কিছু করেন না?

আমি। পাটের ব্যবসাও আছে।

বাবাজি। আর কিছু করেন?

আমি। টাকা ধার দিয়া সুদ খান।

বাবাজি। ভাল। এখন আমি যদি বাহিরে গিয়া রামকে বলি যে, আমি অ.জ একজন জমিদারের বাড়ী খাইয়াছি, শ্যামকে বলি যে, আমি একজন ব্যবসাদারের বাড়ী খাইয়াছি, আর গোপালকে বলি যে, আমি একজন মহাজনেব বাড়ী খাইয়াছি, তাহা হইলে তিন জনের কথা বলা হইবে? না একজনেরই কথা বলা হইবে?

আমি। একজনেরই কথা। তিন একই।

বাবাজি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনই এক। একজনই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা। হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বব ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই।

আমি। তবে তিন জনকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে কেন?

বাবাজি। তুমি যদি এই বাবুকে বিশেষ করিয়া জানিতে চাও, তবে তাঁর সকল কাজগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি জমিদার হইয়া কিরূপে জমিদারি করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, তিনি ব্যবসাদার হইয়া কি প্রণালীতে ব্যবসা করেন, তাহা বুঝিতে হইবে, আর তিনি মহাজনিতে কি করেন, তাহাও বুঝিতে হইবে। তেমনি ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার কৃত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পৃথক্ পৃথক্ বুঝিতে হইবে। এই জন্য ত্রিদেবের উপাসনা। এক জনেরই কার্য্যানুসারে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। তিন জনের তিনটি নাম নহে।

আমি। বুঝিলাম। কিন্তু গোল মিটিতেছে না। বৃষ্টি হইল, তাহাতে শস্য জন্মিল, খাইয়া সবাই বাঁচিলাম। বাঁচাইল কে—পালনকর্ত্তা বিষ্ণু—না বৃষ্টিকর্ত্তা ইন্দ্র?

বাবাজি। যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ যে, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড় বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্ব্বদেবতা। তবে যেমন আমাদের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থ এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বিল বলি, কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোস্পদ বলি, তেমনি উপাসনার জন্য তাঁহাকে কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন বিষ্ণু ইত্যাদি নানা নাম দিই।

আমি। তবে তাঁহার যথার্থ নাম কি?

বাবাজি। তাঁহাকে দুই ভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ, এবং সর্ব্ব-জগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেই জন্য চিন্তনীয়, সগুণ, এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তাস্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়-বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।

আমি। কেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ নাম কেন?

বাবাজি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই উভয় লক্ষণযুক্ত স্বরূপে ধ্যেয় বলিয়া

নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এ জন্য আমি তাঁহার দাসানুদাস, সেই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করি। একবার তোমরা কৃষ্ণনাম কর! বল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হরি! হরি!

বাবাজি তখন হরিবোল দিয়া উঠিলেন। এক ব্রাহ্মণ পরিবেশন করিতেছিল, সে হরিবোল শুনিয়া বলিল, "বাবাজি! অত হরিবোলের ধূম কেন? পাঁটাটা রান্না বড় ভাল হয়েছে, বটে!"

তাই ত! সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় অন্যমনা ছিলাম, দেখি নাই যে, বাবাজি এক রাশি ছাগমাংস উদরসাৎ করিয়া দ্বিতীয় তৈমুরলঙ্গের ন্যায় অস্থির স্তূপ সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "বাবাজি! এই তোমার হরিবোল! এই তোমার বৈষ্ণবধর্ম্ম! তুমি কণ্ঠী ছিঁড়িয়া ফেল। আমরা কেহ তোমার সঙ্গে আহারাদি করিব না।"

বাবাজি। কেন, কি হয়েছে বাপু!

আমি। আমার মাথা হয়েছে! তুমি বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক! এক রাশ, যাহার নাম করিতে নাই, তাই খেয়ে পার করিলে, আবার জিজ্ঞাসা কর কি হয়েছে?

বাবাজি। পাঁটা খেয়েছি? বাপু, ভগবান কোথায় বলেছেন যে, পাঁটা খাইও না? যদি পুরাণ ইতিহাসের দোহাই দিতে চাও, তবে পদ্মপুরাণ খোল, দেখাইব যে, মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। ভগবান্ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় মাংসেই নিত্যসেবা করিতেন। তিনি পাপাচরণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে? তুই বেটা আবার বৈষ্ণব?

আমি। তবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলে কেন?

বাবাজি। অহিংসা যথার্থ বৈষ্ণব-কন্যা বটে, কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া বৌদ্ধঘরে গিয়া জাত হারাইয়াছে।

আমি। ছেঁদো কথা বুঝিতে পারি না।

বাবাজি। দেখ, বাপু! বৈষ্ণব নাম গ্রহণ করিবার আগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি, বোঝ। তোমার কণ্ঠীতে বৈষ্ণব হয় না, কুঁড়োজালিতেও নয়, নিরামিষেও নয়, পঞ্চসংস্কারেও নয়, দেড় কাহন বৈষ্ণবীতেও নয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কে বল দেখি?

আমি। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ।

বাবাজি। প্রহ্লাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবধর্ম্মের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শুন,

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।

অর্থাৎ "হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। সমত্ব, অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা।" কণ্ঠী, কুঁড়োজালি, কি দেখাস্ রে মূর্খ! এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংসা-ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণুনাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল। যে খ্রীষ্টীয়ান, কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যিশুরই পূজা করুক আর পীর প্যাগম্বরেরই পূজা করুক, সে-ই পরম বৈষ্ণব। আর তোমার কণ্ঠী কুঁড়োজালির নিরামিষের দলে, যাহারা তাহা শিখে নাই, তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে।

আমি। মাছ পাঁটা খেয়ে কি তবে বৈষ্ণব হওয়া যায় ?

বাবাজি। মূর্খ! তোকে বুঝাইলাম কি ?

আমি। তবে আমাকেও একখানা পাতা দিতে বলুন।

তখন পাতা, এবং কিঞ্চিৎ অন্ন এবং মহাপ্রসাদ পাইয়া আমিও ভোজনে বসিলাম। পাকের কার্য্যটা অতি পরিপাটিরূপে হইয়াছিল। ছাগমাংস ভোজনে আমার ক্ষুধা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখিয়া বাবাজি বলিলেন, "বাপু হে! কল্পনা করিয়াছি, পরামর্শ দিয়া আগামী বৎসর কছিমদ্দী সেখকে দিয়া দুর্গোৎসব করাইব!"

আমি। ফল কি ?

বাবাজি। ছাগমাংস কিছু গুরুপাক। মুরগী বড় লঘুপাক, অতএব বৈষ্ণবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমি। মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে ?

বাবাজি। এ কান দিয়ে শুনিস্ ও কান দিয়ে ভুলিস্ ? যখন সর্ব্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি, ও বড় জাতি, এরূপ ভেদজ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ-জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।

আজ তোমাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম কিছু বুঝাইলাম। আর একদিন তোমাকে ব্রহ্মোপাসনা এবং কৃষ্ণোপাসনা বুঝাইব। ধর্ম্মের প্রথম সোপান, বহু দেবের উপাসনা; দ্বিতীয় সোপান, সকাম ঈশ্বরোপাসনা; তৃতীয় সোপান, নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্ম্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।

৩। রাধাকৃষ্ণ*

আমি একটা প্রাচীন গীত আপন মনে গায়িতেছিলাম।

"ব্রজ তেজে যেও না, নাথ,"—

এইটুকু গায়িতে না গায়িতে, বাবাজি "অহঃ" বলিয়া, একেবারে কাঁদিয়া অজ্ঞান। আমি থাকিতে পারিলাম না, হাসিয়া ফেলিলাম। ক্রুদ্ধ হইয়া বাবাজি বলিলেন, "হাসিলি কেন রে বেটা ?"

আমি বলিলাম, "তুমি হাঁ করতেই কাঁদ, তাই আমি হাসি।"

বাবাজি। হাঁ ক'রে যা বলেছিস্, সে কথাটা কিছু বুঝেছিস্ ? না শালিক পাখির মত কিচির কিচির করিস্ ?

আমি। বুঝ্‌ব না কেন ? রাধা কৃষ্ণকে বল্‌ছেন যে, তুমি আমাদের ব্রজ ছেড়ে যেও না।

বাবাজি। ব্রজ কি বল্ দেখি ?

আমি। কৃষ্ণ যেখানে গোরু চরাতেন আর গোপীদের নিয়ে বাঁশী বাজাতেন।

বাবাজি। অধঃপাতে যাও। 'ব্রজ' ধাতু কি অর্থে বল্ দেখি ?

* প্রচার, ১২৯২, আষাঢ়।

আমি। ব্রজ ধাতু। অষ্ট ধাতুই ত জানি। আবার ব্রজ ধাতু কি?

বাবাজি। ব্রজ গমনে। ব্রজ, অর্থাৎ যা যায়।

আমি। যা যায়, তাই ব্রজ? গোরু যায়, বাছুর যায়, আমি যাই, তুমি যাও—সব ব্রজ?

বাবাজি। সব ব্রজ। জগৎ কাকে বলে, বল্ দেখি?

আমি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ।

বাবাজি। 'জগৎ' কোন্ ধাতু হইতে হইয়াছে?

আমি। ধাতু ছাড়া যা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিব, ও কথাটা শুনিলেই কেমন ভয় করে।

বাবাজি। গম ধাতু হইতে জগৎ শব্দ হইয়াছে। যা যায়, তাই জগৎ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নশ্বর, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ। ব্রজ শব্দ আর জগৎ শব্দ একার্থবাচক।

আমি। ব্রজ তবে একটা জায়গা নয়? আমি বলি, বৃন্দাবনই ব্রজ।

বাবাজি। বৃন্দাবন নামে যে শহর এখন আছে, তাহা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ঠাকুরেরা তৈয়ার করিয়াছেন।

আমি। তবে পুরাণে বৃন্দাবন কাকে বলিয়াছে?

বাবাজি। "বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তত্তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্" যে স্থানে বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন ('করেন' বলিলেই ঠিক হয়), সেই বৃন্দাবন।

আমি। বৃন্দা কে?

বাবাজি। রাধাষোড়শনাম্নাং চ বৃন্দা নাম শ্রুতৌ শ্রুতম্।
তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্॥

রাধাই বৃন্দা।

আমি। রাধা কে?

বাবাজি। রাধ ধাতু—

আমি। ধাতু ছাড় বাবাজি।

বাবাজি। রাধ ধাতু সাধনে, প্রাপ্তৌ, তোষে, পূজায়াং বা। যে ঈশ্বরের সাধন করে, যে তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার পূজা (বা আরাধনা) করে, সেই রাধা। ঈশ্বরভক্ত মাত্রেই রাধা। তুমি ঈশ্বরভক্ত হইলে রাধা হইবে।

আমি। তবে তিনি গোপিনীবিশেষ নন?

বাবাজি। গোপিনী শব্দ হয় না—গোপী শব্দ। কাকে বলে?

আমি। গোপের স্ত্রী গোপী।

বাবাজি। গো শব্দে পৃথিবী। যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারাই পৃথিবীর রক্ষক। তাঁহারাই গোপ। স্ত্রীলিঙ্গে তাঁহারা গোপী।

আমি। গোলোক কি তবে?

বাবাজি। এই পৃথিবীগোলক—ভূলোক।

আমি। আপনি সব গোল বাধাইলেন। ভাল, সবই যদি রূপক হইল, তবে নন্দ কি?

বাবাজি। নন্দ ধাতু হর্ষে, আনন্দে। আমরা উপসর্গ ভিন্ন কথা ব্যবহার করি না, এই একটা উপসর্গ। যাহাকে আনন্দ বলি, তাই নন্দ।

আমি। ভগবান্ কি আনন্দে জন্মেন যে, তিনি নন্দনন্দন?

বাবাজি। কৃষ্ণ যে নন্দপুত্র, এ কথা কেহ বলে না। তিনি বসুদেবের পুত্র, নন্দালয়ে ছিলেন, এই মাত্র।

আমি। সে কথারই বা অর্থ কি?

বাবাজি। পরমানন্দ-ধামই ঈশ্বরের বাস। অর্থাৎ তিনি আনন্দেই বিদ্যমান।

আমি। তবে যশোদা কোথায় যায়? যশোদা যে কৃষ্ণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য কি?

বাবাজি। ঈশ্বরের যশঃ অর্থাৎ মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়।

আমি। সবই রূপক দেখিতেছি। কৃষ্ণও কি রূপক নন?

বাবাজি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন। কিন্তু পুরাণকার তাঁহাকে মাঝখানে স্থাপিত করিয়া, এই ধর্ম্মার্থক রূপকটি গঠন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের নামের আর একটা অর্থ আছে, তাহাতে ইহার একটা সুবিধা হইয়াছিল। কৃষ ধাতু কর্ষণে বা আকর্ষণে। যিনি মনুষ্যের চিত্ত কর্ষণ বা আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ।

আমি। এটা বাবাজি কষ্টকল্পনা।

বাবাজি। তা'ত বটেই। কৃষ্ণ রূপক নহেন, কাজেই এ অর্থ কষ্টকল্পে ঘটাইতে হয়। তিনি শরীরী, অন্যান্য মনুষ্যের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি অশরীরী জগদীশ্বর। তাঁহাকে নমস্কার কর।

আমি। কিন্তু রূপকের কি হইবে? রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব কি?

বাবাজি। জগদীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার ভক্তের উপাসনা করিবে। কেন না, ভক্ত তন্ময়, ভক্তও ঈশ্বরের অংশত্ব পাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বর ভক্ত। জগৎ ঈশ্বরময়। জগতের ঈশ্বরের সঙ্গে জগতেরও উপাসনা করিবে। অতএব বল, শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ।

আমি। শ্রীরাধাবল্লভায় নমো নমঃ।

শ্রীহরিদাস বৈরাগী।

কাম*

হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থসকলে "কাম" শব্দটি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কামাত্মা বা কামার্থী, তাহার পুনঃ পুনঃ নিন্দা আছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক এই "কাম" শব্দের অর্থ বুঝিতে বড় গোল করেন, এই জন্য সকল স্থানে তাঁহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা সচরাচর ইন্দ্রিয়বিশেষের পরিতৃপ্তির ইচ্ছার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন,

* প্রচার, ১২৯২, আষাঢ়।

এবং শাস্ত্রেও ঐ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বুঝেন। সেটা ভ্রান্তি। মহাভারত হইতে দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা কাম শব্দের অর্থ বুঝাইতেছি।

"পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম।" (বনপর্ব্ব, ৩৩ অধ্যায়)। ইহা একেবারে নিন্দনীয় বিষয় বলিয়া স্থির হইতেছে না। "মন ও হৃদয়" এই কথা না বলিয়া কেবল যদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, ইন্দ্রিয়বশ্যতা (Sensuality) এই দুষ্প্রবৃত্তিরই নাম কাম। কিন্তু "মন" ও "হৃদয়" থাকাতে সে কথা খাটিতেছে না। স্থানান্তরে বলা হইতেছে যে, "স্রকৃচন্দনাদিরূপ দ্রব্য স্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপে অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে তাহারই নাম কাম।"

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ উহা কোন প্রকার প্রবৃত্তি বা বৃত্তি নহে, প্রবৃত্তি বা বৃত্তির পরিতৃপ্তাবস্থা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা সকল সময়ে নিন্দনীয় বা জঘন্য সুখ নহে। উহা সদসৎ কর্ম্মের ফল। এই জন্য পশ্চাৎ কথিত হইতেছে যে, "উহা কর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কামপর হইবে না। সতত সম-ভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্ণে কামানুশীলন করিবে।"

"কেবল ধর্ম্মপর হইবে না।" এমন একটা কথা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়, যে ব্যক্তি এ উপদেশ দিতেছে, সে ব্যক্তি ঘোরতর অধার্ম্মিক, নয় সে ধর্ম্ম শব্দ কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছে। এখানে দুই কথাই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য। এখানে বক্তা খোদ ভীমসেন; তিনি অধার্ম্মিক নহেন, কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠির বা অর্জ্জুনের ন্যায় ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠেন নাই। এবং ধর্ম্ম শব্দও তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার একটা কথাতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি পরে বলিতেছেন, "দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব, এই কয়েকটি প্রধান ধর্ম্ম।"

বস্তুতঃ আমরা এখন যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহা দ্বিবিধ; এক আত্ম-সম্বন্ধী, আর এক পর-সম্বন্ধী। পরসম্বন্ধী ধর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান অংশ; কিন্তু আত্মসম্বন্ধী ধর্ম্মও আছে, এবং তাহা একেবারে পরিহার্য্য নয়। আমি পরকে সুখে রাখিয়া যদি আপনিও সুখে থাকিতে পারি, তবে তাহা না করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক কষ্ট সহিব কেন? ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্ফল কষ্ট পাওয়া অধর্ম্ম। এখানে ভীমসেন সেই পর-সম্বন্ধী ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিতেছেন, এবং আত্ম-সম্বন্ধী ধর্ম্মের ফলভোগকে কাম বলিতেছেন। তাহা বুঝিলে, "কেবল ধর্ম্মপর হইবে না" এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

বস্তুতঃ ধর্ম্মকে আত্মসম্বন্ধী, এবং পরসম্বন্ধী, এরূপ বিভাগ করা উচিত নহে। ধর্ম্ম এক; ধর্ম্ম মাত্র আত্মসম্বন্ধী ও পরসম্বন্ধী। অনেকে বলেন যে, ধর্ম্ম কেবল পরসম্বন্ধী হওয়াই উচিত। আবার অনেকে বলেন, যথা খ্রীষ্টীয়ানেরা, যে যাহাতে আমি পরকালে সদ্গতি লাভ করিব, তাহাই ধর্ম্ম। অর্থাৎ তাহাদের মত, ধর্ম্ম কেবল আত্মসম্বন্ধী।

স্থূলকথা, ধর্ম্ম আত্মসম্বন্ধীও নহে, পরসম্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম্ম। তাহা আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না।

ধর্ম্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ-সম্বন্ধিনী, ও পর-সম্বন্ধিনী ; তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়। ফলতঃ ধর্ম্ম এই ভাবে বুঝিলে স্বার্থে এবং পরার্থে প্রভেদ উঠাইয়া দেওয়া অনুশীলনবাদের একটি উদ্দেশ্য। "ধর্ম্মতত্ত্বে" এই অনুশীলনবাদ বুঝান গিয়াছে।

বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন*

১। যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

২। টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায় ; লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সে দিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোক-রঞ্জন-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

৫। যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।

৬। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্ত্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যতে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

৭। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে, তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাশি, জর্ম্মান্ কোটেশন্ বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

* প্রচার, ১২৯১, মাঘ।

৮। অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে—ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।

৯। যে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে, তবে দুই চারি বার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না—বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

১০। সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

১১। কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজি বা সংস্কৃত বা বাঙ্গালা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এরূপ লিখিব, এ কথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

১২। যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে*

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব লোক-প্রথিত।

জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিলের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটিই সারবান্। জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল হইতে তাঁহার মতে, নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মত প্রচারের পূর্ব্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন্ দেখাইয়াছেন যে, এই নির্ম্মাণ-কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিলও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন, এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধ-মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই মতটি প্রকৃত হয়, তবে উপরিকথিত নির্ম্মাণ-কৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-প্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রচারের

* বঙ্গদর্শন, ১২৮২, বৈশাখ। বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, "মিল্, ডার্বিন্ এবং হিন্দুধর্ম্ম।" বর্ত্তমান শিরোনামে বিজ্ঞান শব্দের অর্থে "Science" বুঝিতে হইবে।

অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলম্বের প্রয়োজন। কালবিম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাঁহাকে স্বীকার কবিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন—কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাঁহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে।

ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হউক না হউক, কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবে না। প্রায় এইরূপ ভাবেই মিল্ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন্ স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন।

অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটি প্রভেদ এ স্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি স্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন ঈশ্বর ইচ্ছাপ্রবৃত্ত্যাদি-বিশিষ্ট—এই জগতের নির্ম্মাতা; ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরিকথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাই কেবল জানি যে, সেই জগৎ-কারণ অজ্ঞেয়। হর্বর্ট্ স্পেন্সর্ এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।* তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।

মিল্ যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল্ ইচ্ছাবিশিষ্ট, জগন্নির্ম্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণ মাত্র সীমাশূন্য—অনন্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময়।

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই তাঁহার শক্তি যে অনন্ত নহে, তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেন না, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেইখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের

---

* The consciousness of an Inscrutable Power manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer.—*First Principles*. p. 108. ইহা লেখার পর হর্বর্ট স্পেন্সরের মতের কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মনুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল্ প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিয়মমত চলিত, তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিঙ্গ্ এবং হুইলের উপর হুইল্ গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা সিদ্ধ।

এ কথার দুই একটা উত্তর আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বৈদিক [illegible] আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপত্তিও মিল্ সম্যক্ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল্ বলেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্নে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর—কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জানেন না—সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃসংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পূয হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাঁহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাঁহার কৌশলের অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল্ স্বীকার করেন যে, এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসর্ব্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, তবে এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্ব্বশক্তিমান নহে তাহার কারণ, তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধকতা আছে। তুমি যে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সাগর-পারে নিক্ষেপ করিতে পার না—তাহার কারণ, মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিঘ্নের জন্য সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দ্দোষ করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্ম্মাতা মাত্র; তিনি যে স্রষ্টা, এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই। তুমি তাঁহার নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ; কিন্তু নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে কেবল নির্ম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্ম্মাণ দেখিয়া তুমি কুম্ভকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুম্ভকারকে মৃত্তিকার সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন, কেবল নির্ম্মাতা। ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্ত্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্ব্ব হইতে ছিল—ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া

কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, কোন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সৃষ্ট নহে, এ কথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয়, ঐশী শক্তির সীমানির্দ্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড় পদার্থের এমন কোন দোষ আছে যে, তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহুকৌশলময় এবং বহুশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্যসকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আর একটি উত্তর এই যে, ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। যদি নির্ম্মাতার কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈত ধর্ম্ম এইরূপ—তাঁহারা বলেন যে, একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত—আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পরিণত।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল্ প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বপ্রণীত "প্রকৃতিতত্ত্ব" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখভোগ করিতেছেন—এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কার্য্য মাত্রই কেবল দুঃখমোচনের চেষ্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তৎকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। মিল্ বলেন—

"যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই।* যাঁহারা মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন,

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect and absolute recklessness. They go straight to their end, without regarding what and whom they crush on the road...In sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's everyday performances. Killing, the most criminal act recognised by human laws, Nature does once to every being that lives; and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we read of ever purposely inflicted on their living fellow-creatures. If, by an arbitrary reservation we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term supposed to be allotted to human life, nature does also this to all but a small percentage of lives, and does it in all the modes, violent or insidious, in which the worst human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the wheel, casts them to be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with

তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মতবৈপরীত্যশূন্য, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কঠিনভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে, মনুষ্যের সুখ তাঁহার অভিপ্রেত ; তাহাতে বুঝায় যে, মনুষ্যের ধর্ম্মই তাঁহার অভিপ্রেত ; সংসার সুখের হউক না হউক, ধর্ম্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল ? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্ত্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রণালী লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী,

stones like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes them with cold, poisons them by the quick or slow venom of her exhalations and has hundreds of other hideous deaths, such as the ingenious cruelty of a Nabis or a Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst ; upon those who are engaged in the highest and worthiest enterprise, and often as the direct consequence of the noblest acts ; and it might almost be imagined as a punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the well-being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for generations to come, with as little compunction as those whose death is a relief to themselves and to those under their noxious influence. Such are nature's dealings with life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in apparent wantonness In the clumsy provision which she has made for that perpetual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life (equal to it according to a high authority) is taking the means by which we live , and Nature does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an inundation desolates a district, a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti, seize and appropriate the wealth of the rich and the *little all* of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding, and killing as their human prototypes. Every thing in short which the worst men commit either against life or property is perpetrated on a large scale by natural agents Nature has Noyades more fatal than those of Carrier ; her explosions of fire damp are as destructive as human artillery ; her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias... Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane and a pestilence."– *Mill on Nature*, pp. 28-31.

লোকের ধর্ম্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুষ্ক্রিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভাল মন্দ বা অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয়তুল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতিযুক্ত নহে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ ইহলোকে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, এই জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্বিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে, তিনি তাহা পুণ্যাত্মার পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্ম্মই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্ম্মাধর্ম্মই যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া, কেবল জন্মদোষেই* বহুলোকে সর্ব্বপ্রকার পাপাসক্ত হয়; তাহাদিগের পিতৃ-মাতৃ-দোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্ঘ্য ঘটনার দোষে এরূপ হয়;—তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্ম্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।" †

এই সকল কথা বলিয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় যে, এই জগতের নির্ম্মাতা বা পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল্ এরূপ মত ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good *cannot* at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral; could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the religious explana-

* খ্রীষ্টান্ ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জ্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল্ তত সহজে নিস্তার পাইতেন না।

† *Mill on Nature*, pp. 37-38.

tions of the order of Nature, this alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account."*

যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা 'অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিদেবের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না; মিল্ হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিনি নির্ম্মাণকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্ম্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্ম্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি—জীব উদ্ভিদ্ বায়ু বারি মৃৎপ্রস্তরাদি, সকলই সেইরূপে নির্ম্মিত; পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্ম্মিত। অতএব সকলই সেই নির্ম্মাতার কীর্ত্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকারশূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণুসমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা নির্ম্মিত কি না—নির্ম্মাতার হস্তপ্রসূত কি না—তাহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্ম্মাতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মিল্ বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল্, নির্ম্মাতা এবং পালন বা রক্ষা-কর্ত্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর ফল জন্ম বা সৃজন, সেই নিয়মা-বলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্ম্মাণ বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা, ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অম্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অম্লজান সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা, ইহাও সিদ্ধ।

তবে, পালনকর্ত্তা চৈতন্য সংহারকর্ত্তা চৈতন্য পৃথক্, এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি পালনকর্ত্তা তাঁহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। যাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা

* *Mill on Nature*, pp. 38-39.

সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্ চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, এ কথা অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে।

তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না।

সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" পবিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে পরিমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল—কিন্তু পৃথিবী সংকীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়—অধিকাংশ অণ্ডমধ্যে বা বীজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্য বা আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যে, তদ্দ্বারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহারসংগ্রহে, কিম্বা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর, কোন দেশে বহুজাতীয় এরূপ চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে, তাহা হইলে যাহ-দিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ব্বনিম্নস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে; যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ, তাহারা নিম্নস্থ শাখাও খাইবে, তদপেক্ষা ঊর্দ্ধস্থ শাখাও খাইতে পারিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে—সর্ব্বনিম্নস্থ শাখাসকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন কেবল দীর্ঘস্কন্ধেরাই আহার পাইবে—হ্রস্বস্কন্ধেরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। দীর্ঘস্কন্ধেরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে রক্ষিত হইল। হ্রস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে, যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ, একটি সামান্য বৃক্ষে কত সহস্র সহস্র বীজ জন্মে, একটি ক্ষুদ্র কীট কত শত শত অণ্ড প্রসব করে। যদি সেই বীজ বা সেই অণ্ড, সকলগুলিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকাল মধ্যে সেই এক বৃক্ষেই বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যদি কোন কীট প্রত্যহ দুইটি অণ্ড প্রসব করে (ইহা অন্যায় কথা নহে), তবে দুই দিনে সেই কীট সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে ষোলটি, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কোটি কীট হইবে, তাহা শুভঙ্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, পঁচিশ বৎসরে মনুষ্যসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয়, তবে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যের দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে; মনুষ্যও নহে। কিন্তু ডার্বিন্ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতি

ন্যূনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে তাহা হইতে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স্ হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে।*

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্ত্তাকুবৃক্ষে কতগুলি বার্ত্তাকু—পরে ভাবুন, একটি বার্ত্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে। তাহা হইলে একটি বার্ত্তাকুবৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে, তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে যেখানে বার্ষিক দুইটি বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বৎসর প্রতি বৃক্ষের সহস্র সহস্র বার্ত্তাকুবীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্ত্তাকুবৃক্ষ হইবে, তাহা কে মনে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্ত্তাকুর স্থান হয়?

চেতন সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় না। যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত, তাহা এত প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাঁহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না যে স্রষ্টা ও পাতা এক, এ কথা না বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক্, পাতা পৃথক্, এ কথা বলাই সঙ্গত?

ইহার একটি উত্তর আছে—জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্ত্তা কল্পনা করিয়াছ। সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাঁহার কার্য্য—যত সৃষ্টি হয়, তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারই কার্য্য। পাতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ, এই সংহারকর্ত্তার শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাঁহার অভিপ্রায় নহে, এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই।

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে সে সকলের, অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায় যে, এ জগতে অপরিমিতসংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে—অতএব অপরিমিত জীবসৃষ্টি নিষ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এ কথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি স্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অদূরদর্শী। কিন্তু তিনি কৌশলময়—জীবসৃজনপ্রণালী অপূর্ব্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল, তিনি কখনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাঁহাকে অদূরদর্শী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্যপ্রণীত, এ কথা আর বলিতে পারিবে না; কেন না, অদূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। তবে বলিতে হইবে যে, তিনি জানিয়া নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূরদর্শী

Origin of Species—6th Edition, p. 51.

চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ নিষ্ফলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্ত্তা, অপরিমিত জীবসৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে। এজন্য পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে।

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্ স্বীকার করিলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, স্রষ্টা নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত; দূরদর্শী চৈতন্য নিষ্ফল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এই আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে স্রষ্টা যদি পৃথক্ হইলেন, তবে সৃষ্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। সৃষ্টি তাঁহার এক মাত্র অভিপ্রায়; এবং সৃষ্টি হইলেই তাঁহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল—রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিষ্ফলতা নাই।

অতএব স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্ত্তা পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য, এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে—ইহাই হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি, এবং এই স্রষ্টা, পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে, এই ত্রিদেবের উপাসনা এইরূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এমত বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু রুদ্রাদি হইতে। বৈদিক বিষ্ণু রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে। তবে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিদেবোপনাসা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, উহার সুদৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি, তাহাই আমরা দেখাইলাম।

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় না যে, তদ্দ্বারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়।

প্রথম এই যে, জগতের নির্ম্মাণকৌশলে চৈতন্যযুক্ত নির্ম্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সূত্রটি ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলকেই নির্ম্মাণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি, নচেৎ নির্ম্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা সংহারকর্ত্তা, এবং পৃথক্ পৃথক্ স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নির্ম্মাতার অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ এই যে, সৃজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই

নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে, তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দেশ করি নাই।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসম্মত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবো-পাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিল-কৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে। হিন্দুদিগের মত কর্ম্মফল মানিলে বা হিন্দুদিগের মায়াবাদে তাহা বিজ্ঞানসম্মত হয়।

বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, এই জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র, সর্ব্ব-কার্য্যে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ, বহির্জগতের অন্তরাত্মাস্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি প্রণাম করি।

বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা*

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব?

* এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে, তাহার পুনরুক্তি এখনও প্রয়োজনীয়। ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইংরাজিভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক", তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চর, এড্রেস্, প্রোসিডিংস্, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ, ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।

আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলিন কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।* অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে

* এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস্ এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।

চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্, এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্ "ফিল্‌টর্ ডোন্" করিবে।* এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক্ শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরি ভাগে জলসেক করিলেই নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে! জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজিশিক্ষার সঙ্গে এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্য্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি, বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট্ লিখিবার সময়ে এই জলপানা কথাটা মনে রাখিবেন।

* উচ্চ শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কথাটা এই সময়ে উঠিয়াছিল। তদুপলক্ষে এই কথাটা উঠিয়াছিল। উচ্চ শিক্ষাপক্ষীয় লোক এই কথা বলিতেন।

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?

প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন অধিক পার্থক্য জন্মিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল, তবে সংসর্গ-ফল জন্মিবে কি প্রকারে? যে পৃথক্, তাহার সহিত সংসর্গ কোথায়? যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উদ্ধৃত না হইল, তবে যাঁহারা শক্তিমন্ত তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই—যতদিন উভয়ে পার্থক্য ছিল, ততদিন উন্নতি ঘটে নাই। যখন উভয় সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য হইল, সেই দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ। রোম্, এথেন্স্, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। সে সকল কাহিনী সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সমাজমধ্যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকিলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ স্পার্টা, ফ্রান্স্, মিশর এবং ভারতবর্ষ। এথেন্স্ এবং স্পার্টা দুই প্রতিযোগিনী নগরী। এথেন্সে সকলে সমান, স্পার্টায় এক জাতি প্রভু, এক জাতি দাস ছিল। এথেন্স্ হইতে পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি হইল—যে বিদ্যাপ্রভাবে আধুনিক ইউরোপের এত গৌরব, এথেন্স্ তাহার প্রসূতি। স্পার্টা কুলক্ষয়ে লোপ পাইল। ফ্রান্সে পার্থক্য হেতু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। যদিও তাহার চরম ফল মঙ্গল বটে, কিন্তু অসাধারণ সমাজপীড়ার পর সে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে। হস্তপদাদিচ্ছেদ করিয়া, যেরূপ রোগীর আরোগ্যসাধন, এ বিপ্লবে সেইরূপ সামাজিক মঙ্গলসাধন। সে ভয়ানক ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। মিশর দেশে সাধারণের সহিত ধর্ম্ম-যাজকদিগের পার্থক্যহেতুক, অকালে সমাজোন্নতি লোপ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ এবং নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এরূপ কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে।

সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায়-সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগের চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না। আর, পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ। লিখিতে গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপনা হইতে জন্মে। যেখানে লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে যে, সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহার পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহাদিগের সহিত তাঁহার সহৃদযতার অভাব ঘটিয়া উঠে।

যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। কিন্তু রচনা-কালে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করার একটি বিশেষ বিঘ্ন আছে। সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

আমরা সকলেই স্বার্থাভিলাষী। লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশঃ, সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে, তাহাদের নিকট যশঃ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না। সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে না।

এদিকে কোন সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "মহাশয়, আপনি বাঙ্গালী—বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রাদিতে আপনার এত হতাদর কেন?" তিনি উত্তর করেন, "কোন্ বাঙ্গালা গ্রন্থে বা পত্রে আদর করিব? পাঠ্য রচনা পাইলে অবশ্য পড়ি।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, এ কথার উত্তর নাই। যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়। তাহার পর দুই তিন বৎসর বসিয়া না থাকিলে আর একখানি পাঠ্য বাঙ্গালা রচনা পাওয়া যায় না।

এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্তাবহের কতক দুর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গলসাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনোরঞ্জনার্থ যত্ন পাইব বলিয়া, কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা-সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছি। যদি এই পত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন সঙ্কল্প না করিতাম, তবে এই পত্র প্রকাশ বৃথা কার্য্য মনে করিতাম।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, কিছুই সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয় না। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম, তাহা সকলেই পড়িতে চাহে ; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে। এই যত্নই সাধারণের শিক্ষার মূল। সে কথা আমরা স্মরণ রাখিব।

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি। কিন্তু যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না। গর্জ্জনকারী মাত্রেরই পক্ষে এ কথা সত্য। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পক্ষে বিশেষ। আমরা যে এই কথার সত্যতার একটি নূতন উদাহরণস্বরূপ হইব না, এমত বলি না। আমাদিগের পূর্ব্বতনেরা এইরূপ এক এক বার অকালগর্জ্জন করিয়া, কালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদিগের অদৃষ্টে যে সেরূপ নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তথাপি আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন, এবং মৃত্যু তাহারই প্রক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম, অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল ; নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।

সঙ্গীত

[১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ ৺জগদীশনাথ রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা। যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না।]

সঙ্গীত কাহাকে বলে ? সকলেই জানেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু সুর কি ?

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাণু-মধ্যে কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়; যেমন সরোবরমধ্যে জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চারি দিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণমধ্যে একখানি সূক্ষ্ম চর্ম্ম আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ স্নায়ুতে নীত হইয়া মস্তিষ্কমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞানিকরা স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মসূর সাবর্তি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪ বারের ন্যূনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র—শব্দপ্রকম্পে সেইরূপ থাকিলেই সুব জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ "বেসুর" অর্থাৎ গণ্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।

এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গতত্ত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্তু তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি।

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব বা কোন দোষ আছে। কিন্তু নির্দ্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি—এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিমূর্ত্তির সৃজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দ্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা সুন্দরকান্তিমাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দ্দোষ মূর্ত্তির কল্পনা করিতে পারি। এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দ্দোষ প্রতিমা প্রস্তরে গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের চরম সৃষ্টিই কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য।

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে। যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্বরভঙ্গীই নাই। যে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর

সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্ব্বলোকমধ্যে আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহ-বর্দ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা-প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ক্রূরভাব নহে; ভক্তি ও প্রেমবাচক।

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি দেবতা হইতে তেত্রিশ কোটি দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্রপৌত্রাদির সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনা-কুতূহলিনী। শব্দার্থমাত্রকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তিমাত্রেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবী, আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু—সকলেই দেব; নদ, নদী, দেব, দেবী। দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় রূপ-বিশিষ্ট; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র, পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা একজন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও সাকার, হস্তপদাদি-বিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্ম্মুখ। তবে তাঁহার একটি ব্রহ্মাণীও থাকা চাহি। একটি ব্রহ্মাণীও হইল। ঋষিগণ তাঁহার পুত্র হইলেন। হংস তাঁহার বাহন হইলেন, নহিলে—গতিবিধি হয় কি প্রকারে—ব্রহ্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব। কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীরা সন্তুষ্ট নহে। মনুষ্যেরা কামক্রোধাদিপরবশ, মহাপাপী। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী।

যেখানে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ,—আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ,—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া,—কামাদি মনোবৃত্তি,—এ সকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পুত্রকলত্রাদিযুক্ত, সর্ব্ব বিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে। রাগেরা কুলীন ব্রাহ্মণ—পলিগেমিষ্ট্, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগুলিকে "বাবু" করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি জন্মিল।

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ-রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল রসিকতামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে?

কোন একটি শব্দবিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন পুত্রশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। আবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব—আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—সেইরূপ শোকের আবির্ভাব হইবে।

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। কাঁদিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার মুখাবয়ব দেখিয়াই, তাঁহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলাম। সেই সন্তাপক্লিষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের আধিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। সেই অবধি, যখন আবার সেইরূপ ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে।

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্ন-স্বরূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মানস প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই, সেইরূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই, সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ উভয়ে একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমাস্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়।

ধ্বনি এবং মূর্ত্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া, তাঁহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্য্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাঁহাদিগের মহানুভাব দেখিয়াই চমৎকৃত হই।

দুই একটি উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা তচ্ছ্রবণে যে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর যাহাকে কবিরা "আবেশ" বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত নহে। যাহা কিছু নির্ম্মল সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জ্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণীসকল আসিয়া, তাহার সম্মুখে তটস্থ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী, দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী। ভৈরবী শুক্লাম্বরপরিধানা নানালঙ্কার-ভূষিতা—ইত্যাদি।

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, অলঙ্কারসম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কতকগুলিন শব্দ দ্বারা যে কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে, বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলণ্ডরেরা বাগ্‌পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন। অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতক দূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক তাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাণ্ডুভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনি উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেন না, উভয় অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণী-পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে নির্ম্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির কারণ—সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের বারস্ত্রীবশ্যতা জন্মে।

বঙ্গদেশের কৃষক

["বঙ্গদেশের কৃষকে" এ দেশীয় কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর নাই। জমীদারের আব সেরূপ অত্যাচার নাই। নূতন আইনে তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। কৃষকদিগেব অবস্থাবও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায়, প্রজাই অত্যাচাবী, জমীদার দুর্ব্বল। এই সকল কারণে আমি এতদিন এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এক্ষণে যে আমি ইহা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, তাহাব অনেকগুলি কাবণ আছে। (১) ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্য্যে লাগিতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহাব প্রথম সূত্রপাত, সুতবাং পুনর্মুদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওযা রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবর্ত্তিতই আছে। যতগুলি উৎপাতের কথা আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। (৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু যশোলাভ করিয়াছিল, এবং (৫) আমি বঙ্গদর্শনে "সাম্য" নামে একটি প্রবন্ধ বচনা করিয়া পশ্চাৎ তাহা পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। "বঙ্গদেশের কৃষক" আর পুনর্মুদ্রিত করিব না, বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ "সাম্য"-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই "সাম্য" শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি। সুতবাং "বঙ্গদেশের কৃষক" পুনর্মুদ্রিত করার আর একটা কারণ হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন্ কথা ভ্রান্তি, আব কোন্ কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। অতএব কোন প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না।]

প্রথম পরিচ্ছেদ—দেশের শ্রীবৃদ্ধি

আজি কালি বড গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এত কাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসনকৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের বড মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণি ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে

লাগিলে। যে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড, নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে ছেঁড়া কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট্, কৌচ্, ঝাড়, কাণ্ডেলাব্রা, মাব্‌বেল্, আলাবাষ্টার্,—কত বলিব? যে বাবু দূরবীণ কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল কলা ধূপ দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগ্য, চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ্ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্ব্বে হইলে, আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট্ নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচ্‌কচিতে মাতা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছ না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর!

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাতায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাতা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছে—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল?

আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয় জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, কাহার দোষ।

ব্রিটিশ্ অধিকারে রাজ্য সুশাসিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া যে দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরের যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়ও অনেক নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎকর্ত্তৃক দুর্ব্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন, সে দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থসঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবারপ্রতিপালনশক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসারধর্ম্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ্ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল, কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজন বাদে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে,—কেন না, অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে,—তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আর বেশী ভূমি আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখন চিরকাল জীবনধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা পূর্ব্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ্ শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাই? অনেকে বলিবেন, "টাকা"; তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকাটি ভারত-

ব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা। সে টাকা ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি বিবেচনা কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই—যথা, চাউল, রেশম, কার্পাশ, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে। ব্রিটিশ রাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এ দেশের বাণিজ্য বাড়িতেছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতি বৎসর চাষ বাড়িতেছে।

চাষ বৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি। যদি পূর্ব্বে ১০০ বিঘা জমী চাষ করিয়া বার্ষিক ১০০৲ টাকা পাইয়া থাকি, তবে ২০০ বিঘা চাষ করিলে, ন্যূনাধিক* ২০০৲ টাকা পাইব, ৩০০ বিঘা চাষ করিলে, ৩০০৲ টাকা পাইব। বঙ্গদেশে দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটা কথা আছে। সকলে মহাদুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার—দ্রব্য সামগ্রী বড় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। এই কথা নির্দ্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরাজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য, এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্ম্মাক্রান্ত যুগ—দেশ উৎসন্ন গেল। ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক, দ্রব্যের বর্ত্তমান সাধারণ দৌর্ম্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটি মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে, যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমত বুঝায় না যে, বস্তুতঃ চাউল বা ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রথম, কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয়, ফসলের মূল্যবৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া, আর ছয় টাকা, মোটে তিন টাকার স্থানে বার টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

---

* সমাজতত্ত্ববিদেরা বুঝিবেন, এখানে "ন্যূনাধিক" শব্দটি ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে, কিন্তু সাধারণপাঠ্য এই প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

এ ধন কৃষিজাতে—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায়, আমরা দেখাইতেছি।

কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। গত সন ১৮৭০।৭১ সালের যে বিজ্ঞাপনী কলিকাতা রেবিনিউ বোর্ড্ হইতে প্রচার হইয়াছে, তাহাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব লিখেন, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে প্রদেশে ২,৮৫,৮৭,৭২২ টাকা রাজস্ব ধার্য্য ছিল, সেই প্রদেশ হইতে এক্ষণে ৩,৫০,৪১,২৪৮ টাকা রাজস্ব আদায় হইতেছে। অনেকে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, যে কর চিরকালের জন্য অবধারিত হইয়াছে, তাহার আবার বৃদ্ধি কি? শক্ সাহেব বৃদ্ধির কারণ সকলও নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথ, তৌফির বন্দোবস্ত, লাখেরাজ বাজেআপ্ত, নূতন "পয়স্তি" ভূমির উপর কর সংস্থাপন, খাসমহলের কর বৃদ্ধি ইত্যাদি। অনেকে বলিবেন, ঐ সকল বৃদ্ধি যাহা হইবার হইয়াছে, আর বড় অধিক হইবে না। কিন্তু শক্ সাহেব দেখাইয়াছেন, এই বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে হইতেছে। পূর্ব্বাবধারিত করের উপর বেশী যাহা এক্ষণে গবর্ণমেন্ট্ পাইতেছেন—সাড়ে বাষট্টি লক্ষ টাকা—তাহা কৃষিজাত ধন হইতেই পাইতেছেন।

এ ধন অন্যান্য পথেও রাজভাণ্ডারে যাইতেছে। আফিমের আয়ের অধিকাংশই কৃষিজাত। কষ্টম্ হৌসের দ্বার দিয়াও রাজভাণ্ডারে কৃষিজাত অনেক ধন যায়।

শক্ সাহেব বলেন, এই কৃষিজাত ধনবৃদ্ধির অধিকাংশই বণিক্ এবং মহাজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। বণিক্ এবং মহাজন সম্প্রদায় যে ইহার কিয়দংশ হস্তগত করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে। এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে, কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভস্বরূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধির অধিকাংশই যে তাহাদের হস্তগত হয়, ইহা শক্ সাহেবের ভ্রমমাত্র। এ ভ্রম কেবল শক্ সাহেবের একার নহে। "ইকনমিষ্ট্" এই মতাবলম্বী। "ইকনমিষ্টের" ভ্রম "ইণ্ডিয়ান্ অবজর্বরের" নিকট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে তর্ক এখানে উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী, জমীদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশকুসুম মাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক্ বা না থাক্, জমীদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়। কয়জন প্রজা জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজানা স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমীদার বসাইবেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই বটে,* কিন্তু ইহা অনুভবের দ্বারা সিদ্ধ। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমীর খাজানা বাড়িবে। যে ভূমির আগে এক জন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুই জন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজানা দিবে, জমীদার তাহাকেই জমী দিবেন। রামা কৈবর্ত্তের জমীটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজানা দেয়। হাসিম শেখ সেই জমী

---

* যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন census হয় নাই।

চায়—সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে। জমীদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয় ত দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া সেও উঠিল। জমীদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে ন' কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে, দেশের অধিকাংশ ভূমির হার বৃদ্ধি হইয়াছে। আইন আদালতের আবশ্যক করে নাই—বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে বিঙ্গা পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমীর হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি, জমীদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমীদারের দয়া ধর্ম্ম আছে। আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমীদারের দয়া ধর্ম্ম—যখন আর স্ক্রু ফিরে না, তখন লোকের দয়া ধর্ম্মের আবিভাব হয়।* স্ক্রু ফিরাইয়া ফিরাইয়া, বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্দ্ধিত ধার্য্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমীদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ চতুর্গুণ হইয়াছে। কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমীদারী অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বরপ্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ, রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পায়েন, মহাজন পায়েন,—কৃষী কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দু বিসর্গমাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তার কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষকসম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাতার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরাব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় গান করিব না।

* আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, সকল ভূস্বামী এ চরিত্রের নহেন। অনেকের যথার্থ দয়া ধর্ম্ম আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জমীদার

জীবের শত্রু জীব ; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য ; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে ; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে ; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না ; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।

আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি। কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই। বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। যে সুহৃদ্গণের প্রীতি আমরা এ সংসারের প্রধান সুখের মধ্যে গণনা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে জমীদার। জমীদারেরা বাঙ্গালী জাতির চূড়া, কে না তাঁহাদিগের প্রীতিভাজন হইবার বাসনা করে? কিন্তু আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয়ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে, আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এই প্রবন্ধের জন্য হয় ত সমাজ-শ্রেষ্ঠ ভূস্বামিমণ্ডলীর বিরাগভাজন হইব—অনেকের নিকট তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত, উপহসিত, অমর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইব—বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইব। কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে, ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন, কাতরের হইয়া কাতরোক্তি না করে,—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,—যদি কোন প্রকার অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্য কথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক। যাঁহারা নীচ, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, আমরা ক্ষতি বিবেচনা করিব না। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন,—এই ভিক্ষা। আমরা জানিয়া শুনিয়া কোন অযথার্থোক্তি করিব না। বরং আমাদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিলে, কৃতজ্ঞ হইয়া তাহা স্বীকার করিব। যতক্ষণ না সে ভ্রম দেখিব, ততক্ষণ যাহা বলিব, মুক্ত-কণ্ঠেই বলিব।

আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা 'জমীদার সম্প্রদায়' সম্বন্ধে বলিতেছি না। যদি কেহ বলেন, জমীদার মাত্রেই দুরাত্মা বা অত্যাচারী, তিনি

নিতান্ত মিথ্যাবাদী। অনেক জমীদার সদাশয়, প্রজাবৎসল, এবং সত্যনিষ্ঠ। সুতরাং তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধপ্রকাশিত কথাগুলি বর্ত্তে না। কতকগুলি জমীদার অত্যাচারী; তাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য, আমরা সংক্ষেপের জন্য এ কথা আগেই বলিয়া রাখিলাম। যেখানে জমীদার বলিযাছি বা বলিব, সেইখানে ঐ অত্যাচারী জমীদারগুলিই বুঝাইবে। পাঠক মহাশয় 'জমীদার সম্প্রদায়' বুঝিবেন না।

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক আছে; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল, তাহা অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজানা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকি রহিল—অল্লাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি—তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহারও বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমিদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তি তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় তা না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸০ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নাএব গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নাএব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান রাখেন, নাএবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্ত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল। তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া, তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিফ", কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক,

পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, "পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটিছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন কাছারিতে রহিল। হয় ত পরাণের মা কিম্বা ভাই থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব্ ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কন্‌ষ্টেবল পাঠাইলেন। কন্‌ষ্টেবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল। কন্‌ষ্টেবল সাহেব একটু ধুমধাম করিতে লাগিলেন—কিন্তু "কয়েদ খালাসের" কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিন বার পার্ব্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্য চক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, "কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক—সে পুকুরধারে তালতলায় লুকাইয়াছিল—আমি ডাক দিবা মাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না"—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে" —অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধু গর্ভবতী হইয়াছে—অমনি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক, পুনর্ব্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল হয় নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা, মহালে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা

টাকার উপর ।০ দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে, দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমিদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় বড় কাল্‌লো কালো পাঁটা আনিয়া, মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বার্ত্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক-পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে "আগমনী," "নজর" বা "সেলামি" দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ৵০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্টাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে "ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, "পরাণ মণ্ডলেব নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।" গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম "ক্রোক সহায়তা"।

পরাণ দেখিল, সর্ব্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল—কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য ; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্টাম্পের মূল্য চাই ; উকীলের ফিস্ চাই ; আশামী সাক্ষী তলবানা চাই ; সাক্ষীর খোরাকি চাই ; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে ; হয় ত আমীন-খরচা লাগিবে ; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।—তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পাল্টা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত—স্নেহে নহে—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্‌মিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমী বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই এক জন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে, দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক নিয়ম নহে, এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে, অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটি যথার্থ ঘটনা বিবৃত করিয়া একখানি তালিকা উদ্ধৃত করিব।

যে প্রদেশ গত বৎসর* ভয়ানক বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই প্রদেশের একখানি গ্রামে এই ঘটনা হইয়াছিল। গ্রামের নাম যিনি জানিতে চাহেন, তিনি গত ৩১ আগষ্টের অব্‌জর্ব্বরের ১৩১ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। বন্যায় অত্যন্ত জলবৃদ্ধি হইল। গ্রামখানি সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় জলে ভাসিতে লাগিল। গ্রামস্থ প্রজাদিগের ধান সকল ডুবিয়া গেল। গোরু সকল অনাহারে মরিয়া যাইতে লাগিল। প্রজাগণ শশব্যস্ত। সে সময়ে জমীদারের কর্ত্তব্য, অর্থদানে, খাদ্যদানে প্রজাদিগের সাহায্য করা। তাহা দূরে থাক, খাজানা মাপ করিলেও অনেক উপকার হয়। তাহাও দূরে থাক, খাজানাটা দুদিন রহিয়া বসিয়া লইলেও কিছু উপকার হয়। কিন্তু রহিয়া বসিয়া খাজানা লওয়া দূরে থাক, গোমস্তা মহাশয়েরা সেই সময়ে পাইক পিয়াদার সঙ্গে বাজে আদায়ের জন্য আসিয়া দলবল সহ উপস্থিত হইলেন। গ্রামে মোটে ১২।১৪ জন

* সন ১২৭৮।

খোদকাস্ত প্রজা, এবং ১২।১৪ জন কৃষাণ প্রভৃতি অপর লোক। একটি তালিকা করিয়া ইহাদের নিকট ৫৪৶০ আদায় করিতে বসিলেন। সে তালিকা এই ;—

নায়েবের পুণ্যাহের নজর	...	...	৬৲
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের নজর	...	..	৫৲
গোমস্তাদিগের নজর	...	...	২৲
পুণ্যাহের পিয়াদার তলবান	..	...	১৲
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	..	...	১৲
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	...	...	৸/০
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদাব তলবানা	...	...	১।/০
নৌকা ভাড়া	..	..	১॥০
সদর আমলাব পূজার পার্ব্বণী	...	..	৬॥০
কাছারির জমাদার	...	...	১৲
ঐ হালশাহানা	...	...	১৲
পাঁচ শরিকের পার্ব্বণী	...	...	৫৲
শ্রীরাম সেন, হেড্ মুহুরি	...	...	১৲
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	...	...	২৲
গোমস্তাদের ভিক্ষা	...	...	১২৲
মুহুরিদের ভিক্ষা	...	..	৩৲
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্ব্বণী	...	...	১৲
ডাকটেক্স	...	...	৩৲
			৫৪৶০

এই দুঃখের সময়ে প্রজাদিগেব উপর টাকায় তিন আনা করিয়া বাজে আদায় পড়তা পড়িল। আদায় করা অসাধ্য ; কিন্তু গোমস্তারা অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকেন। প্রজারা কায়ক্লেশে মেঙ্গেপেতে, বেচে কিনে, হাওলাত বরাত করিয়া, ঐ টাকা দিল। লোকে মনে করিবে, মনুষ্যদেহে সহ্য অত্যাচারের চরম হইয়াছে। কিন্তু গোমস্তা মহাশয়েরা তাহা মনে করিলেন না। তাঁহারা জানেন, একটি একটি প্রজা একটি একটি কুবের। যে দিন টাকায় তিন আনা হারে ৫৪৶০ আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, তাহার ৪।৫ দিন মধ্যেই আবার উপস্থিত। বাবুদের কন্যার বিবাহ। আর ৪০ টাকা তুলিয়া দিতে হইবে।

প্রজারা নিরুপায়। তাহারা একখানা নৌকা সংগ্রহ করিয়া নীলকুঠিতে গিয়া কর্জ্জ চাহিল। কর্জ্জ পাইল না। মহাজনের কাছে হাত পাতিল—মহাজনও বিমুখ হইল।

তখন অগত্যা প্রজারা শেষ উপায় অবলম্বন করিল—ফৌজদারিতে গিয়া নালিশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আশামীদিগকে সাজা দিলেন। আশামীরা আপিল করিল, জজ সাহেব বলিলেন, "প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইয়াছে বটে, কিন্তু আইন অনুসারে আমি আশামীদিগকে খালাস দিলাম।" সুবিচার হইল। কে না জানে, বিচারের উদ্দেশ্য আশামী খালাস ?

এটি উপন্যাস নহে। আমরা ইণ্ডিয়ান্ অব্‌জর্ব্বর্ হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম। দুষ্ট লোক সকল সম্প্রদায়মধ্যেই আছে, দুই একজন দুষ্ট লোকের দুষ্কর্ম্ম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা অবিচার। যদি এ উদাহরণ সেরূপ হইত, তাহা হইলে ইহা আমরা প্রয়োগ করিতাম না। এ তাহা নহে—এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থা কিছুই জানেন না।

উপরে লিখিত তালিকার শেষ বিষয়টির উপর পাঠক একবার দৃষ্টিপাত করিবেন,—"ডাকটেক্স"। গবর্ণমেণ্ট নানাবিধ কর বসাইতেছেন, জমীদারেরা তাহা লইয়া মহা কোলাহল করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই কি ঘর হইতে টেক্স দিয়া থাকেন? ঐ "ডাকটেক্স" কথাটি তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট বিধান করিলেন, মফঃস্বলে ডাক চলিবে, জমীদারেরা তাহার খরচা দিবেন। জমীদারেরা মনে মনে বলিলেন, "ভাল, দিতে হয় দিব, কিন্তু ঘরে থেকে দিব না। আমরাও প্রজাদের উপর টেক্স বসাইব। যদি বসাইতে হইল, তবে একটু চাপাইয়া বসাই, যেন কিছু মুনাফা থাকে।" তাহাই করিলেন। প্রজার খরচে ডাক চলিতে লাগিল—জমীদারেরা মাঝে থাকিয়া কিছু লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন টেক্স বসান, একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, কাহার ঘাড়ে পড়ে।

ইন্‌কম্‌টেক্সও ঐরূপ। প্রজারা জমীদারের ইন্‌কম্‌টেক্স দেয়। এবং জমীদার তাহা হইতে কিছু মুনাফা রাখেন।

খাস মহল যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে রোড্ ফণ্ড্ দিতে হয়। ঐ রোড্ ফণ্ড্ আমরা ভূস্বামীর জমাওয়াশীল বাকিভুক্ত দেখিয়াছি।

রোড্‌সেস্ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট্ কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমীদারেরা কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় এক জন জমীদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিল, এবার আসামী "আইন অনুসারে" খালাস পাইল না। জমীদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নলিখিত "হাস্পাতালির" বৃত্তান্তটি কৌতুকাবহ। সব্‌ডিবিজনের হাকিমেরা স্কুল, ডিস্পেন্সরি করিতে বড় মজবুত। ২৪ পরগণার কোন আসিষ্টাণ্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ স্বীয় সব্‌ডিবিজনে একটি ডিস্পেন্সরি করিবার জন্য তৎপ্রদেশীয় জমীদারগণকে ডাকাইয়া সভা করিলেন। সকলে কিছু কিছু মাসিক চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইয়া গেলেন। একজন বাটী গিয়া হুকুম প্রচার করিলেন যে, "আমাকে মাসে মাসে এত টাকা হাস্পাতালের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, অতএব আজি হইতে প্রজাদিগের নিকট টাকায় /০ আনা হাস্পাতালি আদায় করিতে থাকিবে।" গোমস্তারা তদ্রূপ করিতে লাগিল। এদিকে ডিস্পেন্সরির সকল যোগাড় হইয়া উঠিল না—তাহা সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং ঐ জমীদারকে কখন এক পয়সা চাঁদা দিতে হইল না। কিন্তু

প্রজাদিগের নিকট চিরকাল টাকায় এক আনা হাস্পাতালি আদায় হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে জমীদার ঐ প্রজাদিগের খাজনার হার বাড়াইবার জন্য ১৮৫৯ সালের দশ আইনের নালিশ করিলেন। প্রজারা জবাব দিল যে, "আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এক হারে খাজানা দিয়া আসিতেছি—কখন হার বাড়ে কমে নাই—সুতরাং আমাদিগের খাজানা বাড়িতে পারে না।" জমীদার তাহার প্রত্যুত্তর এই দিলেন যে, উহারা অমুক সন হইতে হাস্পাতালি বলিয়া ৴০ খাজানা বেশী দিয়া আসিতেছে। সেই হেতুতে আমি খাজানা বৃদ্ধি করিতে চাই।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে, তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমত-বিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর ২৫ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত টাকা আসে না, অথচ জমীদারী চাল-চলনে চলিতে হইবে, মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজনা আদায় করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইঁহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া, তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতে তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকই জমিদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক

স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদির সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্নজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারদের ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিএশন্—জমীদারদের সমাজ। তদ্দ্বারা দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না বা হইবারও সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদার-দিগের কেবল নিন্দা করা অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত। যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রসংশোধনজন্য যত্ন করেন। জমীদারসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা, আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত। অপর জমীদারদিগের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত, সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে, অনেক দুর্ব্বৃত্ত জমীদার দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিবে। এ কথার প্রতি মনোযোগ করিবার জন্য আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিএশন্‌কে অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা কুচরিত্র জমীদারগণকে শাসিত করিতে পারেন, তবে দেশের যে মঙ্গল সিদ্ধ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইবে। এবং তাঁহাদিগের দেশ উচ্চতর সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিবে। এ কাজ না হইলে, বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলের কোন ভরসা নাই। যাঁহা হইতে এই কার্য্যের সূত্রপাত হইবে, তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইবেন। কি উপায়ে এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা অবধারিত করা কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। উক্ত সমাজে কার্য্যাধ্যক্ষগণ যে এ বিষয়ে অক্ষম, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। তাঁহারা সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বহুদর্শী, এবং কার্য্যক্ষম। তাঁহারা ঐকান্তিকচিত্তে যত্ন করিলে অবশ্য উপায় স্থির হইতে পারে। আমরা যাহা কিছু এ বিষয়ে বলিতে পারি, তদপেক্ষা তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারু প্রণালী আবিষ্কৃত হইতে পারিবে বলিয়াই আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিলাম না। যদি আবশ্যক হয়, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা আইসে, তাহা বলিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে কেবল এই বক্তব্য যে, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অনুরাগহীনতা দেখাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগেরও অখ্যাতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—প্রাকৃতিক নিয়ম

আমরা জমীদারের দোষ দিই বা রাজার দোষ দিই, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অবনতি ধারাবাহিক; যত দিন হইতে ভারতবর্ষের সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় তত দিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দ্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্যেরা কথায় বলেন, একদিনে রোমনগরী নির্ম্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের দুর্দ্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, হিন্দুরাজার রাজ্যকালে রাজা কর্ত্তৃক প্রজাপীড়ন হইত না; কিন্তু তাহাতে এমন বুঝায় না যে, তৎকালে প্রজাদিগের বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। এখন রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ অনেক জমীদারে প্রজাপীড়ন করেন; তখন আর এক শ্রেণীর লোকে পীড়িত করিত। তাহারা কে, তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। বঙ্গদেশের কৃষকের অবস্থানুসন্ধানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অদ্য যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা যত দূর বঙ্গদেশের প্রতি বর্ত্তে, সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি তত দূর বর্ত্তে। বঙ্গদেশে তৎসমুদায়ের যে ফল ফলিয়াছে, সমগ্র ভারতে সেই ফল ফলিয়াছে। বঙ্গদেশ ভারতের একটি খণ্ডমাত্র বলিয়া তথায় সেই ফল ফলিয়াছে। এবং সেই ফল কেবল কৃষিজীবীর কপালেই ফলিয়াছে, এমত নহে; শ্রমজীবীমাত্রেই সমভাগে সে ফলভোগী। অতএব আমাদিগের এই প্রস্তাব, ভারতীয় শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে, অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল আলোচনার কালে স্মরণ রাখা না রাখা সমান।

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বকল কর্ত্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে। বকল্ বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না। কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয়, তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহই জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথমে আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবেন। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমজীবীরা সকলেই কেবল আত্মভরণ-পোষণের যোগ্য খাদ্যোৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না। কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব।

উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিশেষে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলিন স্বাভাবিক নিয়মের উপব নিভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই। আমরা এতদংশ বকলের গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিতেছি; কৌতূহলাবিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থে দেখিবেন যে, যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বকল এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যকতা হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্য অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজনের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্ব্বন্ অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্ব্বন্। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক—বনজের অধিক আবশ্যক। বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণ দেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ এবং তথায় ভূমিও উর্ব্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকালেই সভ্যতাব অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জ্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না,—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্ হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহারাই কেবল সাবকাশ; সুতরাং

চিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদের হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়,—এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যুপজীবীর। প্রথম ভাগ, "মজুরির বেতন", দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাফা"।* আমরা "বেতন" ও "মুনাফা", এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "মুনাফা" বুদ্ধ্যুপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন "মুনাফা"র কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি "বেতন", সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফা"র মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা; তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ "বেতন", পঞ্চাশ লক্ষ "মুনাফা"। মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা "বেতন", পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা "মুনাফা", তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণপোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দ্দশা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনও বৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা, ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোদ্যমেই তাহাই ঘটিল।

* "ভূমির কর" এবং "সুদ" ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম না।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার একটি একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দ্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত দেশের লোক কতক শেষোক্ত দেশে যাউক,—তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে, এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশসকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়, বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে, তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দ লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্ব্বাহের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে নাই। উষ্ণতা শরীরের শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন উৎসাহ, উদ্যোগ, এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষ, প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ, এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য ঔপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহপ্রবৃত্তির দমন বিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক, না হউক, ক্ষুধা-নিবৃত্তি এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতাভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তিদমনে প্রজা পরাঙ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্ট হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দ্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতিরই ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য

অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম, ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বেই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়।

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে ধনলিপ্সা সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির মূলীভূত মনুষ্যহৃদয়ের দুইটি বৃত্তি; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা। দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি, স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History of Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কাদাচিৎক, ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ; এ জন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাস আচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সর্ব্বদাই নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্ব্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যক বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখস্বচ্ছন্দের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হয়। উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তিসকলের অভাব হয়। অতএব যে "সন্তোষ" কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে তাপের কারণ অধিককাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণ

পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যকতা হয় না বলিয়া, তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্ব্বকালীন তাদৃক্ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন য়ুনানী সাহিত্য, য়ুনানী দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে ঐ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল, আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থাজন্যা নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।

৩। এই সকল কারণে শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধন সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমন সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্র অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দ্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যক সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্যদেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাব-শূন্য, নিজশ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিক্‌দিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ

কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ব্বরভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল,—তাহার কিছুই হয় নাই। অদ্য কয়েক বৎসর তাহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। বাণিজ্য হানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা—ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজঃ এবং রাজপ্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশেব প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যগ্র, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীর্ত্তিত বলশালী, ধর্ম্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রৈণ, অকর্ম্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। বিরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক বিরোধের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু বিরোধে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। নিত্য মল্লযুদ্ধে বল বাড়ে। বিরোধে মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। নির্ব্বিরোধে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে প্লিবিয়ান্‌দিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমন্‌দিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে ব্রাহ্মণের প্রথমে প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তিহানি হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়। উপধর্ম্ম ভীতিজাত ; এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্টকারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম। অতএব অপর বর্ণত্রয়, মানসিকশক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম্মপীড়িত হইল ; ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক ; সুতরাং তাহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল—নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এ দিকে রাজশাসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে

কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে; তোমার জন্মমৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না; যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।" জালের এইরূপ সূত্র।* কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়; কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মানুষের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়ম-জালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি লুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি অবতারণা করিয়াছিলেন, তিনি বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানস ক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

আমরা দেখাইলাম যে, দুইটি প্রকৃতিক কারণে ভারতবর্ষের শ্রমোপজীবীদের চিরদুর্দ্দশা। প্রথম ভূমির উর্ব্বরতাধিক্য, দ্বিতীয় বায়ু-আদির তাপাধিক্য। এই দুই কারণে অতি পূর্ব্বকালেও ভারতবর্ষে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কারণে বেতন অল্প হইয়া উঠিল। এবং গুরুতর সামাজিক তারতম্য উপস্থিত হইল। ইহার পরিণাম, প্রথম, শ্রমোপজীবীদিগের (১) দারিদ্র্য, (২) মূর্খতা, (৩) দাসত্ব। দ্বিতীয়, এই দশা একবার উপস্থিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মবলেই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। তৃতীয়, সেই দুর্দ্দশা ক্রমে সমাজের অন্য সকল সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল। এক স্রোতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, একত্রে নিম্নভূমে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুর্ব্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ, রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালিতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্ক্রিয়া না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্ব্বরতা বা অন্য বাহ্য প্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্ত্তন হইত না।

* টাকাটার উল্টা পিঠ আমি ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছি। উত্তর মতই সত্যমূলক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আইন

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে দরিদ্র—অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহা কেবল জমীদারের দোষ নহে। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে নহে। জমীদারের দোষ, প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, রাজবিধির দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। দুর্ব্বলের উপর পীড়ন করা বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান্ হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা। যদি কোন রাজ্যে দুর্ব্বলকে বলবানে পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্ত্তব্যসাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মুখ। যদি এ দেশে জমীদারে কৃষককে পীড়িত করেন, ইহা সত্য হয়, তবে তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অবশ্য দোষ আছে। দেখা যাউক, তাঁহার আপন কর্ত্তব্য সাধন পক্ষে কি করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইত, কেহ তাহাদিগকে মাঙ্গন মাথট পার্ব্বণীর জন্য জ্বালাতন করিত না। হিন্দুরা স্বজাতির রাজ্যকালের পুরাবৃত্ত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু অসংখ্য অন্যবিষয়ক গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন ছিল না। যাঁহারা মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়ের প্রজাপীড়ন এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বিবেচনা করেন যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণও এইরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন, তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থমধ্যে প্রজাপীড়নের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। যদি প্রজাপীড়নের প্রাবল্য থাকিত, তবে অবশ্য দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যাদিতে তাহার চিহ্ন থাকিত, কেন না, সাহিত্য এবং স্মৃতি সমাজের প্রতিকৃতি মাত্র। প্রজাপীড়ন দূরে থাকুক, বরং সেই প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, হিন্দু রাজারা বিশেষ প্রজাবৎসল ছিলেন। রাজা পিতার ন্যায় প্রজাপালন করেন, এই কথা সংস্কৃত গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। সুতরাং অন্যান্য জাতীয় রাজাদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহাদের গৌরব। য়ুনানী রাজগণের নামই ছিল "Tyrant", সে শব্দের আধুনিক অর্থ প্রজাপীড়ক। ইংলণ্ডীয় রাজগণ প্রজাপীড়ক বলিয়া প্রজাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বিবাদ হইত; একজন রাজা প্রজাকর্ত্তৃক পদচ্যুত, অন্য একজন নিহত হন। ফ্রান্স্ প্রজাপীড়নের জন্যই বিখ্যাত, এবং অসহ্য প্রজাপীড়নের জন্যই ফরাসীবিপ্লবের সৃষ্টি। ভারতবর্ষে উত্তরগামী মুসলমান এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রজাপীড়নের উল্লেখ মাত্র যথেষ্ট। কেবল প্রাচীন হিন্দু রাজগণের এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব। তাঁহারা কেবল ষষ্ঠাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজ্যশাসনে সুপারগ ছিলেন না। যেখানে হিন্দু রাজগণ অবলীলাক্রমে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন, মুসলমানেরা সেখানে কর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা পরগণায় পরগণায় এক এক ব্যক্তিকে করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিলেন। তাহারা এক প্রকার করসংগ্রহের কন্ট্রাক্টর্ হইল। রাজার রাজস্ব আদায় করিয়া দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহাদিগের লাভ থাকিবে। ইহাতেই জমীদারীর সৃষ্টি,

এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে প্রজাপীড়নের সৃষ্টি। এই কন্ট্রাক্টরেরাই জমীদার। রাজার রাজস্বের উপর যত বেশী আদায় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের লাভ। সুতরাং তাঁহারা প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বেশী আদায় করিতে লাগিলেন। প্রজার যে সর্ব্বনাশ হইতে লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য।

তাহার পর ইংরাজেরা রাজা হইলেন। তাঁহারা যখন রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই অবস্থা। তাঁহাদিগের দুরবস্থা মোচন করিবার জন্য ইংরাজদিগের ইচ্ছার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু লর্ড্ কর্ণ্‌ওয়ালিস্ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরও গুরুতর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপীড়ক না হইয়া প্রজাপালক হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কন্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী, জমীদারেরা কস্মিন্ কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণ্‌ওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্ কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এই বন্দোবস্ত "চিরস্থায়ী"।

কর্ণ্‌ওয়ালিস্ প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্ত্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেই জন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না। কেবল বলিলেন যে, "প্রজা প্রভৃতির রক্ষার্থ ও মঙ্গলার্থ গবর্ণর জেনেরেল্ যে সকল নিয়ম আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা যখন উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিবেন, তখনই বিধিবদ্ধ করিবেন। তজ্জন্য জমীদার প্রভৃতি খাজানা আদায় করার পক্ষে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।"*

"বিধিবদ্ধ করিবেন" আশা দিলেন, কিন্তু করিলেন না। প্রজারা পুরুষানুক্রমে জমীদার কর্ত্তৃক পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজ কিছুই করিলেন না। প্রজাদিগের দ্বিতীয়বার অশুভগ্রহ। ১৮১৯ সালে কোর্ট্ অব্ ডিরেক্টরস্ লিখিলেন, "যদিও সেই বন্দোবস্তের পর এত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎকালে প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ এবং সামঞ্জস্য করিবার যে অধিকার হাতে রাখিয়াছিলাম, তদনুযায়ী অদ্যাপি কিছুই করা হইল না।" এই আক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। ১৮৩২ সালে কাম্বেল নামক একজন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী লিখিলেন, "এ অঙ্গীকার অদ্যাপি রাজকীয় ব্যবস্থামালার শিরোভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট্ গ্রাম্য ভূস্বামী (প্রজা)-

* ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৮ ধারা।

দিগের অগ্রে জমীদারকে দাঁড় করাইয়া, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়াছেন। সুতরাং সে অঙ্গীকার মত কর্ম্ম করেন নাই।"

বরং তদ্বিপরীতই করিলেন। দুর্ব্বলকে আরও দুর্ব্বল করিলেন, বলবান্‌কে আরও বলবান্ করিলেন। ১৮১২ শালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট, যে কোন হারে খাজানা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরেরা স্বয়ং এই অর্থ করিলেন,† সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখ জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।

এই ১৮১২ শালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত "পঞ্জম"। যদি কেহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে "পঞ্জম" করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই। "কোরোক" কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমারা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ শালের ৫ আইনও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল।‡ জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

পরে ১৮১২ শালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দ্বারা আরও স্পষ্টীকৃত হইল। ডিরেক্টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকেও নিরিকের বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।§

তাহার পর সন ১৮৫৯ শাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ শালে বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম-সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণ্‌ওয়ালিস্ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড্ কানিঙ্ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণই শেষ।** তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ শালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপিমাত্র।***

১৮৫৯ শালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন

---

† Revenue Letter to Bengal, 9th May, 1821, para 54.

‡ সন ১৭৯৩ সালের ১৮ আইনের ২ ধারা।

§ Revenue Letter, 9th May, 1821, para 54.

** যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন নূতন Tenancy Act প্রচারিত হয় নাই।

*** এই সকল তত্ত্ব যাঁহারা সবিস্তারে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গীয় প্রজা" (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। আমরা এ প্রবন্ধের অংশের কতক কতক সেই গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়াছি।

আইনের দ্বারা হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজানা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এ আইনের সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইত পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।

তথাপি এইটুকু মাত্র প্রজার পক্ষতা দেখিয়া প্রজাদ্বেষী, স্বার্থপর কোন কোন জমীদার কতই কোলাহল করিয়াছিলেন! অদ্যাপি করিতেছেন!

আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ্ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতি বারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?

ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রিটিশ্ রাজপুরুষেরা প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা প্রজার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেওয়ানী পাইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কিসে সাধারণ প্রজার হিত হয়, ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাঁহাদিগের চেষ্টা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা বিদেশী; এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া এই মহৎ অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর কথা আছে। ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড সঙ্কুচিত; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জন কয়েক ইংরাজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য লোপ হইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্টালিকার ছায়াতলে লক্ষ লক্ষ প্রজার উপর পীড়ন হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া আনিতেছেন, কয়েদ করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফশল লুটিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতীকার হয় না কেন? কেহ বলিবেন, তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, তবে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্ব্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক!—ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক!—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

কেন যে আইন আদালতে কৃষকের উপকার নাই, তাহার একটি কারণ আমরা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ, মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি প্রকার ব্যয়, তাহার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যায় দিয়াছি, পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। যাহা ব্যয়সাধ্য, তাহা দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা তদ্দ্বারা সচরাচর উপকৃত হয় না; বরং তদ্বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। জমীদার ধনী, আদালতের খেলা তিনি খেলিতে পারেন। দোষে হউক, বিনা দোষে হউক, তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষককে আদালতে উপস্থিত করেন। তথায় ধনবানেরই জয়, সুতরাং কৃষকের দুর্দ্দশা ঘটে, অতএব আইন আদালত, কৃষককে পীড়িত করিবার, ধনবানের হস্তে আর একটি উপায় মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ, আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পাবে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, তাহাতে ইহাদের অনেক কার্য্য ক্ষতি হয়, এবং অনেক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। কৃষক গোমস্তার নামে নালিশ করিতে গেল, সেই অবসরে গোমস্তার বাধ্য লোকে তাহার ধান চুরি করিয়া লইয়া গেল, না হয় আর একজন কৃষক গোমস্তার নিকট হইতে পাট্টা লইয়া তাহার জমীখানি দখল করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশের লোক, বিশেষ ইতর লোক অত্যন্ত আলস্যপরবশ। শীঘ্র নড়ে না, সহজে উঠে না, কোন কার্য্যেই তৎপরতা নাই। দূরে যাইতে চাহে না। কৃষক বরং জমীদারের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিবে, তথাপি দূরে গিয়া তাহার প্রতীকার করিতে চাহে না। যাঁহারা বিচারকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের বিচারালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেরই মোকদ্দমা অনেক; দূরের মোকদ্দমা প্রায় হয় না। অতএব বিচারক নিকটে থাকিলে যে অত্যাচারের শাসন হইত, দূরে থাকায় সে অত্যাচারের শাসন হয় না। ইহার আর একটি ফল এই হইয়া উঠিয়াছে যে, অত্যাচারী গোমস্তারাই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন এক জন কৃষক অপরের উপর দৌরাত্ম্য করে, তখন তাহার নালিশ জমীদারের গোমস্তার কাছে হয়। যখন গোমস্তা নিজে অত্যাচার করে, তাহার নালিশ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়ক, এবং চারি পয়সার লোভে সকল প্রকার অত্যাচার করিতে প্রস্তুত, তাহার হাতে বিচারকার্য্য থাকায় দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমানে বুঝিবেন।

তৃতীয়তঃ, বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার, সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলিয়া বোধ হয় না। গোমস্তায় কৃষকের ধান উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে, কৃষক আদালতে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিশ করিল। যদি বড় কপাল-জোরে সে ডিক্রী পাইল, তবে সে এক বৎসরে। আপীলে আর এক বৎসর। যদি আত্যন্তিক সৌভাগ্যগুণে আপীলে ডিক্রী টিকিল, এবং ডিক্রীজারিতে টাকা আদায় হইল, তবে সে আর এক বৎসরে। বাদীর কুড়ি টাকার ধান ক্ষতি হইয়াছিল, ডিক্রীজারি করিয়া খরচ খরচা বাদে তিন বৎসর পরে পাঁচ টাকা আদায় হইল। এরূপ প্রতীকারের আশায় কোন্ কৃষক জমীদারের নামে নালিশ করিবে?

বিলম্বে বিচারকের দোষ নাই। আদালতের সংখ্যা অল্প—যেখানে তিন জন বিচারক হইলে ভাল হয়, সেখানে একজন বৈ নাই। সুতরাং মোকদ্দমা নিষ্পন্ন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যায়। আর প্রচলিত আইন অত্যন্ত জটিল। বিচারপ্রণালীতে অত্যন্ত লিপি-

বাহুল্যের এবং অত্যন্ত কার্য্যবাহুল্যের আবশ্যকতা। আজ এ মোকদ্দমার প্রতিপক্ষের উকীলের জেরার বাহুল্যে একটি মোকদ্দমার একটি সাক্ষী মাত্র বিদায় হইল ; সুতরাং আর পাঁচটি মোকদ্দমার কিছু হইল না, আর এক মাস বাদে তাহার দিন পড়িল। কাল নিষ্প্রয়োগ্য মোকদ্দমার একটি নিষ্প্রয়োজনীয় সাক্ষী অনুপস্থিত, তাহার উপর দস্তক করিতে হইল। সুতরাং মোকদ্দমা আর এক মাস পিছাইয়া গেল। এ সকল না করিলে বিচার আইনসঙ্গত হয় না। নিষ্পত্তি আপীলে টিকে না। বিচারে বিলম্ব হয়, তাহাও স্বীকার,—অবিচার হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি কলিকাতার তৈয়ারি আইন ঘৃণাক্ষরে লঙ্ঘন করা যাইতে পারে না। ইংরাজি আইনের মর্ম্ম এই।

আমরা যে সভ্য হইতেছি, দিন দিন যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা তাহার একটি পরিচয়। আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন ভাল আইন আসিয়াছে। জাহাজে আমদানি হইয়া, চাঁদপালের ঘাটে ঢোলাই হইয়া, কলিকাতার কলে গাঁটবন্দী হইয়, দেশে দেশে কিছু চড়া দামে বিকাইতেছে। তাহাতে ওকালতি, হাকিমি, আমলাগিরি প্রভৃতি অনেকগুলি আধুনিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাপারীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যের প্রশংসা করিতে করিতে অধীর হইতেছেন। গলাবাজির জোরে, আগে যাঁহাদের অন্ন হইত না, এখন তাঁহারা বড় লোক হইতেছেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা নাই, সর্ব্বত্র আইনমত বিচার হইতেছে। আর কেহ বেআইনি করিয়া সুবিচার করিতে পারে না। তাহাতে দীন দুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, সুবিচার চায়। সে কেবল তাহাদিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র।

মনে কর, গোমস্তা, কি অপর কেহ কোন দুঃখী প্রজার উপর কোন গুরুতর দৌরাত্ম্য করিল। গোমস্তা সেশুনের বিচারে অর্পিত হইল। সেশুনের বিচারে সাক্ষীদিগের সত্য কথায় প্রতিবাদীর অপরাধ প্রমাণ হইল। কিন্তু বিচার জুরির হাতে। জুরর মহাশয়েরা এ কাজে নূতন ব্রতী ; প্রমাণ অপ্রমাণ কিছু বুঝেন না। যখন সাক্ষীর জোবানবন্দী হইতেছিল, তখন তাঁহারা কেহ কড়ি গণিতেছিলেন, কেহ দোকানের দেনা পাওনা মনে মনে নিকাশ করিতেছিলেন, কেহ বা অল্প তন্দ্রাভিভূত। উকীল যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা কিঞ্চিৎ ক্ষুধাতুর, গৃহে গৃহিণী কিরূপ জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। জজ সাহেব যখন দুর্বোধ্য বাঙ্গালায় "চার্য্য" দিতেছিলেন, তখন তাঁহারা মনে মনে জজ সাহেবের দাড়ির পাকা চুলগুলিন গণিতেছিলেন। জজ সাহেব যে শেষে বলিলেন, "সন্দেহের ফল প্রতিবাদী পাইবে," তাহাই কেবল কানে গেল। জুরর মহাশয়দিগের সকলই সন্দেহ—কিছুই শুনেন নাই, কিছুই বুঝেন নাই ; শুনিয়া বুঝিয়া একটা কিছু স্থির করা অভ্যাস নাই, হয় ত সে শক্তিও নাই, সুতরাং সন্দেহের ফল প্রতিবাদীকেই দিলেন। গোমস্তা মহাশয় খালাস হইয়া আবার কাছারিতে গিয়া জমকিয়া বসিলেন। ভয়ে বাদী সবংশে ফেরার হইল। যাহারা দোষীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গোমস্তা তাহাদের ভিটামাটি লোপ করিলেন। আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম—কেন না, জুরির বিচার হইয়াছে—বিলাতি প্রথানুসারে বিচার হইয়াছে—আমরা বড় সভ্য হইয়া উঠিয়াছি।

বর্ত্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা অবিচারের চতুর্থ কারণ।

পঞ্চম কারণ, বিচারকবর্গের অযোগ্যতা। এদেশের প্রধানতম বিচারকেরা সকলেই ইংরাজ। ইংরাজেরা সচরাচর কার্য্যদক্ষ, সুশিক্ষিত, এবং সদনুষ্ঠাতা। কিন্তু তাহা হইলেও বিচারকার্যে তাঁহাদিগের তাদৃশ যোগ্যতা নাই। কেন না, তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা তাদৃশ অবগত নহেন, এ দেশের লোকের চরিত্র বুঝেন না, তাহাদিগের সহিত সহৃদয়তা নাই, এবং অনেকে এ দেশেব ভাষাও ভাল করিয়া বুঝেন না। সুতরাং সুবিচার করিতে পারেন না। বিচারকার্য্যের জন্য যে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক, তাহা অনেকেরই হয় নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অধিকাংশ মোকদ্দমাই অধস্তন বিচারকের দ্বারা নিপন্ন হইয়া থাকে, এবং অধিকাংশ অধস্তন বিচারকই এ দেশীয়,—তবে উপরিস্থ জন কতক ইংরাজ বিচাবকের দ্বাবা অধিক বিচারহানি সম্ভবে না। ইহার উত্তর, প্রথমতঃ, সকল বাঙ্গালী বিচারকই বিচারকার্য্যের যোগ্য নহেন। বাঙ্গালী বিচারকের মধ্যে অনেকে মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি, অশিক্ষিত, অথবা অসৎ। এ সম্প্রদায়ের বিচারক সৌভাগ্যক্রমে দিন দিন অল্পসংখ্যক হইতেছেন। তথাপি বিশেষ সুযোগ্য বাঙ্গালীরা বিচারক শ্রেণীভুক্ত নহেন। ইহার কারণ, এ দেশীয় বিচারকের উন্নতি নাই, পদবৃদ্ধি নাই; যাঁহারা ওকালতি করিয়া অধিক উপার্জ্জনে সক্ষম, সে সকল ক্ষমতাশালী লোক বিচারকের পদের প্রার্থী হযেন না। সুতরাং সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর লোক এবং অধম শ্রেণীর লোকই ইহাতে প্রবৃত্ত হযেন। দ্বিতীয়তঃ, অধস্তন বিচারকে সুবিচার করিলে কি হইবে? আপীলে চূড়ান্ত বিচার ইংরাজের হাতে। নীচে সুবিচার হইলেও উপরে অবিচার হয়, এবং সেই অবিচারই চূড়ান্ত। অনেক বিচারক সুবিচার করিতে পারিলেও আপীলের ভয়ে করেন না; যাহা আপীলে থাকিবে, তাহাই করেন। এ বিষয়ে হাইকোর্ট্ অনেক সময় বিশেষ অনিষ্টকর। তাঁহারা অধস্তন বিচারকবর্গকে বিচার-পদ্ধতি দেখাইয়া দেন, আইন বুঝাইয়া দেন;—বলেন, এইরূপে বিচার করিও, এই আইনের অর্থ এইরূপ বুঝিও। অনেক সময়ে এই সকল বিধি ভ্রমাত্মক—কখন কখন হাস্যাস্পদও হইয়া উঠে। কিন্তু অধস্তন বিচারকদিগকে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা ভাল বুঝেন, এমন সুবর্ডিনেট্ জজ্, মুন্সেফ্ ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ অনেক আছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অবিজ্ঞদিগের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়।

এই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হইলে পর "সমাজদর্পণ" নামে একখানি অভিনব সংবাদপত্র দৃষ্টি করিলাম। তাহাতে "বঙ্গদর্শন ও জমীদারগণ" এই শিরোনামে একটি প্রস্তাব আছে, আমাদিগের এই প্রবন্ধের পূর্ব্বপরিচ্ছেদের উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি; কেন না, লেখক যেরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, অনেকেই সেইরূপ বিবেচনা করেন বা করিতে পারেন। তিনি বলেন,—

"একেই ত দশশালা বন্দোবস্তের চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করা হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের মত দুই এক জন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ বাঙ্গালীর অনুমোদন বুঝিলে কি আর রক্ষা আছে?"

আমরা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি যে, দশশালা বন্দোবস্তের ধ্বংস আমাদিগের কামনা নহে বা তাহার অনুমোদনও করি না। ১৭৯৩ শালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজেরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারতমণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরাজদিগকে দিই না। যে দিন ইংরাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সমাজের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব, সেই দিন সে পরামর্শ দিব। এবং ইংরাজেরাও এমন নির্ব্বোধ নহেন যে, এমত গর্হিত এবং অনিষ্টজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। আমরা কেবল ইহাই চাহি যে, সেই বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যত দূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহাই হউক। কথিত লেখক লিখিয়াছেন যে, "যাহাতে দশশালা বন্দোবস্তের কোনরূপ ব্যাঘাত না হইয়া জমীদার ও প্রজা, উভয়েরই অনুকূলে এরূপ সুব্যবস্থা সকল স্থাপিত হয় যে, তদ্দ্বারা উভয়েরই উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াই কর্ত্তব্য।" আমরা তাহাই চাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আমরা কর্ণ্‌ওয়ালিসের বন্দোবস্তকে ভ্রমাত্মক, অন্যায়, এবং অনিষ্টকারক বলিয়াছি বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যে, ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান্ করিয়াছেন, এবং করবৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দূষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সুবিবেচনার কাজ, ন্যায়সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দ্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।

লেখক আরও বলেন ;—

"আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা দেশ নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়িয়াছে। * * সকলেই বলে, আমাদের দেশের টাকা আমাদের দেশে থাকিতেছে না, বিদেশীয় বণিক্ ও রাজপুরুষেরা প্রায়ই লইয়া যাইতেছেন। যদি মহাত্মা কর্ণ্‌ওয়ালিস্ জমীদারদিগের বর্ত্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েক জন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

সাধারণতঃ অনেকেই এই কথা বলেন, সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদিগের বিবেচনায় যে কয়েকটি ভ্রম আছে, তাহা দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

১। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ব্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার

অনেক প্রমাণ আছে। "বঙ্গদেশের কৃষকের" প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কোন কোন প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছি। তদতিরিক্ত এক্ষণে বলিবার আবশ্যক নাই।

২। বিদেশী বণিক্ ও রাজপুরুষে দেশের টাকা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে দেশে টাকা থাকিতেছে না, এই প্রসঙ্গের মধ্যে প্রথমে বিদেশীয় বণিক্‌দিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের সচরাচর তাৎপর্য্য বোধ হয়, এই যে, বণিকেরা এই দেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, সুতরাং এই দেশের টাকা লইতেছেন বৈ কি? যে টাকাটা তাঁহাদের লাভ, সে টাকা, এ দেশের টাকা। বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় বণিকেরা যে লাভ করেন, তাহা দুই প্রকারে; এক আমদানিতে, আর এক রপ্তানিতে। এদেশের দ্রব্য লইয়া গিয়া দেশান্তরে বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। দেশান্তরে দ্রব্য আনিয়া এ দেশে বিক্রয় করেন, তাহাতেও তাঁহাদের কিছু মুনাফা থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার লাভ নাই।

এ দেশের সামগ্রী লইয়া গিয়া বিদেশে বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা করেন, সহজেই দেখা যাইতেছে যে, সে মুনাফা এ দেশের লোকের নিকট হইতে লয়েন না। যে দেশে তাহা বিক্রয় হয় সেই দেশের টাকা হইতে তাহার মুনাফা পান। এখানে তিন টাকা মণ চাউল কিনিয়া বিলাতে পাঁচ টাকা মণ বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা করিলেন, তাহা এ দেশের লোককে দিতে হইল না; বিলাতের লোকে দিল। বরং এ দেশের লোকে আড়াই টাকা পড়তার চাউল তাঁহাদের কাছে তিন টাকা বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা করিল। অতএব বিদেশীয় বণিকেরা এদেশীয় সামগ্রী বিদেশে বিক্রয় করিয়া এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বরং কিছু দিয়া গেলেন।

তবে ইহাই স্থির যে, তাঁহারা যদি কিছু এ দেশের টাকা ঘরে লইয়া যান, তবে সে দেশান্তরের জিনিস এ দেশে বিক্রয় করিয়া তাহার মুনাফায়। বিলাতে চারি টাকার থান কিনিয়া এ দেশে ছয় টাকায় বিক্রয় করিলেন; যে দুই টাকা মুনাফা হইল, তাহা এ দেশের লোকে দিল। সুতরাং আপাততঃ বোধ হয় বটে যে, এ দেশের টাকাটা তাঁহাদের হাত দিয়া বিদেশে গেল। দেশের টাকা কমিল। এই ভ্রমটি কেবল এ দেশের লোকের নহে। ইউরোপের সকল দেশেই ইহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকের মন আচ্ছন্ন ছিল, এবং তথায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণ লোকের মন হইতে ইহা অদ্যাপি দূর হয় নাই। ইহার যথার্থ তত্ত্ব এত দুরূহ যে, অল্পকাল পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। রাজগণ ও রাজমন্ত্রিগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়া, বিদেশের সামগ্রী স্বদেশে যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতেন। এবং সেই প্রবৃত্তির বশে বিদেশ হইতে আনীত সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক বসাইতেন। এই মহাভ্রমাত্মক সমাজনীতিসূত্র ইউরোপে (Protection) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তদুচ্ছেদপূর্ব্বক আধুনিক অনর্গল বাণিজ্য-প্রণালী (Free Trade) সংস্থাপন করিয়া ব্রাইট্ ও কব্‌ডেন চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ফ্রান্সে তাহা বিশেষরূপে বদ্ধমূল করিয়া, তৃতীয় নাপোলিয়নও প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। তথাপি এখন ইউরোপে

অনেকের এ ভ্রম দূর হয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে সে ভ্রম থাকিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? Protection হইতে ইউরোপে কি অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বক্লের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। যিনি তাহার অসত্যতা বুঝিতে চাহেন, তিনি মিল পাঠ করিবেন। ঈদৃশ দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইবার স্থান, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষভাগে হইতে পারে না। আমরা কেবল গোটাকত দেশী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

আমরা ছয় টাকা দিয়া বিলাতি থান কিনিলাম। টাকা ছয়টি কি অমনি দিলাম? অমনি দিলাম না,—তাহার পরিবর্ত্তে একটি সামগ্রী পাইলাম। সেই সামগ্রীটি যদি আমরা উচিত মূল্যের উপর একটি পয়সা বেশী দাম দিয়া লইয়া থাকি, তবে সেই পয়সাটি আমাদের ক্ষতি। কিন্তু যদি একটি পয়সাও বেশী না দিয়া থাকি, তবে আমাদের কোন ক্ষতি নাই। এক্ষণে বিবেচনা করিয় দেখুন, ছয় টাকার থানটি কিনিয়া একটি পয়সাও বেশী মূল্য দিয়াছি কি না। দেখা যাইতেছে যে, ছয় টাকার এক পয়সা কমে সে থান আমরা কোথাও পাই না, পাইলে তাহা সাধারণ লোকে ছয় টাকায় কেন কিনিবে? যদি ছয় টাকার এক পয়সা কমে ঐ থান কোথাও পাই না, তবে ঐ মূল্য অনুচিত নহে। যে ছয় টাকায় থান কিনিল, সে উচিত মূল্যেই কিনিল। যদি উচিত মূল্যে সামগ্রীটি কেনা হইল, তবে ক্রেতাদিগের ক্ষতি কি? কি প্রকারে তাহাদিগের টাকা অপহরণ করিয়া বিদেশীয় বণিক্ বিদেশে পলায়ন করিল? তাহারা দুই টাকা মুনাফা করিল বটে, কিন্তু ক্রেতাদিগের কোন ক্ষতি করিয়া লয় নাই; কেন না, উচিত মূল্য লইয়াছে। যদি কাহারও ক্ষতি না করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কি? যেখানে কাহারও ক্ষতি নাই, সেখানে দেশের অনিষ্ট কি?

আপত্তির মীমাংসা এখনও হয় নাই। আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতির কাছে থান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশে থাকিত। ভালই। কিন্তু দেশী তাঁতির কাছে থান কই? সে যদি থান বুনিতে পারিত, ঐ মূল্যে ঐরূপ থান দিতে পারিত, তবে আমরা তাহারই কাছে থান কিনিতাম—বিদেশীর কাছে কিনিতাম না। কেন না, বিদেশীও আমাদের কাছে থান লইয়া বেচিতে আসিত না। কারণ, দেশীয় বিক্রেতা যেখানে সমান দরে বেচিতেছে, সেখানে তাহার লভ্য হইত না। এ কথাটি সমাজনীতির আর একটি দুর্ব্বোধ্য নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এক্ষণে থাক। স্থূল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতি পাইল না, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। ক্রেতাদিগের যে ক্ষতি নাই, তাহা দেখাইয়াছি। দেশী তাঁতিরও ক্ষতি নাই। সে থান বুনে না, কিন্তু অন্য কাপড় বুনিতেছে। যে সময়ে ঐ ছয় টাকার জন্য থান বুনিত, সে সময়ে সে অন্য কাপড় বুনিতেছে। সে কাপড় সকলই বিক্রয় হইতেছে। অতএব তাহার যে উপার্জ্জন হইবার, তাহা হইতেছে। থান বুনিয়া সে আর অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না; থান বুনিতে গেলে ততক্ষণ অন্য কাপড় বুনা স্থগিত থাকিত। যেমন থানের মূল্য ছয় টাকা পাইত, তেমনি ছয় টাকা মূল্যের অন্য কাপড় বুনা হইত না; সুতরাং লাভে লোকসানে পুষিয়া যাইত। অতএব তাঁতির তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

তার্কিক বলিবেন, তাঁতির ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতির ব্যবসায় মারা গেল। তাঁতি থান বুনে না, ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা, সুতরাং লোকে থান পরে, ধুতি আর পরে না। এজন্য অনেক তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইয়াছে।

উত্তর। তাহার তাঁতবুনা ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সে অন্য ব্যবসা করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পায় না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নাই। সকল ব্যবসায়ের পরিণাম সমান লাভ, ইহা সমাজতত্ত্ববেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন। যদি তাঁত বুনিয়া মাসে পাঁচ টাকা লাভ হইত, তবে সে ধান বুনিয়া সেই পাঁচ টাকা লাভ করিবে। থানে বা ধুতিতে সে ছয় টাকা পাইত, ধানে সে সেই ছয় টাকা পাইবে। তবে তাঁতির ক্ষতি হইল কৈ?

ইহাতেও এক তর্ক উঠিতে পারে। তুমি বলিতেছ, তাঁত বুনিয়া খাইতে না পাইলেই ধান বুনিয়া খাইবে, কিন্তু ধান বুনিবার অনেক লোক আছে। আরও লোক সে ব্যবসায়ে গেলে ঐ ব্যবসায়ের লভ্য কমিয়া যাইবে, কেন না, অনেক লোক গেলে অনেক ধান হইবে, সুতরাং ধান সস্তা হইবে। যদি ধান্যকারক কৃষকদিগের লাভ কমিল, তবে দেশেব টাকা কমিল বই কি?

উত্তর। বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। এক পক্ষে বাণিজ্য হয় না। যেমন আমরা বিলাতের কতক সামগ্রী লই, তেমনি বিলাতের লোকে আমাদিগের কতক সামগ্রী লয়। যেমন আমরা কতকগুলিন বিলাতি সামগ্রী লওয়াতে, আমাদের দেশে প্রস্তুত সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন কমে, সেইরূপ বিলাতীয়েরা আমাদের দেশের কতকগুলি সামগ্রী লওয়াতে আমাদের দেশের সেই সেই সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ে। যেমন ধুতির প্রয়োজন কমিতেছে, তেমনি চাউলের প্রয়োজন বাড়িতেছে। অতএব যেমন কতকগুলি তাঁতির ব্যবসায়হানি হইতেছে, তেমনি কৃষি ব্যবসায় বাড়িতেছে, দেশী লোকের চাষ করিবার আবশ্যক হইতেছে। অতএব চাষীর সংখ্যা বাড়িলে তাহাদের লাভ কমিবে না।

অতএব বাণিজ্য হেতু যাহাদের পূর্ব্ব ব্যবসায়ের হানি হয়, নূতন ব্যবসায়াবলম্বনে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হয়। তাহা হইলে বিলাতি থান খরিদে তাঁতির ক্ষতি নাই। তাঁতিরও ক্ষতি নাই, ক্রেতাদিগেরও ক্ষতি নাই। তবে কাহার ক্ষতি? কাহারও নহে। যদি বণিক্ থান বেচিয়া যে লভ্য করিল, তাহাতে এ দেশীয় কাহারও অর্থক্ষতি হইল না, তবে তাহারা এ দেশের অর্থ-ভাণ্ডার লুঠ করিল কিসে? তাহার লভ্যের জন্য এ দেশের অর্থ কমিতেছে কিসে?

আমরা তাঁতির উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সে উদাহরণে একটি দোষ ঘটে। তাঁতির ব্যবসায় লোপ হইতেছে, তথাপি অনেক তাঁতি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে না। আমাদের দেশের লোক জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িয়া সহজে অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চাহে না। ইহা তাঁতিদের দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের ধনক্ষতি নাই; কেন না, থানের পরিবর্ত্তে যে চাউল যায়, তদুৎপাদন জন্য যে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি, তাহা হইবেই হইবে। তবে তাঁতি সেই ধন না পাইয়া, অন্য লোকে পাইবে। তাঁতি খাইতে পায় না বলিয়া দেশের ধন কমিতেছে না।

অনেকের এইরূপ বোধ আছে যে, বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া নগদ টাকা বস্তাবন্দী করিয়া জাহাজে তুলিয়া পলায়ন করেন। এরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য,—

প্রথমতঃ, নগদ টাকা লইয়া গেলেই দেশের অর্থহানি হইল না। নগদ টাকাই ধন নহে। যত প্রকার সম্পত্তি আছে, সকলই ধন। নগদ টাকা এক প্রকার ধন মাত্র। তাহার বিনিময়ে আমরা যদি অন্য প্রকার ধন পাই, তবে নগদ টাকা যাওয়ায় নির্ধন হই না।

নগদ টাকাই যে ধন নহে, এ কথা বুঝান কঠিন নহে। একজনের এক শত টাকা নগদ আছে, সে সেই এক শত টাকার ধান কিনিয়া গোলা-জাত করিল। তাহার নগদ টাকা নাই, কিন্তু এক শত টাকার ধান গোলায় আছে। সে কি পূর্ব্বাপেক্ষা গরিব হইল?

দ্বিতীয়তঃ, বাস্তবিক বিদেশীয় বণিকেরা এ দেশ হইতে নগদ টাকা জাহাজে তুলিয়া লইয়া যান না। বাণিজ্যের মূল্য হুণ্ডিতে চলে। সঞ্চিত অথ দলিলে থাকে। অতি অল্পমাত্র নগদ টাকা বিলাতে যায়।

তৃতীয়তঃ, যদি নগদ টাকা গেলেই ধনহানি হইত, তাহা হইলে বিদেশীয় বাণিজ্যে আমাদিগের ধনহানি নাই, বরং বৃদ্ধি হইতেছে। কেন না, যে পরিমাণে নগদ টাকা বা রূপা আমাদিগের দেশ হইতে অন্য দেশে যায়, তাহার অনেক গুণ বেশী রূপা অন্য দেশ হইতে আমাদের দেশে আসিতেছে, এবং সেই রূপায় নগদ টাকা হইতেছে। নগদ টাকাই যদি ধন হইত, তবে আমরা অন্য দেশকে নির্ধন করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি করিতেছি, নিজে নির্ধন হইতেছি না।

এ সকল তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে। যে বিপুল রেল্‌ওয়ে-গুলি প্রস্তুত হইয়াছে, সে অর্থ কাহার?

বিদেশীয় বণিক্‌দিগের সম্বন্ধে শেষে যাহা বলিয়াছি, রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধেও তাহা কিছু কিছু বর্ত্তে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র।* বাণিজ্য জন্য এ দেশে যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের পরিচয় মত কৃষি জন্য যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সে ক্ষতি পূরণ হইয়া আরও অনেক ফাজিল থাকিতেছে। অতএব আমাদের ধন বৎসর বৎসর বাড়িতেছে, কমিতেছে না।

৩। লেখক বলিতেছেন, "যদি মহাত্মা কর্ণ্‌ওয়ালিস্‌ জমীদারদিগের বর্ত্তমান শ্রীর উপায় না করিয়া যাইতেন, তবে দেশ এত দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িত। দেশে যাহা কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা এই কয়েকজন জমীদারের ঘরেই দেখিতে পাওয়া যায়।"

---

* এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে, গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি।

এ কথাও সকলে বলেন, এ ভ্রমও সাধারণের। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, জমীদারী বন্দোবস্তে যদি দেশে ধন আছে—তবে প্রজাওয়ারি বন্দোবস্তে ধন থাকিত না কেন? যে ধন এখন জমীদারদিগের হাতে আছে, সে ধন তখন দেশে থাকিত না ত কোথায় যাইত?

জমীদারের ঘরে ধন আছে, তাহার একমাত্র কারণ যে, তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন ভোগ করেন। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোন ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত। সেইটিই এই ভ্রান্ত বিবেচকদিগের আশঙ্কার বিষয়। ধন দুই এক জায়গায় কাঁড়ি বাঁধিলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা কবেন, কাঁড়ি না দেখিতে পাইলে তাঁহারা ধন আছে বিবেচনা করেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা এক জায়গায় গাদা করিলে অনেক দেখায়; কিন্তু আধ ক্রোশ অন্তর একটি একটি ছড়াইলে টাকা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই লক্ষ টাকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ধনের কোন্ অবস্থা দেশের পক্ষে ভাল, দুই এক স্থানে কাঁড়ি ভাল, না ঘরে ঘরে ছড়ান ভাল? পূর্ব্বপণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ধন গোময়ের মত, এক স্থানে অধিক জমা হইলে দুর্গন্ধ এবং অনিষ্টকারক হয়, মাঠময় ছড়াইলে উর্ব্বরতাজনক, সুতরাং মঙ্গলকারক হয়। সমাজতত্ত্ববিদেরাও এ তত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেইরূপই স্থির করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানানুসারে ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নতির লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাই ন্যায়সঙ্গত। পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে? সেই জন্যই কর্ণ্‌ওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতিধনবান্ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম। দেশশুদ্ধ অন্নের কাঙ্গাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভাল, না—সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন, এ দেশে প্রায় তাঁহার গর্দ্দভজন্ম ঘটিয়া উঠে। আর যাহারা নিতান্ত অন্ন-বস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যপ্রকৃত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশ্যনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্ত্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগর্জ্জনগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।

আমরা দেখাইলাম যে, যাঁহারা বিবেচনা করেন যে, জমীদার দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপকারী, তাঁহাদের তদ্রূপ বিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

বহুবিবাহ*

[স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্মুদ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসেব অংশ হইয়া পড়িয়াছে—উহার দ্বারাই বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও Malabari সম্প্রদায় প্রবল—তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই]

প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত কি না ? আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এ বিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতি-বিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, "বহুবিবাহ অতি

* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।" যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন, বোধ হয়, তাঁহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা আপন আপন জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই বলেন না যে, বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত কথা বলিয়া থাকেন, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত কুসংস্কারবিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহপ্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, চুরিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহুবিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াও বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা, তদ্বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই।

এই ঐকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহবিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেক দিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত, তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজনবিশিষ্ট হউক বা নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহপ্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাঁহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও হুগলি জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্‌কুইক্সোট্‌কে মনে পড়িবে।

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি, এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম, বহুবিবাহ এ দেশে বড়ই চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেন না, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ। দেখা যাইতেছে যে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ধৃত বচনের আড়ম্বর দেখিয়া আমরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন, দেশশুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে, বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত, এমত নহে। সে সমাজমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে একবার বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণসম্বন্ধে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী; কিন্তু কয় জন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথায় আর কাজ কি? বাস্তবিক মানবাদিধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কস্মিন্ কালে, কোন সমাজে, ঐ সকল বিধি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি সাধ্য হইলেও মনুষ্যের এতদূর ক্লেশকর যে, তাহা স্বতঃই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পরবিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই

ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কালমাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতক দূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতক দূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী, তাঁহাদিগকে এ কথা বলা বৃথা। কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন, ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধী নহি, হিন্দুধর্ম্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদের কামনা। তাই বলিয়া যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, "যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ কর, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেন না, সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন, সন্দেহ নাই। এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী বন্ধ্যা,* সেই আর একটি বিবাহ করুক—যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক—যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে বর্ষে মনঃপীড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও তাহার মর্ম্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন; কেন না, ইহা শাস্ত্রসম্মত। তদ্ভিন্ন যাহার কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে যে, এই সকল কারণে হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলে, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহপরায়ণ, যেখানে সহস্র সহস্র কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বহু পত্নী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসারধর্ম্ম করিতে থাকিবেন।"

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে

* "বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥"—বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩।

বাকি আছে। "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!"—ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে, সদ্যই অধিবেদন করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ যে, যাঁহার যাঁহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের গৌরববর্দ্ধনার্থ সদ্যই পুনর্ব্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয় ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন ; তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে), তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ "লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের"* অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালীই নাই, যাহাকে একদিন না একদিন স্ত্রীর কাছে "মুখঝামটা" খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্তসংখ্যক গৃহিণীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া স্বামীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া স্বামীকে বলিবেন, "তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না", তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া সদ্যই অন্য দার গ্রহণ করিবেন। যাঁহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, "কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না—আমার মরণ হয় ত বাঁচি"—তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, "মহাশয়, কন্যাদান করুন।" এত দিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা সার্থক হইল,—অমূল্যধন স্ত্রীরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে। বঙ্গসুন্দরীগণ বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রচারের এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে, অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন—কেন না, নথনাড়া দিবার দিন কাল গেল। বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকাবাহিনীগণ, বোধ হয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণ মাত্র ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ-বিষকে সংসারজয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে যেন, "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!"—বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!—আমাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোদ্ধৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে "লোকহিতৈষী" বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃঃ।

এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা এক-মতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়কস্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চির প্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন, বোধ হয় না। কিন্তু রাজ-ব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী", "ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রকন্যাস্তু*** বিবাহ্যাঃ ক্বচিদেব তু" প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। আর যাদ তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীযতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া, নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।

আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থাবিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।" যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, "আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্দ্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাঁহাদের ব্যাকরণের গুণে এক স্থানে "ক্রমশো বরা" ও "ক্রমশোঽবরা" উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাঁহাদিগেরই হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাঁহাদিগের ভাগ্য-দোষে মুসলমান, তাঁহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে না দোলে না, বিশেষ মুসলমানের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্দ্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই।" আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না।

অতএব আমাদিগের সামান্য বিবেচনায় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে

প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে ওইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব যে, সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ যে চুরি করে, সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জ্জনীয়; কেন না, সে কাতরতাবশতঃ, এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

আমরা এ কথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি গদ্গদচিত্ত হইয়া তৎপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহু-বিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।

যে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য, তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী, তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্প দিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্ত্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্ত্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার*

প্রথম প্রস্তাব

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার কত দিন হইতে? চিরকাল নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এক-প্রকার স্থির করিয়াছেন যে, আর্য্যজাতীয়েরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহে। তাঁহারা বলেন যে, ইরাণ বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে আর্য্যজাতীয়দিগের আদিম বাস। তথা হইতে তাঁহারা নানা দেশে গিয়া বসতি করিয়াছেন। এবং তথা হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। প্রথম কালে আর্য্য জাতি কেবল পঞ্জাবমধ্যে বসতি করিতেন। তথা হইতে ক্রমে পূর্ব্বদেশ জয় করিয়া অধিকার করিয়াছেন।

যে সকল প্রমাণের উপর এই সকল কথা নির্ভর করে, তাহা সুশিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন, এবং সুশিক্ষিত মাত্রেরই নিকট সে সকল প্রমাণ গ্রাহ্য হইয়াছে। অতএব তাহার কোন বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব না। যদি আর্য্যজাতীয়েরা উত্তর পশ্চিম হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বভাগে আসিয়াছিলেন, তবে ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে, অনেক পরে বঙ্গদেশে আর্য্যজাতীয়েরা আসিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥"

এই বচন মনুসংহিতোদ্ধৃত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, যৎকালে মানবধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, তৎকালে বঙ্গদেশ শুদ্ধাচারবিশিষ্ট পুণ্য প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইত না। অথচ আর্য্যাবর্ত্তের একাংশ বলিয়া গণিত হইত। কেন না, ঐ বচনদ্বয়ের কিছু পরেই মনুতে আছে যে—

"আসমুদ্রাত্ত বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্ত পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো † রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥"

কিন্তু বঙ্গদেশ তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের অংশমধ্যে গণনীয় হইলেও, তথায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এমত বোধ হয় না। কেন না, মনুসংহিতায় অন্যত্র আছে,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লাবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥"

এক্ষণে যাহাকে বঙ্গদেশ বলা যায়, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশ পৌণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল। যে অংশমধ্যে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, তাহা সেই অংশের অন্তর্গত। যাঁহারা সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা উইলসন্ কৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদের প্রদেশতত্ত্ববিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিবেন। বঙ্গ, পুণ্ড্র হইতে একটি পৃথক্ রাজ্য ছিল। এক্ষণে বাঙ্গালীতে ঢাকা বিক্রমপুর অঞ্চলকেই "বঙ্গদেশ বলে—সেই প্রদেশকেই

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮০।

† বিন্ধ্যাচল ও হিমবৎ।

প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বলিত। কিন্তু অগ্রে পুণ্ড্র, পরে বঙ্গ। মহাভারতের সভাপর্ব্বে আছে, ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছবাসী মনৌজ রাজা, এই দুই মহাবল মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ্‌ সাঙ্‌ ভারতবর্ষে এই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড দেশে আসিয়াছিলেন। সেই দেশের রাজধানীর নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। জেনেরল্ কানিঙ্‌হাম্‌ বলেন যে, আধুনিক পাবনাই প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বোধ হয়, মালদহের অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া নামক গ্রামের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। এই পাণ্ডুয়াই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে।

অতএব আধুনিক বঙ্গদেশের প্রধানাংশকে পূর্ব্বে পৌণ্ড্রদেশ বলিত। মনুর শেষোদ্ধৃত বচনে বোধ হইতেছে যে, তখন এ দেশে ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই বা আর্য্যজাতি আইসে নাই। ইহা বলা যাইতে পারে যে, যেখানে পৌণ্ড্রদিগকে লুপ্তক্রিয় ক্ষত্রিয় মাত্র বলা হইতেছে, সেখানে এমত বুঝায় না যে, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলন হয়, তখন বঙ্গদেশে আর্য্যজাতি আইসে নাই। বরং ইহাই বলা যাইতে পারে, তাহার বহু পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়া আচারভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। যদি তাহা বলা যায়, তবে চীন, তাতার, পারশ্য, এবং গ্রীস্ সম্বন্ধেও তাহা বলিতে হইবে। কেন না, পৌণ্ড্রগণ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, চৈন, শক, পহ্লব, এবং যবন সম্বন্ধেও তাহা কথিত হইয়াছে। মনু, শক, যবন, পহ্লব, (কেহ লিখেন পহ্নব) এবং চৈনদিগকে যে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, এতদ্দেশবাসী পৌণ্ড্রদিগকে সেই শ্রেণীতে ফেলিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, মনুসংহিতাসঙ্কলনকালে বঙ্গদেশ ব্রাহ্মণবিহীন, অনার্য্য জাতির বাসস্থান ছিল।

সমুদ্রতীর হইতে পদ্মাপর্য্যন্ত প্রদেশে এক্ষণে বহুসংখ্যক পুঁড়া ও পোদ জাতীয়ের বাস আছে। পুঁড়া শব্দটি পুণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ বোধ হয়; পোদ শব্দও তাহাই বোধ হয়। অতএব এই পুঁড়া ও পোদ জাতীয়দিগকে সেই পৌণ্ড্রদিগের বংশ বিবেচনা করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মস্তকাদির গঠন তুরাণী, ককেশীয় নহে। তবে ককেশীয়দিগের সহিত মিশিয়া কতক কতক তদনুরূপ হইয়াছে। জাতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষের আদিমবাসীরা সকলেই তুরাণীয় ছিল; আর্য্যেরা তাহাদিগকে পরাস্ত করায় তাহারা কতক কতক বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। আধুনিক কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি সেই আদিম জাতি। আর কতকগুলিন, জেতাদিগের আশ্রয়েই তাহাদিগের নিকট অবনত হইয়া রহিল। আধুনিক অনেক অপবিত্র হিন্দুজাতি তাহাদিগেরই বংশ। পুঁড়া এবং পোদগণকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বোধ হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে,—

"বিদেঘোহ মাথবোঽগ্নিং বৈশ্বানরং মুখে বভার। তস্য গোতমো রাহুগণ ঋষিঃ পুরোহিত আস। তস্মৈ স্মামন্ত্র্যমাণো ন প্রতিশৃণোতি নৈন্মেঽগ্নি বৈশ্বানরো মুখান্নিস্পদ্যাতৈ ইতি তমৃগভির্হ্ব য়িতুং দধ্রে। বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি। অগ্নে বৃহন্তমধ্বরে বিদেঘেতি। স ন প্রতিশুশ্রাব।—উদগ্নে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ইরতে। তব জ্যোতিংষ্যর্চয়ো বিদেঘা ইতি। সহ নৈব প্রতিশুশ্রাব। তং ত্বা ঘৃত স্নবীমহে ইত্যেবাভিব্যাহারদথাস্য ঘৃতকীর্ত্তাবেবাগ্নি বৈশ্বানরো মুখাদুজ্জ্বাল তং ন শশাক

ধারয়িতুম্। সোঽস্য মুখান্নিষ্পেদে স ইমাং পৃথিবীং প্রাপাদঃ। তর্হি বিদেঘো মাথব আস সরস্বত্যাম্। স তত এব প্রাঙ্দহন্নভীয়ায়েমাং পৃথিবীম্। তং গৌতমশ্চ রাহুগণো বিদেঘশ্চ মাথবঃ পশ্চাদ্ দহন্তমন্বীয়তুঃ। স ইমাঃ সর্ব্বা নদীরতিদদাহ। সদানীরেত্যুত্তরাদ্ গিরের্নিধাবতি তাং হৈব নাতিদদাহ তাং হ স্ম তাং পুরা ব্রাহ্মণা ন তরন্তি অনতিদগ্ধা অগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তত এতর্হি প্রাচীনং বহবো ব্রাহ্মণাঃ। তদ্ হ অক্ষেত্রতরমিবাস স্রাবিতরমিব অস্বদিতমগ্নিনা বৈশ্বানরেণেতি। তদ্বৈতর্হি ক্ষেত্রতরমিব ব্রাহ্মণা উ হি নূনমেতদ্ যজ্ঞৈরসিষ্বিদন্। সাপি জঘন্যে নৈদাঘে সমিবৈব কোপয়তি তাবৎ সীতাঽনতি দগ্ধা হ্যগ্নিনা বৈশ্বানরেণ। স হোবাচ বিদেঘো মাথবঃ ক্বাহং ভবানি ইতি। অতএব তে প্রাচীনং ভুবনমিতি হোবাচ। সৈষাপ্যেতর্হি কোশলবিদেহানাং মর্য্যাদা। তেহিমাথবাঃ।"

এক্ষণে সদানীরা নামে কোন নদী নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রাভিধানে এবং অমরকোষে করতোয়া নদীর নাম সদানীরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সে এ সদানীরা নদী নহে, কেন না, শতপথ ব্রাহ্মণেই কথিত হইয়াছে যে, এই নদী কোশল (অযোধ্যা) এবং বিদেহ রাজ্যের (মিথিলা) মধ্যসীমা।

ইহাতে এই নিশ্চিত হইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালে মিথিলাতে ব্রাহ্মণ আসে নাই, কিন্তু যখন শতপথ ব্রাহ্মণ (ইহা বেদান্তর্গত) সঙ্কলিত হয়, তখন মিথিলায় ব্রাহ্মণ বাস করিত। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়নের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যগণ মিথিলাতে বাস করিত, সন্দেহ নাই; কেন না, ঐ ব্রাহ্মণে বিদেহাধিপতি জনক সম্রাট্ বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন। নবীন রাজ্যের রাজা প্রাচীনদিগের নিকট সম্রাট্ নাম লাভ করিবার সম্ভাবনা কি? যখন মিথিলায় এতকাল হইতে ব্রাহ্মণের বাস, তখন যে ব্রাহ্মণেরা তথা হইতে আধুনিক বাঙ্গালার উত্তরাংশে বিস্তৃত হয়েন নাই, এমত বোধও হয় না। তবে সে সময়ে বঙ্গদেশ স্পৃহণীয় বাসস্থান ছিল না, অথবা একেবারেই বা বাসযোগ্য ছিল না, এমত কেহ কেহ বলিতে পারেন। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশ ছিল না; হিমালয়ের মূল পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। অদ্যাপি সমুদ্রবাসী জীবের দেহাবশেষ হিমালয় পর্ব্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। কি প্রকারে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মুখানীত কর্দ্দমে বঙ্গদেশ সৃষ্টি, তাহা সর্ চার্লস্ লায়েল্ প্রণীত "Principles of Geology" নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই আছে, সদানীরা নদীর পর-পারস্থিত প্রদেশ জলপ্লাবিত। "স্রাবিতর" শব্দে প্লবনীয় ভূমিই বুঝায়। যদি তখন ত্রিহুৎ প্রদেশের এই দশা, তবে অপেক্ষাকৃত নবীন বঙ্গভূমি সুন্দরবনের মত অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু সে সময়ে যে এ দেশে মনুষ্যের বাস ছিল, ঐ শতপথ ব্রাহ্মণেই তাহার প্রমাণ আছে। ঐ পৌণ্ড্রেরাই তথায় বাস করিত। যথা, "অন্তান্ বঃ প্রজা তক্ষিষ্ট ইতি। ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ মূতিবাঃ ইতি উদন্ত্যাঃ বহবো ভবন্তি।" মহাভারতে সভাপর্ব্বে প্রাগুক্ত স্থানেই আছে যে, ভীম পুণ্ড্র বঙ্গাদি জয় করিয়া তাম্রলিপ্ত, এবং সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে জয় করিলেন।* অতএব তৎকালে এ দেশ আসমুদ্র

* মহাভারতের যুদ্ধে বঙ্গাধিপতি গজসৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গেরা ম্লেচ্ছ ও অনার্য্যগণ-মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু তথায় যে আর্য্যজাতির বাস ছিল, এমত প্রমাণ মহাভারতে নাই। পুণ্ড্রাজের নাম বাসুদেব। আর্য্যবংশীয় নহিলে এ নাম সম্ভবে না। কিন্তু নাম কবির কল্পিত বলিয়া বোধ করাই উচিত। যদি বল, ঐ স্থলেই অনার্য্যজাতিগণকে সমুদ্র-তীরবাসী ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, পুণ্ড্রাদিজাতি ম্লেচ্ছ নহে; সুতরাং তাহারা আর্য্যজাতি। ইহার উত্তর এই যে, ম্লেচ্ছ না হইলে আর্য্যজাতি হইল, এমত নহে। ম্লেচ্ছ একটি অনার্য্যজাতি মাত্র; যবনাদি আর জাতি তাহা হইতে ভিন্ন। যথা মহাভারতের আদিপর্ব্বে,—

"যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ।
দ্রুহ্যোঃ সুতাস্তু বৈ ভোজাঃ অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥"

বরং ঐ মহাভারতেই পুণ্ড্র অনার্য্যজাতিমধ্যে গণিত হইয়াছে, যথা—

"যবনাঃ কিরাতাঃ গান্ধারাশ্চৈনাঃ শাবরবর্ব্বরাঃ।
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চন্দ্রমদ্রকাঃ॥
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।"

অতএব এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ যে, যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ দেশে আর্য্যজাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয়, তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্‌খানি কোন্ কালে সঙ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে, যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল, তখন এ দেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি। খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বা তদ্বৎ কোন কালে এ দেশে আর্য্যজাতির অধিকার হইয়াছিল বলিলে কি অন্যায় হইবে?* তাহা বলা যায় না।

মহাবংশ নামক সিংহলীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশ হইতে একজন রাজপুত্র গিয়া সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আমরা যে সিদ্ধান্ত করিলাম, মহাবংশের এ কথায় তাহার খণ্ডন হইতেছে না। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বঙ্গীয় আর্য্যগণ অতি অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হইয়াছিলেন। হণ্টর সাহেব, প্রাচীন বঙ্গীয়দিগের নৌগমনপটুতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এ কথা তাহারই পোষক হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক কথা বাকি রহিল, অবকাশ হয় ত পশ্চাৎ বলিব।

* এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মতে উপস্থিত হইয়াছেন।

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার*

দ্বিতীয় প্রস্তাব †

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমরা পুনর্ব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অনেক দিন আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নিম্নপরিচিত গ্রন্থখানির সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলাম।

বিদ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তকে দুর্লভ; বাঙ্গালী লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করে না। আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সম্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণ ও বৈদ্যগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ বিশেষ পর্য্যালোচনীয়; অন্য জাতির বিবরণ তাহার আনুষঙ্গিক মাত্র।

আমরা "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, উত্তর ভারতে অন্যান্যাংশে যত কাল ব্রাহ্মণের অধিকার, এ দেশে তত কাল নহে—সে অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বহু শত বৎসর পূর্ব্বে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এমত বিবেচনা না করিবার অনেক কারণ আছে।

মনুসংহিতাদি-প্রদত্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, আর্য্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও তথায় অবস্থান করিয়া কালসাহায্যে ক্রমে পূর্ব্বদিকে আগমন করেন। সর্ব্বশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক হইয়াছে।

প্রথমতঃ, একজাতিকৃত অন্য জাতির দেশাধিকার দ্বিবিধ।

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তথায় বাস করিয়াছিলেন। ইংরেজসম্ভূত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী; আমেরিকা এখন তাঁহাদিগের দেশ।

পুনশ্চ, সাক্সন্ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল। তাহারাও ইংলণ্ডের অধিবাসী হইয়াছিল।

আর্য্যেরাও পশ্চিমাঞ্চল—আমরা যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি—বিজিত করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজের অধিকৃত আমেরিকা ও সাক্সন্‌দিগের অধিকৃত ইংলণ্ডের সঙ্গে আর্য্যাধিকৃত পশ্চিম ভারতের প্রভেদ এই যে, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসিগণ, জেতৃগণ কর্ত্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্য্যবিজিত

* সম্বন্ধনির্ণয়। বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

† বঙ্গদর্শন, ১২৮২।

আদিম অধিবাসিগণ জেতৃবশীভূত হইয়া শূদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া রহিল।

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেজেরা ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের অধিবাসী নহেন। কতকগুলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা এ দেশে বিদেশী। ভারতবর্ষ ইংরেজের রাজ্য, কিন্তু ইংরেজের বাসভূমি নহে।

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্ট্রনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু রোমকদিগের বাসভূমি নহে। গল্, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন অধিবাসিগণেরই বাসস্থল রহিল; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাস করিলেন বটে, কিন্তু রোমকেরা তথাকার অধিবাসী হইলেন না।

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভূমি, উত্তর ভারতকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে। আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না, মিশর প্রভৃতিকে রোমকভূমি বলা যাইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা, বঙ্গদেশকে আর্য্যভূমি বলা যাইতে পারে? মগধ, মথুরা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ আর্য্যগণের বাসস্থান, বঙ্গদেশ কি তাই?

ভারতীয় আর্য্যজাতি চতুর্ব্বর্ণ। যেখানে আর্য্যগণ অধিবাসী হইয়াছেন, সেইখানেই চতুর্ব্বর্ণের সহিত তাঁহারা বিদ্যমান। কিন্তু বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই।

ক্ষত্রিয় দুই চারি ঘর, যাহা স্থানে স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা ঐতিহাসিক কালে অধিকাংশই মুসলমানদিগের সময়ে আসিয়াছেন। দুই একটি রাজবংশ অতি প্রাচীন কালে আসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রাজাদিগেব কথা আমরা বলিতেছি না, সামাজিক লোকদিগের কথা বলিতেছি।

বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ। মুর্শিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন জনকয় বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশ আছে। এইরূপ অন্যত্রও অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণ আছেন—তাঁহারা আধুনিক কালে আসিয়াছেন। সুবর্ণবণিক্‌দিগকে বৈশ্য বলিলেও বৈশ্যরা সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্যস্থানেই কতকগুলি সুবর্ণবণিক্ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই।

যখন আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই প্রবাদ আছে। অদ্যাপি সেই আদিম ব্রাহ্মণদিগের সন্ততিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ৯৯৯ সম্বতে আনয়ন করেন। সে খ্রীঃ ৯৪২ শাল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দশম শতাব্দীতে গৌড় রাজ্যে সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ব্রাহ্মণ ছিল না। এ সংখ্যা অতি অল্প; এক্ষণে অতি সামান্য পল্লীগ্রামে ইহার অধিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাঁহারা এই দশম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আর্য্যজাতি। ইহারাই উপবীত ধারণ করে। শূদ্র অনার্য্য জাতি। যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে নাই, বৈশ্যগণ কদাচিৎ বাণিজ্যার্থ আসিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণও একাদশ শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই বাঙ্গালা নয় শত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভূমি ছিল না, অনার্য্যভূমি

ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালার সহিত আর্য্যদিগের সেই সম্বন্ধ ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, কতকাল হইল, বাঙ্গালায় প্রথম ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তজ্জন্য আদিশূর ও বল্লালসেনের যে কত বৎসরের ব্যবধান, তাহা দেখা আবশ্যক।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন, তাঁহাদিগের বংশসম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা। কিন্তু এ কিম্বদন্তী যে অমূলক এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্ব্বেই সপ্রমাণীকৃত করিয়াছেন। এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাহা পুনঃপ্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন শ্রীহর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। বল্লালসেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলীন্য প্রদান করেন। উৎসাহ শ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ।* আদিশূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ একজন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। তাঁহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ।† ভট্টনারায়ণ, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তদ্বংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীন্য প্রদান করেন। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ, ইত্যাদি।

আদিশূর যাঁহাদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন, বল্লাল তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা হইলে, কখনও তাঁহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে পাইতেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব।

ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, এই অব্দ শকাব্দ নহে—সংবৎ। কিন্তু সম্বতের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন—

"আদিশূর খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; এবং খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন।

প্রমাণ,	এক্ষণে	সংবৎ	১৯৩২
	—খ্রীষ্টীয়	শক	১৮৭৫
সংবতের সহিত খ্রীঃ অন্তর			৫৭

এখন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবৎ, অর্থাৎ যে বর্ষে পুত্রেষ্টি যাগ হয়, সে বৎসর খ্রীঃ ১০৫৬।"—১৬১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়া খ্রীষ্টাব্দ বাহির

* (১) শ্রীহর্ষ, (২) শ্রীগর্ভ, (৩) শ্রীনিবাস, (৪) আরব, (৫) ত্রিবিক্রম, (৬) কাক, (৭) ধাঁধু, (৮) জলাশয়, (৯) বাণেশ্বর, (১০) গুহ, (১১) মাধব, (১২) কোলাহল, (১৩) উৎসাহ।

† (১) দক্ষ, (২) সুসেন, (৩) মহাদেব, (৪) হলধর, (৫) কৃষ্ণদেব, (৬) বরাহ, (৭) শ্রীধর, (৮) বহুরূপ।

করিতে হয় না, কেন না, খ্রীঃ অব্দ হইতে সংবৎ পূর্ব্বগামী, সংবৎ হইতে ৫৭ বৎসর বাদ দিয়া খ্রীঃ অব্দ পাইতে হইবে। যোগ করিলে, এখন ১৯৩২ + ৫৭ = ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯৩২—৫৭ = ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া যায়। সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে, ৯৯৯—৫৭ = ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এই ভুল বিদ্যানিধি মহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে "সামান্যাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। সুতরাং ঐ অব্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে।" বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবৎ ধরিতে হইবে, কিন্তু তিনি এইরূপ অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত না হইলেও, কথাটি ন্যায্য বোধ হয়। এ স্থলে আমরা বিজ্ঞ পুরাণতত্ত্ববিৎ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বিচার নির্দ্দোষ হইতে পারে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময়প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন দানসাগর নামক গ্রন্থের ১০১৯ শকে রচনা সমাপ্ত করেন। ১০১৯ শকাব্দ—১০৯৭ খ্রীঃ অব্দ। তাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়া থাকিবে। অতএব বল্লালসেন তাহার পূর্ব্বে অনেক বৎসর হইতে জীবিত ছিলেন, এমত বিবেচনা করা যায়। আইন আকবরীতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে জানা যায়, বল্লালসেন ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। আইন আকবরীর কথা ও রাজেন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐক্য দেখা যাইতেছে।

আদিশূরের সময়, রাজেন্দ্রলাল বাবু নিজবংশের পর্য্যায় হিসাব করিয়া, নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ আদিশূরের সময় নিরূপিত হইয়াছে। এ গণনা ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ঠিক মিলিতেছে না। অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হইতেছে; কেন না, ৯৯৯ সংবতে ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এ প্রভেদ অতি অল্প। এ দিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দে ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পাই। তখন বল্লাল সিংহাসনারূঢ়, ইহা উপরে দেখা গিয়াছে। সুতরাং শক নহে—সংবৎ।

অতএব আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের গ্রন্থসমাপন পর্য্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়া যাইতেছে। উপরে বলা হইয়াছে যে, বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ; তাহা হইলে আদিশূর হইতে বল্লাল নবম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী দক্ষ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী যদুরূপ অষ্টম পুরুষ। আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বেদগভ হইতে তদ্বংশজাত, এবং বল্লালের সমকালবর্ত্তী শিশু ৮ম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ, এবং শ্রীহর্ষ হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ। কেবল ছান্দড় হইতে কানু ৪র্থ পুরুষ। গড়ে আদিশূর হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া যায়।

প্রচলিত রীতি এই যে, ভারতবর্ষীয় ঐতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ বৎসর গড়তা করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া যায়। আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশূরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে,

সে গণনা মিলিতেছে। অতএব এ ফল গ্রাহ্য ; বল্লাল আদিশূরের সার্দ্ধেক শতাব্দী পরগামী।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, বল্লাল কৌলীন্য সংস্থাপন করেন, তখন আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। দেড শত বৎসরে ঈদৃশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদি বিবেচনা করা যায় যে, তৎকালে বহুবিবাহপ্রথা বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে ইহা বিস্ময়কর বোধ হইবে না। বহুবিবাহ যে বিশেষরূপেই প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুত্রসংখ্যার পরিচয় লইলেই বিশেষ প্রকারে বুঝা যাইবে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের ধৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা যায় যে, ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্র, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র এবং ছান্দডের ৮ পুত্র। মোটে পাঁচ জনে বাঙ্গালায় ৫৬ পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ পুত্র ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাঢ়ীয়দিগের ৫৬টি গাঁই। যখন দেখা যাইতেছে যে, একপুরুষ মধ্যে ৫ ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১গুণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তখন নয় পুরুষের শতগুণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক, কেন না, পঞ্চ ব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, অতএব তাঁহারা বাঙ্গালায় সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের বংশাবলী কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সহজে অনুমেয়।

সুবিখ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালায় কত বিস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় কুলীনগণ জানেন। এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামেও পাঁচ সাত ঘর পাওয়া যায় ; কোন কোন বড গ্রামে তাঁহাদিগের সংখ্যা অগণ্য। যে বলিবে যে, সমগ্র বাঙ্গালায় একাদশ শত ঘর মাত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান বাস করে, সে অন্যায় বলিবে না ; কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে ? বহুসংখ্যক নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং কুটুম্বিতা আছে। তাঁহারা নীলকণ্ঠ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ নবম পুরুষ। যদি সাত আট পুরুষে এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, একজন হইতে হইতে পারে, তবে দেড় শত বৎসরে ৫ জন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা নহে।

এক্ষণে বোধ হয় চারিটি বিষয় বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্থির হইতেছে।

১ম। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনিবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না।

২য়। ৯৪২ খ্রীঃ অব্দে আদিশূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন।

৩য়। তাহার দেড শত বৎসর পরে বল্লাল সেন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য প্রচলিত করেন।

৪র্থ। এই দেড় শত বৎসরে ঐ পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণে এগার শত ঘর হইয়াছিল।

যদি দেড় শত বৎসরে পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, তবে কত কালে বঙ্গদেশের আদিম ব্রাহ্মণগণের বংশ সাড়ে সাত শত ঘর হইয়াছিল।

যদি সপ্তশতীদিগের আদিপুরুষও পাঁচ জন ছিলেন এবং যদি তাঁহারাও কান্যকুব্জীয়দিগের ন্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা বিবেচনা করা যায়, তবে বাঙ্গালায় প্রথম

ব্রাহ্মণদিগের আগমনকাল হইতে শত বৎসর মধ্যে তাঁহাদের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব নহে।

সপ্তশতীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অনুমানে দোষ হয় না। কেন না, বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা যাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে যে, কান্যকুব্জীয়গণ বিশেষ সুব্রাহ্মণ বলিয়া সপ্তশতীগণও তাঁহাদিগকে কন্যাদানে উৎসুক হইতেন, এই জন্য তাঁহারা অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন ; সপ্তশতী-গণের পূর্ব্বপুরুষেব তত বিবাহ করিবার কোন কারণ ছিল না। তেমন এদিকে পাঁচ জন মাত্র যে তাঁহাদিগের আদিপুরুষ, ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে, একত্রে বা একে একে রাজগণের প্রয়োজনানুসারে বা রাজপ্রসাদ লাভাকাঙ্ক্ষায় অধিকসংখ্যক আসাই সম্ভব।

অতএব কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে এক শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস, বিচারসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসমাজ ছিল না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশূরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নহে যে, ব্রাহ্মণেরা স্বল্পদিন মাত্র বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যই ব্রাহ্মণসংখ্যার অল্পতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ কান্যকুব্জাদি দেশেও তদ্রূপ বা তদধিক ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু যদি বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণসংখ্যা স্বল্পীভূত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই কারণে ব্রাহ্মণবংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোন আপত্তিকারী তাহাও স্বীকার করিতে পারেন। বলিতে পারেন যে, তখন সমস্ত ভারতেই অল্প ব্রাহ্মণ ছিল—এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্ব্ব হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তবে আদিশূরের পূর্ব্বকালজাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? বরং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তথায় ব্রাহ্মণের বাস না থাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় কেন?* আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাঁহারা স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন? কুল্লুকভট্ট, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি যাহার নাম করিবেন, সকলই আদিশূরের পরবর্ত্তী। ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ তাঁহার সমকালিক। প্রাচীন আর্য্যজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেইখানেই ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের চিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাদি রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকাদিও নাই।

আমরা অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেও আর্য্য রাজকুল বাঙ্গালায় ছিল, এবং তাহাদিগের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন। সেরূপ অল্প-

* বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব দেখ।

সংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ সকল জাতিই সকল দেশে থাকে। কালিফর্ণিয়াতেও অনেক চীন আছে।

আমরা যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালীজাতির অগৌরব করা হইল, আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করি—তা না হইয়া আমরাও আধুনিক হইলাম।

আমরা দেখিতেছি না যে, অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যজাতি-সম্ভূতই রহিলাম—বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই—আর্য্যকীর্ত্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখ যাইতেছে যে, আমরা সে কীর্ত্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্ত্তিমন্ত পুরুষগণই আমা-দিগের পূর্ব্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্য্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।

আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। আদিশূরের সময়ে মোটে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। বল্লালের সময় সেই সাড়ে সাত শত ঘরের বংশ এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনও যখন অতি অল্পসংখ্যক, তবে তখন যে আরও অল্পসংখ্যক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্য্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এদেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্য্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।

তখনও বঙ্গীয় আর্য্যগণের অভ্যুদয়ের সময় হয় নাই। এখন সে সময় বোধ হয় উপস্থিত। বাহুবলে না হউক, বুদ্ধিবলে যে বাঙ্গালী অচিরে পৃথিবীমধ্যে যশস্বী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে।

আমরা উপরে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্ত্তে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কায়স্থগণ সৎশূদ্র অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা বর্ণসঙ্কর বটে। তদ্বিষয়ে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে অনেক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। সঙ্করতা হেতু কায়স্থগণ আর্য্যবংশসম্ভূত বটে। আদিশূরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থও কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া-ছিলেন। তৎপূর্ব্বে যেমন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্প-সংখ্যক। এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপ।

বাঙ্গালা শাসনের কল*

পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন বর, কলিকাতানিবাসী একটি কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কন্যাটি পরমাসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, কর্ম্মিষ্ঠা এবং সুশীলা। তাঁহার পিতা মহা ধনী, নানা রত্নে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন। মনে ভাবিলেন, আমার মেয়ের কোন দোষ কেহ বাহির করিতে পারিবে না। সঙ্গের লোক ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে! বাঙ্গালেরা মেয়ের কোন দোষ বাহির করিতে পারিয়াছে?" সঙ্গের লোক বলিল, "আজ্ঞে হাঁ—দোষ লইয়া বড় গণ্ডগোল গিয়াছে।" বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি? কি দোষ?" ভৃত্য বলিল, "বাঙ্গালেরা বড় নিন্দা করিয়াছে, মেয়ের কপালে উল্কি নাই।" আমরা এই বঙ্গদর্শনে কখনও সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ সাহেব সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। যাঁহার নিন্দা তিন বৎসরকাল বাঙ্গালাপত্রের জীবনস্বরূপ ছিল, তাঁহার কোন উল্লেখ না থাকাতে আমাদের ভয় করে যে, পাছে কেহ বলে যে, বঙ্গদর্শনের উল্কি নাই। আমরা অদ্য বঙ্গদর্শনকে উল্কি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তবে এই উল্কি বড় সামান্য নহে। যে পত্র বা পত্রিকা—(কোন্‌গুলি পত্র আর কোন্‌গুলি পত্রিকা, তাহা আমরা ঠিক জানি না—কি করিলে পত্র পত্রিকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নহি)। যে পত্র বা পত্রিকা একবার কপালে এই উল্কি পরিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশ মোহিয়াছেন, মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে এবং সাম্বৎসরিক অগ্রিম মূল্যে বরণ করিয়া তাঁহাকে ঘরে তুলিয়াছে। যে এই উল্কি পরে, তাহার অনেক সুখ।

এক্ষণে সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ এতদ্দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে সকলেই দুঃখিত। এ পৃথিবীতে পরনিন্দা প্রধান সুখ—বিশেষ যদি নিন্দিত ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীস্থ এবং গুণবান্ হয়, তবে আরও সুখ। সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ গুণবান্ হউন বা না হউন, উচ্চশ্রেণীস্থ বটে। তাঁহার নিন্দায় যে সুখ, তাহাতে এক্ষণে বঙ্গদেশের লোক বঞ্চিত হইল। ইহার অপেক্ষা আর গুরুতর দুর্ঘটনা কি হইতে পারে। এই যে গুরুতর দুর্ভিক্ষবহ্নিতে দেশ দগ্ধ হইতেছিল, তাহাতেও আমরা কোন মতে প্রাণ ধারণ করিতেছিলাম, খবরের কাগজ চলিতেছিল, বাঙ্গালী বাবু গল্পের মজলিসে অশ্লীল গল্প ছাড়িয়া, সর্ জর্জের নিন্দা করিয়া বোতল শেষ করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে? হায়! এক্ষণে কি হইবে!

এইরূপ সর্ব্বজননিন্দার্হ হওয়া সচরাচর দেখা যায় না। অনেকে বলিবেন, সর্ জর্জ্ কাম্বেলের অসাধারণ দোষ ছিল, এই জন্যই তিনি এইরূপ অসাধারণ নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে এইরূপ সর্ব্বজননিন্দনীয় হয়, যাহার নিন্দায় সকলের তুষ্টি জন্মে, সে হয় অসাধারণ দোষে দোষী বা অসাধারণ গুণে গুণবান্—নয় ত দুইই। জিজ্ঞাস্য, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে গুণবান্ বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল?

* "সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ্ কাম্বেল্" ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার এক অংশ মাত্র এখানে গৃহীত হইল।

তাঁহার পূর্ব্বগামী শাসনকর্ত্তা সর্ উইলিয়ম্ গ্রে। সর্ উইলিয়ম্ গ্রের ন্যায় কোন লেঃ গবর্ণর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন নাই। সর্ জর্জ্ কাম্বেল ও সর্ উইলিয়ম্ গ্রের এই ভাগ্যতারতম্য কোন্ দোষে বা কোন্ গুণে? কোন্ গুণে সর্ উইলিয়ম্ সকলের প্রিয়, কোন্ দোষে সর্ জর্জ্ সকলের অপ্রিয়?

যাঁহারা এই কথার মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে একটা কথা বুঝাইতে হয়। এই ব্রিটিশভারতীয় শাসনপ্রণালী দূর হইতে দেখিতে বড় জাঁক, শুনিতে ভয়ানক, বুঝিতে বড় গোল—ইহার প্রকৃতি কি প্রকার? এক লেঃ গবর্ণর কর্ত্তৃক যে এই বৃহৎ রাজ্য শাসিত হয়, সে কোন্ রীতি অবলম্বন করিয়া?

সে রীতি দুই প্রকার। একটি রীতি একটি সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, বাঁধের কথা উপস্থিত। কমিশ্যনরের রিপোর্টে হউক, বোর্ডের রিপোর্টে হউক, ইঞ্জিনিয়রদিগের রিপোর্টে হউক, সম্বাদপত্রে হউক, লেঃ গবর্ণর জানিলেন যে, নদীতীরস্থ প্রাচীন বাঁধসকল রক্ষিত হইতেছে না—তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তখন লেঃ গবর্ণরের হুকুম হইল যে, রিপোর্ট্ তলব কর। এই হুকুমে যদি কোন বিশেষ গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা থাকে, তবে সে গুণশালিত্ব বা যোগ্যতা লেঃ গবর্ণরের। সেক্রেটরি সাহেব হুকুম পাইয়া, বোর্ডে চিঠি লিখিলেন—তাঁহার চিঠিতে কথাটা একটু বিস্তৃতি পাইল—তিনি বলিলেন, ইহার বিশেষ অবস্থা জানি বে—অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগেব অভিপ্রায় কি, তাহা লিখিবে, ইহার কিরূপ উপায় হইতে পারে, তাহা লিখিবে। বোর্ড্, ঐ পত্রখানির একাদশ খণ্ড অতি পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, একাদশ কমিশ্যনরের নিকট পাঠাইলেন। একাদশ কমিশ্যনর অনুলিপি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার কোণে পেন্‌সিলে প্রাপ্তির তারিখ লিখিয়া বাক্সে ফেলিলেন, তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত হইল। বাক্স প্রাচীন প্রথানুসারে যথাসময়ে চাপরাশ-স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, কেরাণীর নিকট পৌঁছিল। কেরাণী তাহার আর এক এক খণ্ড পরিষ্কার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া, সাত দিনের মিয়াদ লিখিয়া দিয়া, কালেক্টরদিগের নিকট পাঠাইলেন। যে পথে মহাজন যায়, সেই পথ,—দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত কালেক্টর বাহাদুর, চুরট খাইতে খাইতে চিঠির কোণে লিখিলেন, "সব্‌ডিবিজন্ ও ডেপুটিগণ বরাবর।" চিঠি এইরূপে বড় ডাকঘর হইতে মেজো ডাকঘরে, মেজো ডাকঘর হইতে ছোট ডাকঘরে, এবং তথা হইতে শেষে আটচালানিবাসী বোতামশূন্য চাপকানধারী কাল-কোল নাদুস-নুদুস ডিপুটি বাহাদুরেরা ছিন্নপাদুকামণ্ডিত শ্রীপাদপদ্মযুগলে মধুলব্ধ ভ্রমরের ন্যায় আসিয়া পড়িল। ডিপুটি বাহাদুরেরা উপরস্থ মহাত্মাদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজি চিঠির বাঙ্গালা পরওয়ানা করিয়া সব্‌ইন্‌স্পেক্টরগণের নিকট ফেলফোর রিপোর্ট তলব করিলেন—সব্‌ইন্‌স্পেক্টর পরওয়ানা কনষ্টেবলের হাওয়ালা করিল—কনষ্টেবল যে গ্রামে বাঁধ, সেইখানে কাল কোর্ত্তা, কাল দাড়ি এবং মোটা রুল লইয়া দর্শন দিয়া এক অন্নাভাবে শীর্ণ ক্লিষ্ট চৌকিদারকে ধরিল। ধরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোদের গাঁয়ের বাঁধ থাকে না কেন রে?" চৌকিদার ভীত হইয়া বলিল, "আজ্ঞা, জমীদারে মেরামত করে না, আমি গরিব মানুষ কি করিব?" কনষ্টেবল তখন জমীদারী কাছারীতে পদরেণু অর্পণ করিয়া গোমস্তাকে কিছু তম্বী করিলেন। গোমস্তা জমীদারী খাতায় পাঁচ টাকা

খরচ লিখিয়া কনষ্টেবল বাবুকে দেড় টাকা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। কনষ্টেবল আসিয়া সব্‌ইন্‌স্পেক্টর সমক্ষে রিপোর্ট করিলেন, "বাঁধ সব বেমেরামত—জমীদার মেরামত করে না—জমীদার মেরামত করিলেই মেরামত হইতে পারে।" ডিপুটি বাহাদুর লিখিলেন, "বাঁধ সব বেমেরামত,—জমীদারেরা মেরামত করে না—তাহারা মেরামত করিলেই হয়।" কালেক্টর বাহাদুর সেই সকল কথা লিখিলেন, অধিকন্তু "এক্ষণে জমীদারদিগকে বাঁধ মেরামত করিতে বাধ্য করা উচিত।" কমিশ্যনর সেই সকল কথা লিখিয়া বোর্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি প্রকারে জমীদার বাঁধ-মেরামত করিতে বাধ্য হইতে পারে?" বোর্ড্ তত্তদুক্তি পুনরুক্ত করিয়া, একটা যাহা হয় উপায় নির্দিষ্ট করিলেন। সেক্রেটরি সাহেব সেই সকল কথা সাজাইয়া লিখিয়া এক রিজলিউসনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন, লেঃ গবর্ণর সাহেব সম্মত হইয়া তাহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। আজ্ঞা দেশে প্রচারিত হইল; লেঃ গবর্ণর বাহাদুরের যশ দেশবিদেশে ঘোষিল। যাহারা মিত্রপক্ষ, তাহারা গবর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা করিতে লাগিল—শত্রুপক্ষ নানাজাতীয় ইংরেজী বাঙ্গালায় তাঁহাকে গালি পাড়িতে লাগিল। নষ্টের গোড়া চৌকিদার নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে কোদালি পাড়িতে লাগিল।

বাস্তবিক যে এইরূপ কোন প্রকৃত ঘটনা ঘটিয়াছে, এমত নহে। একটি কল্পিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এ সকল কথা লিখিলাম। এইরূপ যে সচরাচরই ঘটিয়া থাকে, এমত নহে। কিন্তু অনেক সময়ে ঘটে। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহারা সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা, তাঁহারা এ প্রথা অবলম্বন করেন না, অযোগ্যেরা করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্যপ্রণালীকে "কলে শাসন" বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মের কলের ন্যায় শাসনের কলও বাতাসে নড়িয়া থাকে; কোন দিক্ হইতে কোন কর্ম্মচারীর রিপোর্টের বাতাস বা অন্য প্রকার ফাপি উঠিয়া কলে লাগিলে কল চলিতে আরম্ভ করে; তদন্তের হুকুম হইতে কলের দম আরম্ভ হইয়া বোর্ড কমিশ্যনর প্রভৃতি অধোধঃ পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া আবার লেঃ গবর্ণর পর্য্যন্ত আসিয়া সহি মোহরের মঞ্জুরি মুদ্রিত করিয়া দিয়া বন্ধ হয়। যেমন কলের ধুতি, কলের সূতা প্রভৃতি সামগ্রী আছে, তেমনি কলের তৈয়ারি রাজাজ্ঞাও আছে।

যে লেঃ গবর্ণর এইরূপ কলে শাসন করেন, তিনি সুমানুষ হইলে হইতে পারেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা বা অন্য কোন গুণের প্রশংসার কারণ দেখা যায় না। তিনি কখন আপন বুদ্ধির চালনা করেন না, কোন বিষয়ের সদ্বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজে কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কখনও কোনও নূতন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন না; পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন বিষয়ের যাথার্থ্য স্বয়ং মীমাংসা করেন না। তিনি শাসনযন্ত্রের একটি অংশ মাত্র—যখন রাজ্যের কল বাতাসে নড়িল, তখন তিনিও নড়িলেন, কলে চালিত হইয়া মঞ্জুরিলিপি সমেত সহিমোহর করিয়া দিয়া কলে থামিলেন। সেইরূপ ঘণ্টা পূর্ণ হইলে, ঘড়ির মুরদ, বাহির হইয়া, ঠংঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া আবার কলে মিশিয়া যায়।

সর্ উইলিয়ম্ গ্রে ও সর্ জর্জ্ কাম্বেলে প্রধান প্রভেদ এই যে, সর্ উইলিয়ম্ গ্রে কলে শাসন করিতেন, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ তাহা করিতেন না।

কলে শাসনের অনেক গুণ আছে। তাহার ফল ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকের

অসন্তোষের সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা নিতান্ত অনিষ্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট; পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি অত্যন্ত অনিষ্টকারী হইলেও লোকে তাহার সংশোধনে অসন্তুষ্ট। পুরাতনের মন্দও ভাল, নূতনের ভালও মন্দ। কলের শাসন শাসনই নহে; যিনি কলে শাসন করেন, তিনি কিছু করেন না বলিলেই হয়। অতএব কলের শাসনে পুরাতনের কিঞ্চিন্মাত্র সংস্করণ ভিন্ন নূতন কখন ঘটে না। যাহা আছে, তাহাই প্রায় বজায় থাকে, যাহা নাই অথচ আবশ্যক, প্রায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। এজন্য লোকেরও অসন্তোষ জন্মে না; বিশেষ এদেশীয় লোক পুরাতনের অত্যন্ত অনুরাগী, নূতনে অত্যন্ত বিরক্ত।

সর্ উইলিয়ম্ গ্রে, কলে শাসন করিতেন, সুতরাং লোকের বড় প্রিয় ছিলেন। সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ কলে শাসন করিতেন না, এজন্য লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যশাসন উভয়েরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সর্ উইলিয়ম্ গ্রের উদ্দেশ্য ছিল কেবল শাসনের কল চালান; সর্ জর্জ্ কাম্বেলের উদ্দেশ্য, শাসনের উদ্দেশ্য সফল করা। এমত বলিতেছি না যে, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনে সুফল ফলিয়াছে, সর্ উইলিয়ম্ গ্রের শাসনে কুফল ফলিয়াছে, এ কথা বলাও আমাদের অভিপ্রায় নহে। কেবল বলিতে চাই যে, সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ আপন বুদ্ধিতে চলিতেন, এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। সর্ উইলিয়ম্ গ্রে এ সকল কিছুই করিতেন না। যাহা হয়, আপনি হউক; কেহ কল টিপিয়া দেয় ত কল চলুক,—আমি কিছুর মধ্যে থাকিব না। নিজের বুদ্ধি, গ্রে সাহেব প্রায় খরচ করিতেন না; জমার অঙ্কে কিছু ছিল কি না বলা যায় না। নিজের যত্ন প্রায় তাঁহার কোন বিষয়ে ছিল না। তাঁহার দ্বারা যে কিছু সৎকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—তাহা কলে; তাঁহার দ্বারা যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা কলে। তিনি উচ্চ শিক্ষার পোষক ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালীমহলে বড় প্রশংসিত; কিন্তু বাঙ্গালী-বাবুদিগের মত, আসল কথাটা কি, তাহা বুঝেন নাই; কেবল আট্‌কিন্সন্ সাহেব কল টিপিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কলের পুত্তলী সর্ উইলিয়ম্ গ্রে উচ্চশিক্ষার পোষকতা করিয়াছিলেন, ঘড়ির মুরদ ঘড়ি পিটিয়া দিয়া কলে লুকাইয়াছিলেন।

এমন নহে যে, সর্ জর্জ্ কাম্বেলের সময় কলে শাসন একেবারে ছিল না। শাসনের কল চিরকাল বজায় আছে, যিনি ইচ্ছা, তিনি শাসনকর্ত্তা হউন, সে কল মধ্যে মধ্যে বাতাসে নড়িবে; সকল শাসনকর্ত্তাকেই শাসনের কল চালাইয়া কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ কলে সিদ্ধ তত্ত্বগুলি অবশ্যগ্রাহ্য মনে করিতেন না; ইচ্ছানুসারে তাহা ত্যাগ করিতেন; ইচ্ছানুসারে তত্তৎস্থানে নূতন সিদ্ধান্ত আদিষ্ট করিতেন। সর্ জর্জ্ কাম্বেল্ কল নিজে চালাইতেন, স্বয়ং কলের অংশ ছিলেন না।

বাঙ্গালার ইতিহাস*

সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান্, ষ্টুয়ার্ট্ প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ-পূরাণ মাত্র।

ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড়প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য শুভের নাম "দৈব," অশুভের নাম "দুর্দ্দৈব"। এরূপ মা-সিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেব-কীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ হয় দেবতার আংশিক অবতার, নয় দেবতানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্ব্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গর্ব্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এই জন্য আমাদের ইতিহাস নাই।

অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে।

এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কিন্তু অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান্ বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা

---

* প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস। শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল, বিরচিত। মেসূর্যার্স্ জে জি চাটুর্য্যা এণ্ড কোং কলিকাতা। বঙ্গদর্শন ১২৮১।

যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণবাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষাথ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অৰ্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।

মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন ; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে ; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালকশিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালকশিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন। যাঁহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না।

প্রথম। কাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালীর প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীরা আসিয়াখণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতিসদৃশ। বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীরা আর কিছুতে হউক না হউক, ঔপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরাজিত, এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্ত ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।

দ্বিতীয়। বাঙ্গালী রাজগণ অনেক সময়ে উত্তরভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। পালবংশীয় দেবপালদেব ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া কীর্ত্তিত। লক্ষ্মণসেনের জয়স্তম্ভ বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে সংস্থাপিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্ততঃ ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। বাঙ্গালীরা গঙ্গাবংশ পরিচয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধীশ্বর ছিলেন। যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয়পতাকা হিমালয়মূলে, যমুনাতটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে, এবং বালিদ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্ত্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গী সেনা কর্ত্তৃক কেবল মধ্যবঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার অধিপতি থাকিয়া স্বাধীনভাবে সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। "পাঠানেরা ৩৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তথাপি কোন কালে সমুদায় বাঙ্গালার অধিপতি হয়েন নাই। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই ; দক্ষিণে সুন্দরবনসন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিল ; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল ; এবং উত্তরে কুচবেহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং পাঠানেরা যে সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও বাঙ্গালার অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।" * বাঙ্গালার অধঃপতন একদিনে ঘটে নাই।

চতুর্থ। পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই। রাজা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। সে সময়ের জমীদারদিগের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া বোধ হয় ; তাঁহারা করদ ছিলেন মাত্র। পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালাব শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবিভূ‍র্ত ; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি ; এই সময়ে স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন, এই সময়েই চৈতন্যদেব ; এই সময়েই বৈষ্ণবগোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী,—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণবসাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই ইঁহাদিগের সকলেরই আবিভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।

সেই সময়ের বাহ্য সৌষ্ঠব সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবু কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন।

"লিখিত আছে যে, হোসেন শাহার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনিগণ স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যিনি নিমন্ত্রিতসভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন, তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয়, তদ্দ্বারাও তাৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক তখন এ দেশে স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইয়াছিল এবং গৌড়ে যেখানে সেখানে মৃত্তিকা খনন করিলে যেরূপ ইষ্টক দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমান হয় যে, নগরবাসী বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করিত। † দেশে অনেক

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯ পৃষ্ঠা।

† গৌড়ের ইষ্টক লইয়া, মালদহ, ইংরেজবাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ী, কাসিমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে ; এই সকল নগর অট্টালিকাপূর্ণ, কিন্তু তথায় অন্য কোন ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। গৌড়ের ইষ্টক মুরশিদাবাদের ও রাজমহলের নির্ম্মাণেও লাগিয়াছে। এখনও

ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং তাঁহাদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল ; পাঠানরাজ্য ধ্বংসের কিয়ৎকাল পরে সঙ্কলিত আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালার জমীদারেরা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮, পদাতিক ১৮০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।”

পঞ্চম। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজের শাসন পর্য্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য ? তক্ততাউসের কথা পড়িয়া যখন মোগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার কত ধান তাহাতে লাগিয়াছে ? যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দর, ফতেপুরসিকরি বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহা জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয়, তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে ? যখন শুনি যে, নাদের শাহা বা মহারাষ্ট্রীয় দিল্লী লুঠ করিল, তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে ? বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য দিল্লীর পথে গিয়াছে ; সে পথে বাঙ্গালার ধন ইরান তুরান পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগল কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে ? কীর্ত্তির মধ্যে “আসল তুমার জমা।” কীর্ত্তি কি অকীর্ত্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত।

বাঙ্গালার কলঙ্ক*

যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন।

যাহা আছে, তাহাও অপরিমিত। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধ হয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল।

* প্রচার, ১২৯১, শ্রাবণ।

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালির বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালির চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখনও কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালির চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ নর্ম্মানের অধীন হইয়াছিল, জর্ম্মানি প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি, রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, সে কথার কোন মূল নাই; বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না।

বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠি শড়কিওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল অনৈতিহাসিক কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।

পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাঁহার মতের সংপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাঁহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট

করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন। গথ্‌ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেন-পাল সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি। সে কথাগুলি এই—

ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তার পর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেনবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন। সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পালবংশীয়েরা মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের সিপাহি পল্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিত দ্বার, এবং বেহারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট সিপাহিমধ্যে গণ্য। অথচ আমরা রাজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বে দেখিতে পাইতেছি, পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা বেহার জয় করিয়াছিল। সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে গুপ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গালী কর্ত্তৃকই বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজি কথা না হয় ছাড়িয়া দিই।

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস্‌ গাঙ্গারিডি Gangaridae নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জনপদের স্থান নির্ণয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেইখানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্ব্ব সীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের ঐ Gangaridae শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্ভব—সুরাষ্ট্র (সুরট), মধ্যরাষ্ট্র (মেবাড়) গুর্জ্জররাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি দেশের নাম যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট্‌ বা গঙ্গারাঢ় হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট্‌ শব্দ বা রাঢ় শব্দ প্রচলিত থাকিবে। সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ, "গঙ্গাতীরস্থ" শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকে "তীরস্থ" বলে। ত্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম "তীরভুক্তি"। এস্থলেও গঙ্গাশব্দ পরিত্যাগ হইয়া কেবল "তীর" শব্দ আছে। গঙ্গারাঢ়ও সেই জন্য এখন "রাঢ়" শব্দে দাঁড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ়দেশ একটি পৃথগ্রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস্‌ বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু,

কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে, স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেকজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেগজাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থানস্। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।

অনেকে বলিবেন যে, কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাঢ়ীদিগের নাম কখন আমরা কেহ পূর্ব্বে শুনি নাই। যখন মার্সমান্ প্রভৃতি ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের কাছে আমরা স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাঢ়ার নাম আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু গঙ্গারাঢ়ী নাম আমরা নূতন পড়িলাম না, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। যেখানে দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস্ Gangaridae বলেন, সেই প্রদেশবাসীদিগকেই লোকে এখন রাঢ়ী বলে, আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢ়ী নামের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমরা কেবল সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে অবগত আছেন, মাকেঞ্জির সংগ্রহ (Mackenzie's Collection) নামে কতকগুলি দুর্লভ ভারতবর্ষীয় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সেগুলি মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে। অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা উইল্‌সন্ সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, লিখিত আছে যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাঢ়ী নাম নূতন গড়ি নাই। তবে অনভিজ্ঞ ইংরাজেরা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই যে অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর পূর্ব্বগৌরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ। উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ, ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গাবংশীয়েরা দক্ষিণদেশ হইতে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গা বা চোরগঙ্গা নামে একজন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন করেন। এ কথাটি মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমময় রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী ছিলেন,* এই কথা যাহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন। উইল্‌সন্ সাহেবের কথিত গ্রন্থে কথিত পৃষ্ঠাতেই যে একখানি শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাঢ়ী কোলাহলহ উড়িষ্যা-

* "বর্ম্মা" শব্দে বুঝাইতেছে যে, উঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব না, তবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণকেই বা বাঙ্গালী বলিব কেন?

বিজেতা এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না।

ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবিভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত। বাঙ্গালার পাঠানেরা যত বার তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তত বার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত হইয়াছিল। বরং গাঙ্গবংশীয়েরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত। একদা লাঙ্গলীয় নরসিংহ নামে একজন গঙ্গাবংশীয় রাজা বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানের ঐরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় এবং নগর আক্রমণ করিয়া লুঠপাঠ করিয়া পাঠানের সর্ব্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান। উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-রাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।

এই সকল কথার পর্য্যালোচনা করিয়া, হণ্টর্ সাহেব সেকালের উড়িষ্য-সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাঢ়ীসৈন্যের প্রাপ্য। সকলেই জানেন যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুদায় এবং যাহা বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্ম্মান্ উইলিয়ম্ ইংলণ্ড জয় করিয়া নর্ম্মাণ্ডির রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গা-বংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক উড়িষ্যায় বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত রহিল, ইহাই সম্ভব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধিকার ছিল। বাঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, কাজেই প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাঢ়ীগণ কর্ত্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাঢ়ী বাঙ্গালীরা যদি এত বলবিক্রম-যুক্ত ছিল, তবে অন্যান্য বাঙ্গালীরা এত হীনবীর্য্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য বাঙ্গালীরা রাঢ়ীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিল, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বাঙ্গালীদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। রাঢ়দেশের কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল,* এবং সেনরাজারা যে, উহা গাঙ্গবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা

* এই জন্যই কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য পৃথক্ হওয়াতে সমাজও পৃথক্ হইয়াছিল।

করা অসঙ্গত হয় না ; অন্য বাঙ্গালীদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই—কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন্ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশই হয় নাই, ইহা "ভারতকলঙ্ক" শির্ষক প্রবন্ধে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ—(১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা। বাঙ্গালা জয় যে সহজে হয় নাই, ইহার প্রমাণ দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা যতটুকু লিখিয়াছি, তাহাই এ ক্ষুদ্র পত্রের পক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা *

যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিম্ ও ওয়াটর্লু ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই ?

বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল—অসার, আমাদিগের পুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীর কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার ; চৈতন্যের ধর্ম্ম ; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায় ; জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল ? দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে। বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে ?

সেই সার কথা কোথা পাইব, বাঙ্গালার ইতিহাস আছে কি ? সাহেবেরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট্ সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শ্‌মান্ লেথব্রিজ্ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ।

কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।

সতের জন অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ উপন্যাসেব ঐতিহাসিক প্রমাণ কি? মিনৃহাজ্ উদ্দীন বাঙ্গালা জয়ের ষাট বৎসর পরে এই এক উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমি যদি আজ বলি যে, কাল রাত্রে আমি ভূত দেখিয়াছি, তোমরা তাহা কেহ বিশ্বাস কর না। কেন না, অসম্ভব কথা। আর মিনৃহাজ্ উদ্দীন তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তোমরা অম্লানবদনে বিশ্বাস কর। আমি জীবিত লোক, তোমাদের কাছে পরিচিত, আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু সে সাত শত বৎসর মরিয়া গিয়াছে, সে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী কিছুই জান না, তথাপি তুমি তাহার কথায় বিশ্বাস কর। আমি বলিতেছি, আমি নিজে ভূত দেখিয়াছি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না, অথচ ভূত আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বলিয়া বলিতেছি। আর মিনৃহাজ্ উদ্দীনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, জনশ্রুতি মাত্র। জনশ্রুতি কি স্বকপোলকল্পিত, তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আমার প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে তোমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু সেই গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর, মুসলমানের স্বকপোলকল্পনের উপর তোমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের আর কোন কারণ নাই, কেবল এই মাত্র কারণ যে, সাহেবরা সেই মিনৃহাজ্ উদ্দীনের কথা অবলম্বন করিয়া ইংরেজিতে ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহা পড়িলে চাকরী হয়! বিশ্বাস না করিবে কেন?

তুমি বলিবে যে, তোমার ভূতের গল্প বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই যে, ভূত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। আরিস্‌টটল্ হইতে মিল্ পর্য্যন্ত সকলে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভাই বাঙ্গালি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, সতের জন লোকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে বিজিত করিল, এইটাই কি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুমত। যদি তাহা না হয়, তবে হে চাকরীপ্রিয়! তুমি কেন এ কথায় বিশ্বাস কর?

বাস্তবিক সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বাঙ্গালা জয় করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সপ্তদশ অশ্বারোহী দূরে থাকুক, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বহুতর সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। বখ্‌তিয়ার খিলিজির পর সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ববাঙ্গালায় বিরাজ করিয়া অর্দ্ধেক বাঙ্গালা শাসন করিয়া আসিলেন। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। উত্তরবাঙ্গালা, দক্ষিণবাঙ্গালা, কোন অংশই বখ্‌তিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার

পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বত্র। ইতিহাসে কথিত আছে, পলাশির যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গসেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল। কথাটি উপন্যাসমাত্র। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ্গ তামাসা হইয়াছিল। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত সএর মুতাখ্‌খরীন্ নামক গ্রন্থ পড়িয়া দেখ।

নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে, মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত, তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখন ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গলার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, ইঁহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।

অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন্ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

বাঙ্গালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙ্গালীরা আর্য্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙ্গালীই কি আর্য্য? ব্রাহ্মণাদি আর্য্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, ডোম, মুচি, কাওরা, ইহারাও কি আর্য্যজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল? ইহারা কোন্ অনার্য্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? আর্য্যেরা আগে, না অনার্য্যেরা আগে? আর্য্যেরা কবে বাঙ্গালায় আসিল? কোন্ গ্রন্থে কোন সময়ে আর্য্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্য্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপ্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমন কোন প্রমাণ পাও যে, আদিশূরের

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর্য্যাধিকার হইয়াছিল, প্রকাশ কর। নহিলে বাঙ্গালী আধুনিক জাতি।

মধ্যকালে অর্থাৎ আদিশূরের কিছু পূর্ব্বে, বাঙ্গালা যে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাহা চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থের দ্বারা এক প্রকার প্রমাণীকৃত হইতেছে। কয়টি রাজা ছিল, কোন্ কোন্ রাজ্য, প্রজারা কোন্ জাতীয়, তাহাদিগের অবস্থা কি, মগধের সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধ কি, রাজা কে?

মুসলমানদিগের সমাগমের পূর্ব্বে পালরাজ্য ও সেনরাজ্য যে একীকৃত হইয়াছিল, তাহা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র একপ্রকার প্রমাণ করিয়াছেন। সন্ধান কর, কি প্রকারে দুই রাজ্য একীকৃত হইল। একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্ত্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব কি প্রকার আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত? কতপ্রকার রাজকর্ম্মচারী ছিল, কে কোন্ কার্য্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্‌রূপে কার্য্য সমাধা করিত? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল? ধান্য কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখ দুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য্য, পূর্ত্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্ব্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য, কোন্ ধর্ম্ম কত দূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কত দূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক,—স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষ গুণ কি কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙ্গালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্ম্মভয় কিরূপ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ? বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকার প্রকার কিরূপ ছিল? কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্ ও লগ্‌বুক্ ভিন্ন কিপ্রকারে নৌযাত্রা নির্ব্বাহ করিত? বালী ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালীর উপনিবেশ? প্রমাণ কি? ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য্য কিপ্রকারে নির্ব্বাহ হইত?

তার পর মুসলমান আসিল। সপ্তদশ অশ্বারোহীতে বাঙ্গালা যে জয় করিয়াছিল, তাহা ত মিথ্যা কথা সহজেই দেখা যাইতেছে। বখ্‌তিয়ার খিলিজি কতটুকু বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, কিপ্রকারে জয় করিয়াছিল? লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর বাঙ্গালার অবশিষ্টাংশ কি অবস্থায় ছিল? সে সকল দেশে কে রাজা ছিল? অবশিষ্ট অংশের কিপ্রকারে স্বাধীনতা লুপ্ত হইল? কবে লুপ্ত হইল?

পরে স্বাধীন পাঠান-সাম্রাজ্য। পাঠানেরা কতটুকু বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন? যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, সেটুকুর সঙ্গে তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল? সেটুকু কিপ্রকারে শাসন করিতেন? আমি যতদূর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস আছে যে, পাঠানেরা কস্মিন্ কালে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। স্থানে স্থানে তাঁহারা সৈনিক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া উপনিবেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল শাসন করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের আমলে বাঙ্গালীই বাঙ্গালা শাসন করিতেন। হিন্দুরাজগণের অধিকার-সময় হইতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালাদেশ অধিকাব করিত; যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি। ইঁহারাই দুনিয়ার মালিক ছিলেন। ইঁহাবাই রাজস্ব আদায় করিতেন, দণ্ডবিধান করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার রাজ্যশাসন কবিত। মুসলমান সম্রাটেরা বড় বড় লড়াই পড়িলে লড়াই করিতেন অথবা করিতেন না। অধীনস্থ রাজগণের নিকট কর লইতেন অথবা পাইতেন না। ইউরোপের মধ্যকালে ফ্রান্সরাজ্যের রাজার সহিত বর্গণ্ডী, আঁজু প্রবেন্স্ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত। কখন কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল। এ বিষয়ে যত দূর অনুসন্ধান করিতে পার, কর। কোন্ কোন্ প্রদেশ কত কাল শাসন করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কর। তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত ইতিহাস লেখ।

ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীকসাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ফিরিয়া পাইয়া যেমন বর্ষার জলে শীর্ণা স্রোতস্বতী কূলপরিপ্লাবিনী হয়, যেমন মুমূর্ষু রোগী দৈব ঔষধে যৌবনের বলপ্রাপ্ত হয়, ইউরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইল। আজ পেত্রার্ক্, কাল লুথর, আজ গেলিলিও, কাল বেকন্; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তার পর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন, এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্ব্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে?

আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্ম্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমল্লের আমলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর।

প্রমাণ করিবার আগে বল যে, যে বাঙ্গালা ভাষা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের কবিতায় এ ভাস্বতী কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়াছিল, এ বাঙ্গালা ভাষা কোথা হইতে আসিল। বাঙ্গালা ভাষা আত্মপ্রসূতা নহে। সকলে শুনিয়াছি, তিনি সংস্কৃতের কন্যা; কুললক্ষণ কথায় কথায় পরিস্ফুট। কেহ কেহ বলেন, সংস্কৃতের দৌহিত্রী মাত্র। প্রাকৃতই এঁর মাতা। কথাটায় আমার বড় সন্দেহ আছে। হিন্দী, মারহাট্টী প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্রী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা যেন সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে কার্য্যের স্থানে কজ্জ বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্য্যের স্থানে কায্যি বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জুলিও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অননুগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক—প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর স্থানচ্যুত হইল? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুঁজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য্য ভাষা কত দূর মিশ্রিত হইয়াছে। ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্ সময়ে কত দূর মিশিয়াছে?

মোগল বাঙ্গালা জয় করিয়া শাসন একটু কঠিনতর করিয়াছিল, সেটুকু কত দূর? রাজ্যও একটু অধিক দূর বিস্তৃত করিয়াছিল, সেটুকুই বা কত দূর? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কি? তাহার আগে কি ছিল? তোড়লমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্তের ফল কি হইল? মুরশীদ কুলি খাঁ তাহার উপর কি উন্নতি বা অবনতি করিয়াছিল? জমীদারদিগের উৎপত্তি কবে? কিসে উৎপত্তি হইল? মোগল-সাম্রাজের সময় তাহাদিগের কি প্রকার অবস্থা ছিল? মোগলসাম্রাজ্যের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব কিরূপ ছিল? কোন্ সময়ে কিপ্রকারে বৃদ্ধি পাইল? মুসলমানেরা দেশের রাজা ছিল, কিন্তু জমীদারী সকল তাহাদিগের করগত না হইয়া হিন্দুদিগের করগত হইল কিপ্রকারে? জমীদারদিগের কি ক্ষমতা ছিল? তখনকার জমীদারদিগের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ের জমীদারদিগের এবং বর্ত্তমান জমীদারদিগের কি প্রভেদ?

মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছিল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাকিয়া দিল্লীর পথে গিয়াছিল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন বিভাগমাত্র হইয়াছিল। কিন্তু উভয় সময়ের সামাজিক চিত্র চাই। সামাজিক চিত্রের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব ধর্ম্মবল। এখন ত দেখিতে পাই, বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে,

ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দ্ধেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই।

বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ*

কামরূপ—রঙ্গপুর

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে—কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র। আমাদের কথা দূরে থাক, ইংরেজ ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এই ভ্রান্তির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। "বাঙ্গালার ইতিহাস" ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি; কেন না, সেন, পাল ও বখ্‌তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল, তেমনি আরও অনেকগুলি পৃথক্ রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না; কেন না, বাঙ্গালাই তখন ছিল না। সেগুলি কোন একটি রাজ্যের অংশ ছিল না—সকলই পৃথক্ পৃথক্ স্বস্বপ্রধান। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্য-জাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। কিন্তু সর্ব্বত্র প্রায় আর্য্য প্রধান; এই আর্য্যেরাই এই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আর্য্যদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আগে একধর্ম্ম, একভাষা, তার পর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল।

কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র, ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ, মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারেন নাই। মোগলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আধুনিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইতে পারেন নাই।

অতএব যে অর্থে গ্রীসের ইতিহাস আছে, রোমের ইতিহাস আছে, সে অর্থে বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। যেমন আধুনিক ফ্লোরেন্সের ইতিহাস লিখিলে বা মিলানের ইতিহাস

* বঙ্গদর্শন, ১২৮১, জ্যৈষ্ঠ।

লিখিলে বা নেপল্‌সের ইতিহাস লিখিলে আধুনিক ইতালির ইতিহাস লেখা হয় না, বাঙ্গালারও কতক তেমনি। কিন্তু ইতালি বলিয়া দেশ ছিল : বাঙ্গালা বলিয়া দেশ ছিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস আরম্ভ মোগলের সময় হইতে।

আমরা বাঙ্গালার ঐতিহাসিক ধ্যান এখন আর পরিস্ফুট না করিয়া, যাহা বলিতেছি বা বলিব, আগে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে উত্তর পূর্ব্ব বাঙ্গালার কথা বলিব। দেখা যাউক, কবে এ অংশ বাঙ্গালাভুক্ত হইয়াছে, কবেই বা বাঙ্গালার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

যেমন এখন যাহাকে বাঙ্গালা বলি, আগে তাহা বাঙ্গালা ছিল না, তেমনি এখন যাহাকে আসাম বলি, তাহা আসাম ছিল না। অতি অল্পকাল হইল, আহম নামে অনার্য্য জাতি আসিয়া ঐ দেশ জয় করিয়া বাস করাতে উহার নাম আসাম হইয়াছিল। সেখানে, যথায় এখন কামরূপ, তথায় অতি প্রাচীন কালে এক আর্য্যরাজ্য ছিল। তাহাকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বলিত। বোধ হয়, এই রাজ্য পূর্ব্বাঞ্চলের অনার্য্যভূমিমধ্যে একা আর্য্য জাতির প্রভা বিস্তার করিত বলিয়া ইহার এই নাম। মহাভারতের যুদ্ধে প্রাগ্‌-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্য্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার অধিবাসী, তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তাহারা অনার্য্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গালা যে সময়ে অনার্য্যভূমি, সে সময়ে আসাম যে আর্য্যভূমি হইবে, ইহা এক বিষম সমস্যা। কিন্তু তাহা অঘটনীয় নহে। মুসলমানদিগের সময়ে ইংরেজ-দিগের এক আড্ডা মান্দ্রাজে, আর আড্ডা পিপ্পলী ও কলিকাতায়, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সকলের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার ইতিহাস আছে বলিয়া বুঝিতে পারি। তেমনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের আর্য্যদিগের ইতিহাস থাকিলে, তাহাদিগের দূর গমনের কথাও বুঝিতে পারিতাম। বোধ হয়, তাহারা প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগেই বাস করিয়াছিল। তার পর আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যজয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেখানকার অনার্য্য জাতি সকল দূরীকৃত হইয়া, ঠেলিয়া উত্তরপূর্ব্বমুখে আসিয়া বাঙ্গালা দখল করিয়াছিল। তাহাদেরই ঠেলাঠেলিতে অল্পসংখ্যক আর্য্য ঔপনিবেশিকেরা সরিয়া সরিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এক সময়ে এই কামরূপ রাজ্য অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। পূর্ব্বে করতোয়া ইহার সীমা ছিল ; আধুনিক আসাম, মণিপুর, জয়ন্তা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইহার অন্তর্গত ছিল। আইন আকবরীতে লেখে যে, ভগদত্তের বংশের ২৩ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। যাহাই হউক, পৃথুনামা রাজার পূর্ব্বে কোন রাজার নামের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। পৃথু রাজার রাজধানী তল্মানামে নদীতীরে, চাকলা ও বোদা পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ছিল, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। কথিত আছে, কীচক নামে এক ম্লেচ্ছজাতির দ্বারা পৃথু রাজা আক্রান্ত হয়েন। ম্লেচ্ছের স্পর্শের ভয়ে তিনি এক সরোবরের জলে অবগাহন করেন। তথায় নিমজ্জনে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তার পর পালবংশীয়েরা রঙ্গপুরে রাজা হয়েন। ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুর কামরূপ হইতে কিয়ৎকালজন্য পৃথক্‌ রাজ্য হইয়াছিল। বোধ হয়, রঙ্গপুরে পালবংশের প্রথম রাজা

ধর্ম্মপাল। এই পালেরা ইউরোপের বুর্বো বংশের আর আসিয়ার তৈমুরবংশের ন্যায় নানা দেশে রাজা ছিলেন। গৌড়ে পাল রাজা, মৎস্যে পাল রাজা, রঙ্গপুরে পাল রাজা, কামরূপে পাল রাজা ছিল। বোধ হয়, এই রাজবংশ অতিশয় প্রতাপশালী ছিল। ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, ডিমলার দক্ষিণে আজিও আছে। তাহার ক্রোশেক দূরে, রাণী মীনাবতীর গড ছিল। রাণী মীনাবতী ধর্ম্মপালের ভ্রাতৃজায়া। মীনাবতী অতি তেজস্বিনী ছিলেন—বড় দুর্দ্দান্তপ্রতাপ। গোপীচন্দ্র নামে তাঁহার পুত্র ছিল। মীনাবতী ধর্ম্মপালকে বলিলেন, "আমার পুত্র রাজা হইবে, তুমি কে ?" ধর্ম্মপাল রাজ্য না দেওয়াতে মীনাবতী সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইলেন, রাজমাতা তাঁহাকে রাজ্য করিতে দিবেন না, স্বয়ং রাজ্য করিবেন ইচ্ছা। পুত্রকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার এক শত মহিষী করিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্র ভুলিল না। তখন মাতা পুত্রকে ধর্ম্মে মতি দিতে লাগিলেন। এইবার পুত্র ভুলিয়া, যোগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, বনে গমন করিলেন।

গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র রাজা হইলেন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, গবচন্দ্র পাত্রের কথা শুনিয়াছেন ? এই সেই হবচন্দ্র। নাম হবচন্দ্র নয়—ভবচন্দ্র, আর একটি নাম উদয়চন্দ্র। ভবচন্দ্র গবচন্দ্রের বুদ্ধিবিদ্যার পরিচয় লোকপ্রবাদে এত আছে যে, তাহার পুনরুক্তি না করিলেও হয়। লোকে গল্প করে, গবচন্দ্র, বুদ্ধি বাহির হইয়া যাইবে ভয়ে, ঢিপ্‌লে দিয়া নাক কান বন্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট নন, পাছে বুদ্ধি বাহির হইয়া যায় ভয়ে সিন্ধুকে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন, রাজার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলে, সিন্ধুক হইতে বাহির হইয়া, নাক কানের পুঁটলি খুলিয়া বুদ্ধি বাহির করিতেন। একদিন রাজার এইরূপ এক বিপদ্ উপস্থিত, নগরে একটা শূকর দেখা দিয়াছে। শূকর রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, এ কি জন্তু। বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীকে সিন্ধুক হইতে বাহির করিলেন। মন্ত্রী ঢিপ্‌লে খুলিয়া অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এটা অবশ্য হস্তী, না খাইয়া রোগা হইয়াছে, নচেৎ ইন্দুর, খাইয়া বড় মোটা হইয়াছে। আর একদিন দুই জন পথিক আসিয়া সায়াহ্নে এক পুষ্করিণীতীরে উত্তীর্ণ হইল। রাত্রে পাকশাক করিবার জন্য সরোবরতীরে স্থান পরিষ্কার করিয়া চুলা কাটিতে আরম্ভ করিল। নগরের রক্ষিবর্গ দেখিয়া মনে করিল যে, যখন পুকুর থাকিতেও তার কাছে আবার খানা কাটিতেছে, তখন অবশ্য ইহাদের অসৎ অভিপ্রায় আছে। রক্ষিগণ পথিক দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুতর সমস্যার কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া, পরম ধীমান্ পাত্র মহাশয়কে সিন্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তিনি নাক কানের ঢিপ্‌লে খুলিয়াই দিব্যচক্ষে কাণ্ডখানা দর্পণের মত পরিষ্কার দেখিলেন। তিনি আজ্ঞা করিলেন, "নিশ্চিত ইহারা চোর। পুকুরটা চুরি করিবার জন্য পাড়ের উপর সিঁধ কাটিতেছিল। ইহাদিগকে শূলে দেওয়া বিধেয়।" রাজা ভবচন্দ্র, মন্ত্রীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণেই পুষ্করিণীচোরদ্বয়ের প্রতি শূলে যাইবার বিধি প্রচার করিলেন।

কথা এখনও ফুরায় নাই। পুকুরচোরেরা শূলে যাইবার পূর্ব্বে পরামর্শ করিয়া হঠাৎ পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি আরম্ভ করিল। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই বিচিত্র কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কি? তখন একজন চোর নিবেদন করিল যে, "হে মহারাজ! দেখুন, দুই শূলের মধ্যে একটি বড়, একটি ছোট। আমরা জ্যোতিষ জানি। আমরা গণনা করিয়া জানিয়াছি যে, আজি যে ব্যক্তি এই দীর্ঘ শূলে আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, সে পুনর্জ্জন্মে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে, আর যে এই ছোট শূলে মরিবে, সে তাহার মন্ত্রী হইয়া জন্মিবে। মহারাজ! তাই আমি দীর্ঘ শূলে চড়িতে যাইতেছিলাম, এই হতভাগা আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে, আপনি বড় শূলে মরিয়া সম্রাট্ হইতে চায়।" তখন দ্বিতীয় চোর যোড় হাত করিয়া বলিল মহারাজ! ও কে যে, ও চক্রবর্ত্তী রাজা হইবে? আমি কেন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও ছোট শূলে চড়ুক, আমি সম্রাট্ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইবে।" তখন রাজা ভবচন্দ্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিলেন, "কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! তোরা চোর হইয়া জন্মান্তরে চক্রবর্ত্তী রাজা হইতে চাহিস্! সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র যদি কেহ থাকে, তবে সে আমি। আমি থাকিতে তোরা!!" এই বলিয়া রাজা ভবচন্দ্র তখন দ্বারিগণকে আজ্ঞা দিলেন যে, এই পাপাত্মাদিগকে তাড়াইয়া বাহির করিয়া দাও। এবং মন্ত্রিবরকে আহ্বানপূর্ব্বক সদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যের লোভে স্বয়ং উচ্চ শূলে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ও আগামী জন্মে তাদৃশ চক্রবর্ত্তী রাজার মন্ত্রী হইবার লোভে ছোট শূলে গিয়া চড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদের মানবলীলা সমাপ্ত হইল।

এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে—এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, সে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস। যে দেশে এই সকল প্রবাদ চলিত, সে দেশের লোকের বিবেচনা এই যে, রাজা রাজড়া সচরাচর ঘোরতর গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকে, হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। বাস্তবিক এই কথাই সত্য। বাঙ্গালায় চিরকাল সমাজই সমাজকে শাসিত ও রক্ষিত করিয়া আসিয়াছে। রাজারা হয় সেই বাঙ্গালা কবিকুলরত্ন শ্রীহর্ষ দেবের চিত্রিত বৎসরাজের ন্যায় মমের পুতুল, নয় এই ভবচন্দ্র হবচন্দ্রের ন্যায় বারোইয়ারির সং। আজকালের রাজপুরুষদের কথা বলিতেছি না, তাঁহারা অতিশয় দক্ষ। কথাটা এই যে, আমাদের এ নিরীহ জাতির শাসনকর্ত্তা বটবৃক্ষকে করিলেও হয়।

ভবচন্দ্রের পর কামরূপ রঙ্গপুর রাজ্যে আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পর মেছ গাবো কোচ লেপ্‌চা প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তারপর আবার আর্য্যজাতীয় নূতন রাজবংশ দেখা যায়। তাঁহারা কি প্রকারে রাজা হইলেন, তাহার কিছু কিম্বদন্তী নাই। এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজ কমতাপুর নামে নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার

ভগ্নাবশেষ আজিও কুচবেহার রাজ্যে আছে। ইহার পরিধি ১৯॥০ ক্রোশ, অতএব নগরী অতি বৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে সাত ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল, আর ২॥০ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর, গড়ের ভিতর গড়—মধ্যে রাজপুরী। সে কালের নগরীসকলের সচরাচর এইরূপ গঠন ছিল। শত্রুশঙ্কাহীন আধুনিক বাঙ্গালী খোল সহরে বাস করে, বাঙ্গালার সে কালের সহর-সকলের গঠন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

এই বংশের তৃতীয় রাজা নীলাম্বরের সময়ে রাজ্য পুনর্ব্বার সুবিস্তৃত হইয়াছিল দেখা যায়। কামরূপ, ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, আর মৎস্যের কিয়দংশ তাঁহার ছত্রাধীন ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান রাজারা দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে সর্ব্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত, অতএব অবসর পাইয়া নীলাম্বর তাঁহাদের কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন বোধ হয়। কমতাপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত তিনি এক বৃহৎ রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত করেন, অদ্যাপি সে বর্ত্ম সেই প্রদেশের প্রধান রাজবর্ত্ম। তিনি বহুতর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল। শচীপুত্র নামে তাঁহার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিল। শচীপুত্রের পুত্র কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল। নীলাম্বর তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু কেবল বধ করিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহার মাংস রাঁধাইয়া শচীপুত্রকে কৌশলে ভোজন করাইলেন। শচীপুত্র জানিতে পারিয়া দেশত্যাগ করিয়া গৌড়ের পাঠান রাজার দরবারে উপস্থিত হইল। শচীপুত্রের দেখান প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া, পাঠানরাজ (আমি কখনই গৌড়ের পাঠান-রাজাদিগকে বাঙ্গালার রাজা বলিব না।) নীলাম্বরকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর আর যাই হউন—বাঙ্গালার সেনকুলাঙ্গারের মত ছিলেন না। খড়কীর দ্বার দিয়া পলায়ন না করিয়া সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে মুসলমানকে পরাজিত করিলেন। তখন সেই ক্ষৌরিতমুণ্ড প্রতারক, যে পথে ট্রয় হইতে আজিকালিকার অনেক রাজ্য পর্য্যন্ত নীত হইয়াছে, চোরের মত সেই অন্ধকারপথে গেল। হার মানিল, সন্ধি চাহিল। সন্ধি হইল। ক্ষৌরিতমুণ্ড বলিল, "মুসলমানের বিবিরা মহারাণীজিকে সেলাম করিতে যাইবে।" মহারাজ তখনই সম্মত হইলেন। কিন্তু যে সকল দোলা বিবিদের লইয়া আসিল, তাহারা রাজপুরমধ্যে পৌঁছিল। তাহার ভিতর হইতে একটিও পাঠানকন্যা বা কোন জাতীয় কন্যা বাহির হইল না—যাহারা বাহির হইল, তাহারা শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত সশস্ত্র যুবা পাঠান। তাহারা তৎক্ষণাৎ রাজপুরী আক্রমণ করিয়া নীলাম্বরকে এক পিঞ্জরের ভিতর পুরিয়া গৌড়ে পাঠাইল। নীলাম্বর পথে পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, অধিকদিন জীবিত ছিলেন না; কেন না, কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

এ দেশে রাজা গেলেই রাজ্য যায়। নীলাম্বর গেলেন ত তাঁহার রাজ্য পাঠানের অধীন হইল। ইহার পূর্ব্বে মুসলমান কখন এ দেশে আইসে নাই। কিন্তু যখন নীলাম্বরের পর আর্য্যবংশীয় রাজার কথা শুনা যায় না, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, রঙ্গপুররাজ্য এই সময় পাঠানের করকবলিত হইল।

এই সময়ে—কিন্তু কোন্ সময়ে সেই আসল কথা! সন তারিখশূন্য যে ইতিহাস—সে

পথশূন্য অরণ্য তুল্য—প্রবেশের উপায় নাই —এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, বিখ্যাত পাঠানরাজ হোসেন শাহাই রঙ্গপুরের জয়বর্ত্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৯৭ সন হইতে ১৫২১ সন পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। মুসলমানেরা রঙ্গপুরের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিলেন। কামরূপ কোচেরা অধিকৃত করিয়াছিল। তাহারা রঙ্গপুরের অবশিষ্ট অংশ অধিকৃত করিয়া কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করিল।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ*

অনেকে, বাঙ্গালীর উৎপত্তি কি ?—এই প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইতে পারেন। অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুঁজিয়া কি হইবে ? তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় যাঁহারা একটু উন্নত, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বাঙ্গালীর উৎপত্তি ত জানাই আছে ; আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। যে জাতি বেদপাঠ কবিত, সংস্কৃতভাষায় কথা কহিত, যে জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্যসিংহের ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, আমরা সেই জাতির সন্তান ; এ কথা ত জানাই আছে। তবে আবার বাঙ্গালীর উৎপত্তি খুঁজিয়া কি হইবে ?

এ কথা সত্য, কিন্তু বড় পরিষ্কার নহে। লোকসংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালাদেশে বাস করে, বাঙ্গালাভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী জাতির সন্ততি ? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি ; কৈবর্ত্ত, জেলে, কোঁচ, পলি, ইহারাও কি তাঁহাদিগের সন্ততি ? তাহা যদি নিশ্চিত না হয়, তবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থে বাঙ্গালা পরিপূর্ণ নহে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যে প্রাচীন হিন্দুজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা মনে মনে স্পর্দ্ধা করি, তাঁহারা বেদে আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ত অনেক দিনের পর ইউরোপ হইতে 'আর্য্য' শব্দ আসিয়া আবার ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্য ছিলেন ; অথবা তাঁহাদিগের সন্তান। এজন্য আমরা আর্য্যবংশ। কিন্তু এই আর্য্য শব্দ আর বেদের আর্য্য শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিরা বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি আর্য্যবর্ণ। এখনকার পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতীয় আধুনিকেরাও বলিয়া থাকেন, ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান্, রুষ, যবন, পারসিক, রোমক, হিন্দু, সকলই আর্য্য। আবার ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী এ নামের অধিকারী হয় না ; হিন্দুরা আর্য্য বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কোল, ভীল, সাঁওতাল আর্য্য নহে। তবে আর্য্য শব্দের অর্থ কি ?

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, পৌষ।

এই প্রভেদের কারণ কি? কতকগুলি দেশীয় লোক আর্য্যবংশীয়, কতকগুলি অনার্য্যবংশীয়, এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ কি? আর্য্য কাহারা,—কোথা হইতেই বা আসিল? অনার্য্য কাহারা, কোথা হইতেই বা আসিল? এক দেশে দুইপ্রকার মনুষ্যবংশ কেন? আর্য্যের দেশে অনার্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে, না অনার্য্যের দেশে আর্য্য আসিয়া বাস করিয়াছে? বাঙ্গালার ইতিহাসের এই প্রথম কথা।

ইহার মীমাংসাজন্য ভাষাবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অতএব ভাষা-বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানে আবশ্যক হইল।

ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। সকলই ত ঈশ্বরপ্রদত্ত। ঈশ্বর বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু গাছ গড়িয়া কাহারও বাগানে পুঁতিয়া দিয়া যান না। তেমনি তিনিই ভাষার সৃষ্টিকর্ত্ত, কিন্তু তিনি যে ভাষাগুলি তৈয়ারি করিয়া—বিভক্তি, লিঙ্গ, কারকাদিবিশিষ্ট করিয়া—দেশে দেশে মনুষ্যকে শিখাইয়া বেড়ান নাই, ইহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। দ্বিতীয় মত এই যে, মনুষ্যগণ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিয়া ভাষাসৃষ্টি করিয়াছে। এ মত গ্রহণ করিতে হইলে অনুমান করিতে হয় যে, দশজন একত্র বসিয়া যুক্তি করিয়াছে যে, এসো, আমরা ফুলফলযুক্ত পদার্থগুলিকে বৃক্ষ বলিতে আরম্ভ করি—যাহারা উড়িয়া যায়, তাহাদের পাখী বলিতে আরম্ভ করি। এরূপ যুক্তির জন্য ভাষার প্রয়োজন, এ মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং এ মতও অবৈজ্ঞানিক ও অগ্রাহ্য। তৃতীয় মত এই যে, ভাষা অনুকৃতিমূলক। এই মতই এখন প্রচলিত। প্রাকৃতিক বস্তুসকল শব্দ করে। নদী কল কল করে, মেঘ গর গর করে, সিংহ হুঙ্কার করে, সর্প ফোঁস্ ফোঁস্ করে। আমরাও যে সকল কাজ করি, তাহারও শব্দ আছে; বাঙ্গালী "সপ্ সপ্" করিয়া খায়, "গপ্ গপ্" করিয়া গেলে; "হন্ হন্" করিয়া চলিয়া যায়, "দুপ্ দাপ" করিয়া লাফায়। এইরূপ নৈসর্গিক শব্দানুকৃতিই ভাষার প্রথম সূত্র। গাছের ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গার শব্দ হইতে "মৃ"; মন্দগমনের সময়ে ঘর্ষণজনিত শব্দ হইতে "স্র", নিশ্বাসের শব্দ হইতে "অস্"। সত্য বটে, অনেক সামগ্রী আছে যে, তাহার কোন শব্দ নাই; কিন্তু সে সকল স্থলে মনুষ্যের শব্দানুকরণপ্রবৃত্তি বিমুখ হয় না। আলোর শব্দ নাই, কিন্তু আমরা আজিও বলি, "আলো ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।" পরিষ্কার ঘরের শব্দ নাই, কিন্তু আমরা বলি যে, "ঘরটি ঝর্ ঝর্ করিতেছে"।

"মৃ" "স্র" "অস্" প্রভৃতি যেন এইরূপে পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বিবিধ ভাব ব্যক্ত হইল কৈ? শুধু "মৃ" বলিলে কিপ্রকারে "মারিলাম" "মারিল" "মারিব" "মারিয়াছি" "মারামারি" "মরণ" "মার"—এত প্রকার কথা ব্যক্ত হয়? অতএব প্রয়োজন মতে মৃ ধাতুর সঙ্গে অন্য প্রকার শব্দের যোগ আবশ্যক হইল। সেই সংযোগের কাজকে ভাষার গঠন বলা যাইতে পারে। সেই সংযোগের কাজ সর্ব্বত্র একরূপ হয় নাই; এজন্য ভাষার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। কি প্রকারে সেই সকল গঠন বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল, তাহার আলোচনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই। এখন পৃথিবীর ভাষাসকলের যে প্রকারের গঠন দেখা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

একজাতীয় ভাষায়, ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্রের দ্বারা বাক্যের গঠন হয় ; কোন ধাতুর কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এ সকল ভাষায় বিভক্তি নাই, ইহাদিগকে "সংযোগের অসাপেক্ষ" (isolating) ভাষা বলা যায়। চৈনিক, শ্যামদেশীয়, আনাম দেশীয় বা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা এইরূপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উপসর্গ প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপান্তর হয়। ইহার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ব্বনামে এক-প্রকার সংযোগ হয়। এই সকল ভাষাকে সংযোগসাপেক্ষ (compounding) ভাষা বলে। দক্ষিণের তামিল প্রভৃতি ভাষা, তাতার ভাষা, আমেরিকার আদিমজাতীয় ভাষা এই জাতীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্টরূপে বিভক্তি আছে, সংযোগকালে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা (inflecting) বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।* আরবী, ইহুদী, গ্রীক্, লাটিন, ইংরেজী, ফরাশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দেখা গিয়াছে যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলি ধাতু এবং বিভক্তিচিহ্ন লইয়া গঠিত। ধাতুর পর বিভক্তি ও প্রত্যয়বিশেষের আদেশে শব্দ ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় আর যাহা আছে, তাহাকে সাধারণতঃ সর্ব্বনাম বলা যাইতে পারে। সর্ব্বনামগুলি যে অবস্থাভ্রষ্ট ধাতু, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। কিন্তু তাহা হৌক বা না হৌক, ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম লইয়া ভাষা। যদি কোন দুইটি ভাষায় দেখা যায় যে, ভাষার মূলীভূত ধাতু, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম একই, কেবল দেশকালভেদে কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে অবশ্য অনুমান করিতে হইবে যে, ঐ দুইটি ভাষা উভয়েই একটি আদিম ভাষা হইতে উৎপন্ন। ভাষাবিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া এই, তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তিচিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক। অতএব সেই সকল ভাষা যে একটি প্রাচীন মূলগত ভাষা হইতে উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। সেই সকল ভাষাগুলি একপরিবারভুক্ত।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ; বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক আধুনিক ভাষা ; জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদিগের ভাষা ও আধুনিক পারসী ; প্রাচীন্ গ্রীক্ ও লাটিন ; লাটিনসম্ভূত ফরাশী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি, রোমান্স্‌জাতীয় ভাষা, টিউটন্‌বংশীয়দিগের ভাষা, অর্থাৎ জর্ম্মান্, ওলন্দাজি, ইংরেজ ; ব্রিটেনীয় আদিমবাসীদিগের কেল্‌টিক্ ভাষা, স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য-দেশের গেলিক্, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ের ভাষা, রুস্‌প্রভৃতি স্লাবনিক্ ভাষা,—সকলই সেই এক প্রাচীনা ভাষা হইতে উৎপন্না,—সকলেই সেই এক বৃদ্ধা মাতার দুহিতা। সেই বহুভাষার জননী প্রাচীনা ভাষা এখন আর নাই—কিন্তু একদিন ছিল।

---

* এই শ্রেণীবিভাগ অগস্ত শ্লেচর্ নামক জর্ম্মান লেখককৃত। মক্ষ্‌মূলর প্রভৃতি ভাষার যেরূপ শ্রেণীভাগ করেন, তাহা আর এক প্রকার। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীকে দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করেন—শেমীয় ও আর্য্য। কিন্তু শেমীয় ও আর্য্য যখন উভয়েই তৃতীয় শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত, তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া দাঁড় করান, কিছু বৈজ্ঞানিক-নীতি-বিরুদ্ধ।

যেমন কোন গৃহে, কতকগুলি মাতৃহীন ভ্রাতা ও ভগিনীর বাস করিতে দেখিয়া, অনুমান করি যে, ইহাদের একজন জননী ছিল, তেমনি এই একবংশীয় বহুতর ভাষা দেখিয়া মনে করি যে, এক প্রাচীন মূল ভাষা ছিল। যে জাতি ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা আর্য্যজাতি বলিয়া অধুনা নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ভাষাসমুৎপন্ন ভাষাগুলি আর্য্যভাষা নামপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা, তাহারা আর্য্যবংশীয় বলিয়া অনুমিত এবং বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশসম্ভূত নহে, তাহারা অনার্য্যজাতি।

এখন কোল, সাঁওতাল, কোঁচ, কাছাড়ি প্রভৃতি জাতিদিগের ভাষা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, এই সকল ভাষা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত—এই সকল ভাষায় বিভক্তি নাই। অতএব এই সকল ভাষা অনার্য্যভাষা। যে সকল জাতির মাতৃভাষা অনার্য্যভাষা, সে সকল জাতি অনার্য্যজাতি। কোল, সাঁওতাল, ম্লেচ্ছ, কাছাড়ি অনার্য্যজাতি। আর্য্য ও অনার্য্য এ ভেদের তাৎপর্য্য এই। এখন আর্য্যদিগের সম্বন্ধে একটা কথা বলিব।

সে কথা এই যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি—যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ—তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন? ভারতবর্ষীয়েরা বলিতে পারেন—ভারতই আর্য্যভূমি—ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষা সকল আর্য্যভাষা হইতে প্রাচীনা দেখা যাইতেছে। তবে আর্য্যবংশের আদিম বাস ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা দলে দলে অন্য দেশে গিয়াছেন, এ কথা না বলিব কেন? অতি প্রাচীন কালেও মনু যবন প্রভৃতি জাতিকে ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

কর্জ্জন্‌নামা একজন পাশ্চাত্ত্য লেখকের এই মত*—এবং বিখ্যাত ভারতেতিহাসবেত্তা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ও কতক সেই দিকে টানেন।† কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্যভাষা সকলের বিশেষ সমালোচন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই যে, আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিমবাসী নহেন—অন্যত্র হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্য জাতি বাস করিত। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য এবং পার্ব্বত্যদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। এই স্থলে সেই সকল কথার প্রমাণের সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শ্লেগেল্‌, লাসেন্‌, বেন্‌ফী, মক্ষমূলর, স্পিজেল, রেনা, পিক্তা, মূর প্রভৃতির এই মত। এই মতও এক্ষণে সকল পণ্ডিত কর্ত্তৃক আদৃত।‡

অতএব আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উত্তরে, আসিয়ার মধ্যভাগে প্রাচীন আর্য্যভূমি ছিল, সেইখান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার মূর্‌ বিবেচনা করেন, ঐ হিমালয়োত্তরপ্রদেশই ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে

* Journal, Roy. Asiat. Soc. Vol. XVI, pp. 172-200. ডাক্তার মূর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত Sanskrit Texts, part II, p. 299.

† History of India, Vol. I.

‡ ডাক্তার মূর সাহেবের Sanskrit Texts দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সমালোচনা দেখ।

উত্তরকুরু খ্যাত ছিল। একদল ইউরোপের এক প্রান্তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, হেলেনিক্ নামধারণ করিয়া, জগতে অতুল্য সাহিত্য শিল্প দর্শনাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আর একদল ইতালীর নীলাকাশতলে সপ্তগিরিশিখরে নগরী নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আর একদল বহুকাল জর্ম্মানীর অরণ্যরাজিমধ্যে বিহার করিয়া এখনকার দিনে পৃথিবীর নেতা ও শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। আর একদল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অনন্তমহিমাময় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোণিত বাঙ্গালীর শরীরে আছে। সে রক্তের তেজে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসকল শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালীর শরীরেও সেই রক্ত বহিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—অনার্য্য*

আর্য্যেরা উত্তর-পশ্চিম হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রথমে সপ্তসিন্ধুশোভিত পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের প্রথম বাস যে সেই সপ্তসিন্ধুবিধৌত পুণ্যভূমি, তাহার প্রমাণ আর্য্যদিগের বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আছে। আচার্য্য বোথ্ বলেন ঋগ্বেদসংহিতায় সিন্ধুনদের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, কিন্তু গঙ্গার নাম একবার মাত্র গৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবের নদী সকল ও পঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদপ্রণেতৃগণের নিকট সুপরিচিত। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে।†

যদি তাঁহারা উত্তর পশ্চিম হইতে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাবে বাস করিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্য সিদ্ধ যে, তাঁহারা পঞ্জাবে আসিবার পরে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। প্রথমে ব্রহ্মাবর্ত্ত, তারপর ব্রহ্মর্ষিদেশ তার পর মধ্যদেশ, সর্ব্বশেষে তাঁহারা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী হইয়াছিলেন।‡ বাঙ্গালা, ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষিদেশ বা মধ্যদেশের মধ্যগত নহে, বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের শেষভাগ। প্রথম কোন্ সময়ে আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহা

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, মাঘ।

† Vide Muir's Sanskrit Texts, Part II, Chapter II, Sec XI & Chapter III, Sec. III.

‡ সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরং॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদ্ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্ বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্ত পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
মনু ২। ১৭—২২

নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্থানান্তরে করিব, অথবা চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করিব—এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য এই যে, যখন আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসেন নাই, তখন বাঙ্গালায় কে বাস করিত ?

এ প্রশ্নের সচরাচর উত্তর এই যে, আর্য্যের পূর্ব্বে অনার্য্যেরা বাঙ্গালায় বাস করিত। এ উত্তর সত্য কি না, তাহার কিছু বিচার আবশ্যক। এক্ষণে বাঙ্গালায় আর্য্য ও অনার্য্য, উভয়ে বাস করিতেছে। যদি আর্য্য এখানকার আদিম বাসী না হইল, যদি ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা কোন ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তবে অবশ্য অনার্য্যেরা তৎপূর্ব্বে এখানে বাস করিত—কেবল এইরূপ বিচার অনেকে করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিচার অসম্পূর্ণ। এমন কি হইতে পারে না যে, যখন আর্য্যেরা প্রথম বাঙ্গালায় আসেন, তখন অনার্য্যেরা বা কোন জাতীয় মনুষ্য বাঙ্গালায় বাস করিত না ? এমন কি হইতে পারে না যে, আর্য্যেরা বাঙ্গালাকে শূন্য ভূমি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, তাহার পর অনার্য্যেরা আসিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রভৃতি প্রদেশ খালি পাইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল ? আর্য্যেরা ঐতিহাসিক কালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিল বলিয়া অনার্য্যেরা যে তাহার পবে আসে নাই, এমত সিদ্ধ হইল না। দেশ থাকিলেই যে লোক থাকিবে, এমত কথা নহে। সত্য বটে, এখনকার দিনে বাঙ্গালাব ন্যায় বিস্তৃত ও উর্ব্বর এবং জীবননির্ব্বাহের নানাবিধ সুখকর উপাদানবিশিষ্ট দেশ জনশূন্য থাকে না। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা এত বাড়ে নাই, যখন জাতিতে জাতিতে বড় ঠেলাঠেলি হয় নাই, তখন বাঙ্গালাও বসতিহীন থাকা বিচিত্র নহে। অতএব প্রশ্ন মীমাংসার আর কি প্রমাণ আছে, দেখা যাউক।

যদি ভারতীয় অনার্য্যদিগের এখনকার বাসস্থান ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ হইত, তাহা হইলে অবশ্য বলিতাম যে, তাহারা বাহির হইতে আসিয়া ঐ সকল স্থান খালি পাইয়া বাস করিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে, বিশেষ উত্তর-পূর্ব্বভাগে কতকগুলি অনার্য্যজাতির বাস আছে ; এবং তাহারাও যে আর্য্যদিগের আসার পরে আসিয়াছিল, তাহাও ঐতিহাসিক কথা। সে সকল কথা পরে বলিব। অধিকাংশ অনার্য্যজাতি এরূপ সংস্থানবিশিষ্ট নহে। তাহারা কোথাও মধ্যভারতে, কোথাও দক্ষিণে, যেখানে সেখানে বসতি করিতেছে। তাহাদের চারিপাশে আর্য্যনিবাস। ভারতে প্রবেশের পথ আর তাহাদিগের বর্ত্তমান বসতিস্থলের মধ্যে আর্য্যনিবাস। এ অবস্থা দেখিয়া যিনি বলিবেন যে, আর্য্যের পরে এই অনার্য্যেরা আসিয়াছিল, তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, অনার্য্যেরা আর্য্যদিগকে জয় করিয়া, আর্য্যনিবাস ভেদ করিয়া, তাহাদের এখনকার বাসে আসিয়াছে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে যে সকল স্থান উত্তম, মনুষ্যবাসের যোগ্য, সেই সকল স্থানে তাহারা বাস করিত। কদর্য্য স্থান সকলে পরাজিতেরা যাইত। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ নহে। আনুগঙ্গ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বাসভূমিতেই আর্য্যনিবাস, কদর্য্য স্থানেই অনার্য্যনিবাস। বিন্ধ্যোত্তর ভারতে যে সকল সুখের স্থান, সেখানে তাহাদের বাস নাই। ইচ্ছা করিয়া যে সকল স্থানে বাস করিতে হয়, সে সকল স্থানে তাহাদের বাস নাই। যেখানে ভূমি উর্ব্বরা, পৃথ্বী সমতলা, নদী নৌবাহিনী, এবং ধনধান্য প্রচুর, সেখানে তাহারা নাই। যেখানে ভূমি অনুর্ব্বরা, পর্ব্বতে

পথ বন্ধুর, পৃথিবী অরণ্যময়ী, মনুষ্যভাণ্ডার ধনশূন্য, সেই সকল স্থানে তাহাদের বাস। যাহারা বিজয়ী, তাহারা কদর্য্য স্থান সকল বাছিয়া লইবে—যাহারা বিজিত, তাহাদিগকে ভাল স্থান ছাড়িয়া দিবে, ইহা অঘটনীয়। অতএব আর্য্যের পর অনার্য্য আসিয়াছে, এ পক্ষ সমর্থন করা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আগে অনার্য্য ছিল, তার পর আর্য্য আসিয়াছে।

দেখা যাউক, এই পূর্ব্ববর্ত্তী অনার্য্য কাহারা। দেশী বিদেশী সকলেই স্বীকার করেন, বেদ প্রাচীন। দেশীয়েরা বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয়ত্ববাদ ছাড়িয়া দিয়া, বিদেশীয়দিগের ন্যায় বলা যাউক যে, বেদের ন্যায় প্রাচীন আর্য্যরচনা আর কিছুই নাই। প্রতীচ্যদিগের মত বেদের মধ্যে ঋগ্বেদসংহিতাই প্রাচীন। সেই ঋগ্বেদসংহিতায় "বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ," "অয়মেতি বিচাকশদ্ বিচিন্বন্ দাস আর্য্যম্"* ইত্যাদি বাক্যে আর্য্য হইতে একটি পৃথক্ জাতি পাওয়া যায়। তাহারা দাস বা দস্যু নামে বেদে বর্ণিত। দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ—ডাকাত, দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত নহে। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। † তাহারা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত—তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্য্যেরাও ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ—আর্য্যেরা গৌর। তাহার "বর্হিষ্মান্"—যজ্ঞ করে না—আর্য্যেরা যজমান—যজ্ঞ করে। তাহারা "অব্রত"—আর্য্যেরা সব্রত—সুতরাং হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তাহাদের মার, আর্য্যদের বশীভূত কর। আর্য্যদের এই কথা। তাহারা "অদেব"—সুতরাং "বয়ং তান্ বনুয়াম সঙ্গমে"—তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চাই। তাহারা "অন্যব্রত"—"অমানুষ"—"অযজমান"—তাহারা "মৃধ্রবাচ"—কথা কহিতেও জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায় যে, যাহাদিগের কথা হইতেছে, তাহারা আর্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী এবং ভিন্নভাষী—এবং আর্য্যদিগের পরমশত্রু। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহারা অবশ্য অনার্য্য।

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতা সঙ্কলনকালে আর্য্যদিগের চারি পার্শ্বে অনার্য্যেরা ছিল। মনুতে তাহারা ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। আচারভ্রংশ হেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চৈনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

ইহাদিগের মধ্যে যবন পহ্লব আর্য্য, অবশিষ্ট অনার্য্য। ইহা ভাষাতত্ত্ব-প্রদত্ত প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

---

* ঋচ ১।৫১।৮—৯। মুরধৃত। মক্ষমূলরধৃত **Sanskrit Texts, Part II, Chap. III, Sect. I.**

† ঋচ। ১০।৮৬।১৯। মুরধৃত। **Ib.**

মনু ও মহাভারত হইতে এইরূপ অনেক অনার্য্যজাতির তালিকা বাহির করা যাইতে পারে। তাহাতে অন্ধ্র, পুলিন্দ, সবর, মূতিব ইত্যাদি অনার্য্যজাতির নাম পাওয়া যায়। এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে উহারাই দস্যু নামে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"দস্যূনাং সশিরস্ত্রাণৈঃ শিরোভির্লূনমূৰ্দ্ধজৈঃ।
দীর্ঘকূর্চ্চৈর্মহী কীর্ণা বিবর্হৈরণ্ডজৈরিব॥"

ইহারা যে পরিশেষে আর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই উহারা, যে যেখানে বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য,—আর্য্যেরাও সে সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং সেখানে আত্মরক্ষা সাধ্য হইল। কোন কোন স্থান—যথা দ্রাবিড়, আর্য্যের অধিকৃত হইলেও অনার্য্যেরা তথায় বাস করিতে লাগিল, আর্য্যেরা কেবল প্রভু হইয়া রহিলেন।* আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ লোক আর্য্য—দাক্ষিণাত্যে সাধারণ লোক অনার্য্য। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তবে আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন অবস্থা কেন ঘটিল, এ প্রস্তাবে সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়।† ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্যের সামঞ্জস্য একরকমে ঘটে নাই। আমরা তিন প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই।

প্রথম। ভারতবর্ষে কোন কোন অংশ আর্য্যজিত নহে—অনার্য্যেরা সেখানে প্রধান; কতকগুলি আর্য্যও সেখানে বাস করে, কিন্তু তাহারা অপ্রধান। ইহার উদাহরণ সিংভূম।

দ্বিতীয়। অবশিষ্ট আর্য্যজিত প্রদেশের মধ্যে কোন কোন প্রদেশ এরূপ আর্য্যীভূত যে, সে দেশে আর্য্যবংশ কেবল প্রাধান্যবিশিষ্ট, এমত নহে—লোকের মাতৃভাষাও আর্য্য-ভাষা। উত্তরপশ্চিম, মধ্যদেশ ইহার উদাহরণ।

তৃতীয়। কোন কোন আর্য্যজিত দেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আর্য্যীভূত যে, সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজিও অনার্য্য। দ্রাবিড় কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও, সে সকল দেশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাঙ্গালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার মধ্যে বিস্তর অনার্য্য। অন্য কোন আর্য্যদেশে অনার্য্যশোণিতের এত প্রবল স্রোতঃ বহে না। সেই কথা এক্ষণে আমরা স্পষ্টীকৃত করিব।

* "Though by this superior civilization and energy they placed themselves at the head of the Dravidian communities, they must have been so inferior in numbers to the Dravidian inhabitants as to render it impracticable to dislodge the primitive speech of the country, and to replace it by their own language. They would therefore be compelled to acquire the Dravidian dialects." *Muir's Sanskrit Texts, Part II.*

† মূরের দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ধৃত মন্ত্রসকল দেখ—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। এখানে সে সকল উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—অনার্য্যের দুই বংশ, দ্রাবিড়ী ও কোল*

আমরা বুঝাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে আগে অনার্য্যের বাস ছিল—তার পর আর্য্যেরা আসিয়া তাহাদিগকে জয় করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। অনার্য্যেরা বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া বাস করিতেছে। ভারতবর্ষে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে—বাঙ্গালাতেও তাই, ইহা সহজে অনুমেয়। কিন্তু বাঙ্গালার সঙ্গে মধ্যদেশাদির একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মধ্যদেশাদির ন্যায় বাঙ্গালার অনার্য্যগণ সকলেই বিজয়ী আর্য্যদিগের ভয়ে পলায়ন করে নাই। কেহ কেহ পলাইয়াছে—কেহ কেহ ঘরেই আছে।

জয় দ্বিবিধ, কখন কখন কোন প্রবল জাতি জাত্যন্তরকে বিজিত করিয়া তাহাদিগের দেশ অধিকৃত করিয়া আদিমবাসীদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করে। আদিমবাসীরা সকলে হয় জেতৃগণের হস্তে প্রাণ হারায়, নয় দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে পলাইয়া বাস করে। টিউটন্‌গণকর্ত্তৃক ব্রিটেন্ জয়ের ফল এইরূপ হইয়াছিল। সাক্সনেরা ব্রিটন্ জয় করিয়া পূর্ব্বাধিবাসীদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস করিয়াছিলেন। কেবল যাহারা ওয়েলস্, কর্ণওয়াল্ বা ব্রিটানী প্রদেশে গিয়া পলাইয়া বাস করিয়া রহিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। ইংলণ্ডে আর ব্রিটন্ রহিল না। ইংলণ্ড কেবল টিউটনের দেশ হইল। দ্বিতীয় প্রকারে দেশজয়ে পূর্ব্বাধিবাসীরা বিনষ্ট বা তাড়িত হয় না। বিজয়ীদিগের সঙ্গে মিশিয়া যায়। নর্ম্মান্‌গণকর্ত্তৃক ইংলণ্ড জয় ইহার উদাহরণ। আর্য্যগণ বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা টিউটন্‌দিগের মত অনার্য্যদিগকে নিঃশেষে ধ্বংস বা বিদূরিত করিয়াছিলেন বা নর্ম্মান্‌বিজিত সাক্সনের মত অনার্য্যেরা বঙ্গজেতা আর্য্যদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। যদি দেখি যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অনার্য্যবংশ এখনও আছে, তবে বুঝিতে হইবে যে, অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

প্রথমে দেখা যাউক, বাঙ্গালার কোথায় কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি আছে। সে গণনার পূর্ব্বে প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেন না, বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অর্থে পেশোর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত—যথা, "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" "বেঙ্গল আর্ম্মি"। আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দূর বিস্তৃত না হউক, মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ উহার অন্তর্গত—এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণরের অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই "বাঙ্গালা" শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালী; আমরা সেই বাঙ্গালীর উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। তাহার বাহিরে যাহারা আছে, তাহাদের ইতিহাস লিখিব না—সাঁওতাল বা নাগা এ প্রবন্ধের কেহ নহে। তবে এখানে বাঙ্গালার বাহিরে দৃষ্টিপাত না করিলে, আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যে সকল অনার্য্যজাতি বাঙ্গালার আর্য্য কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়াছে, তাহারা অবশ্য বাঙ্গালার বাহিরে আছে। বাঙ্গলার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি বাস করিতেছে—দুইই দেখিতে হইবে।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, ফাল্গুন।

উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশ্‌মি, চুলকাটা মিশ্‌মি। তার পর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা—পাদম্‌ মিরী দফ্‌লা ইত্যাদি। তার পর আসামপ্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরী; কোপয়ী, তাহার বাহিরে মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রতীরে দেখিতে পাই, কাছারি বা বোড়ো, মেচ্‌ ও ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নিকটকুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে, হিমালয়পর্ব্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত)। তার পর বাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন্‌, তালাইন্‌ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোঁড়োয়া ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্ব্বের অনার্য্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানী।

আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম—জাতির ভিতর উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে।

এখন প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহারা সকলে কি একবংশসম্ভূত? আর্য্যেরা সকলেই একবংশসম্ভূত—আর্য্য শব্দের অর্থই তাই। কিন্তু "অনার্য্য" বলিলে কেবল ইহাই বুঝায় যে, ইহারা আর্য্য নহে। যাহারা আর্য্য নহে, তাহারা সকলেই যে একজাতীয়, এমত বুঝায় না। যদি এমত প্রমাণ থাকে যে, ইহারা একবংশোদ্ভূত, তবে সহজে অনুমান করিতে পারা যায় যে, ইহারা সকলেই বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী—আর্য্যগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া নানাদেশে নানা নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু যদি সে প্রমাণ না থাকে—বরং তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকে যে, তাহারা নানাবংশীয়, তবে আবার বিচার করিতে হইবে, এইগুলির মধ্যে কাহারা কাহারা বাঙ্গালার প্রথম অধিবাসী।

প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া এ সকল বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ। আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে যে তিন শ্রেণীতে ভাষার কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাষার অন্তর্গত আর্য্যভাষা ও সেমীয়ভাষা (আরবী, হিব্রু প্রভৃতি)। প্রথম শ্রেণীর ভাষাগুলি—যাহা সংযোগনিরপেক্ষ অথবা বিভক্তিবিশিষ্ট নহে—সেই সকল ভাষাকে ইউরোপীয়েরা ভারতচৈনিক বলিয়া থাকেন। নামটি আমাদিগের ব্যবহারের অযোগ্য—আমরা ঐ ভাষাগুলি চৈনিকীয়ভাষা বলিব। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার সাধারণ নাম তুরাণী। বাঙ্গালার মধ্য বা প্রান্তস্থিত অনার্য্যজাতিসকলের ভাষা এই দ্বিবিধ—কতকগুলির জাতির ভাষা চৈনিকীয়—ইহাদিগের বাস প্রায় আসামে বা বাঙ্গালার পূর্ব্ব-সীমায়। তাহারা অনেকেই আর্য্যদিগের পরে আসিয়াছে, এমত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তার পর অবশিষ্ট যে সকল অনার্য্যজাতি—তাহাদিগের সকলেরই ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ।

কিন্তু সেই সকল অনার্য্যভাষার মধ্যেও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ব্বেই কথিত

হইয়াছে, দ্রাবিড়ভাষা তুরাণীশ্রেণীস্থ। বাঙ্গালার অনার্য্যভাষার মধ্যে কতকগুলি জাতির ভাষার শব্দ সমাস ও ব্যাকরণ সমালোচন করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল ভাষা দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। আর কতকগুলি অনার্য্যভাষাতে দ্রাবিড়ী ভাষার সঙ্গে কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কতকগুলি অনার্য্যজাতি দ্রাবিড়ীদিগের জ্ঞাতি—কতকগুলি তাহাদিগের হইতে ভিন্ন জাতি।

যাহারা অদ্রাবিড়ী, তাহাদিগের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য আছে। কোল বা হো, সাঁওতাল, মুণ্ড প্রভৃতি এখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি বটে, কিন্তু যেমন সকল আর্য্যভাষাই পরস্পরেব সহিত সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট, কোল, মুণ্ড, সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষাও সেইরূপ সাদৃশ্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব ইহারা সকলেই একজাতীয় বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আর্য্যীকরণ*

(১) সাঁওতাল, (২) হো, (৩) ভূমিজ, (৪) মুণ্ড, (৫) বীরহোড়্, (৬) কড়ুয়া, (৭) কুর্ বা কুর্কু বা মুযার্সি, (৮) খাড়িয়া, (৯) জুয়াং, এই কয়টি কোলবংশীয় বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণরের শাসন অধীনে পাওয়া যায়।

জুয়াঙ্গোরা উডিষ্যার ঢেঁকানান ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। কুর্ বা মুযার্সির সঙ্গে এ ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই। খাডিয়ারা সিংহভূমের অতিশয় বনাকীর্ণপ্রদেশে বাস করে : মানভূমের পাহাডেও তাহাদের পাওয়া যায়। বীর বীরহোডেরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। উহাদিগের সঙ্গে মিশ্রিত "অসুর" নামে আর একটি কোলবংশীয় জাতি পাওয়া যায়। কুর্কু জাতি আরও পশ্চিমে।

সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উডিষ্যায় বৈতরণীতীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে—কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন "সাঁওতাল পবগণা" বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুডা, হাজারিবাগ, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর, এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতালদিগের বাস আছে।

হো, ভূমিজ এবং মুণ্ডের সাধারণ নাম কোল। হো জাতিকে লড্‌কা বা লড়াইয়া কোল বলে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা চুটিয়া নাগপুর অঞ্চলে বাস করে।

হরিবংশে আছে যে, যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র তুর্ব্বসুর বংশে কোল নামে রাজা ছিলেন। উত্তরভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল ; তাঁহারই বংশে কোলদিগের উৎপত্তি। † মনুতে "কোলি সর্প"দিগের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। ভারতবর্ষে কোলেরা এককালে প্রধান ছিল, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। হণ্টর্ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই হো নামক কোন আদিম জাতির বাসের চিহ্ন পাওয়া যায়।‡ তিনি যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, চৈত্র। † Asiatic Researches, Vol. IX, P. 91 & 92.

‡ Non-Aryan Dictionary. Linguistic Dissertation, P. 25 &c.

অধিকাংশে অধিক শ্রদ্ধা করা যায় না ; কিন্তু হো বা কোলজাতি যে একদিন বহুদূর-বিস্তৃত দেশের অধিবাসী ছিল, তাহাও সম্ভব বোধ হয়। হো শব্দেই কোলি ভাষায় মনুষ্য বুঝায়। এক সময়ে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না।

কর্ণেল্ ডাল্টন্ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোলেরাই পূর্ব্বে মগধাদি অনুগঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল—যাহা এখন বাঙ্গালা ও বেহার, সে প্রদেশে তখন কোলভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে, বিশেষতঃ শাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্নমন্দির অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে যে, সে সকল চেরো এবং কোলজাতীয়দিগের নির্ম্মিত। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, ঐ প্রদেশে সাধারণ লোক কোল ছিল, রাজারা চেরো ছিল।

কথিত আছে যে, কোলেরা সবর নামক দ্রাবিড়ী অনার্য্যজাতি কর্ত্তৃক মগধ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সবরেরা মনু ও মহাভারতে অনার্য্যজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সবর অদ্যাপি উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

দ্রাবিড়ীয়গণ বাঙ্গালার উপান্তভাগ সকলে কোলবংশীয়দিগের অপেক্ষা বিরল। হাজারিবাগের ওঁরাও (ধাঙ্গড়) ও রাজমহলের পাহাড়ীরা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। গোন্দেরা দ্রাবিড়ী বটে, কিন্তু তাহারা আমাদিগের নিকটবাসী নহে। কিন্তু বাঙ্গালার ভিতরেই এমন অনেক জাতি বাস করে যে, তাহারা দ্রাবিড়বংশীয় হইলে হইতে পারে। কর্ণেল্ ডাল্টন্ বলেন যে, কোচেরা অনুগঙ্গবিজয়ী দ্রাবিড়ীগণ হইতে উৎপন্ন। বহুতর কোচ বাঙ্গালার ভিতরেই বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ভিতর প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই লক্ষ লোককে বাঙ্গালী বলা যাইবে কি না ?* কেহ কেহ বলেন, ইহাদিগকেও বাঙ্গালীর সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান। কোচেরা বাঙ্গালী হউক বা না হউক, বাঙ্গালার ভিতরে অনার্য্য আছে কি না, এ কথার আমাদিগের একবার আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

কে আর্য্য, কে অনার্য্য ? ইহা নিরূপণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বই প্রধান উপায়, ইহা দেখান গিয়াছে। যাহার ভাষা আর্য্যজাতীয় ভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। যাহার ভাষা অনার্য্যভাষা, সেই অনার্য্যজাতীয়, ইহা স্থির করা গিয়াছে। পরে দেখান গিয়াছে যে, যে অনার্য্যের ভাষা দ্রাবিড়জাতীয় ভাষা, সেই দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য ; যাহার ভাষা কোলজাতীয়ভাষা, সেই কোলবংশীয় অনার্য্য। কিন্তু এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা একজাতীয়, বংশ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে ? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত জাতি জেতৃগণের ধর্ম্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে ?

---

* "The proud Brahman who traces his lineage back to the palmy days of Kanauj and the half civilized Koch or Palya of Dinagepore may both be fitly spoken as Bengali." *Bengal Census Report*, 1871.

এমন উদাহরণ ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। ফ্রান্সের বর্ত্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, কিন্তু ফরাসি জাতির অস্থিমজ্জা কেলটীয় শোণিতে নির্ম্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্ত্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন গলদিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশে বর্ত্তমান ফরাসি ভাষা দাঁড়াইয়াছে। আইবিরিয়াতেও (স্পেন ও পর্টুগল্) ঐরূপ ঘটিয়াছিল। আমেরিকার কাফ্‌রি দাসদিগের বংশ প্রভুদিগের ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, জাতীয় ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজি বা ফরাসি ব্যবহার করিয়া থাকে।* অতএব ভাষা আর্য্যভাষা হইলেই আর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না—অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

সকলেই জানে যে, আর্য্যেরা ককেশীয়বংশীয়। ককেশীয় বংশের মধ্যে আর্য্য ভিন্ন অন্য বংশও আছে, কিন্তু ককেশীয় বংশের অন্তর্গত নহে, এমন আর্য্যজাতি নাই। ককেশীয়দিগের লক্ষণ—গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মস্তক সুগঠন, হনুদ্বয় অত্যুন্নত। মোঙ্গল বংশ ককেশীয়দিগের হইতে পৃথক। মোঙ্গলীয়েরা খর্ব্বাকার, মস্তকের গঠন চতুষ্কোণ, হনুদ্বয় অত্যুন্নত। যদি কোন জাতিকে এমন পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের শারীরিক গঠন মোঙ্গলীয়, তবে সে জাতিকে কখন আর্য্য বলা যাইবে না। যদি দেখিতে পাই, সে জাতীয়ের ভাষা আর্য্যভাষা, তাহা হইলে এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাহারা আদৌ অনার্য্যজাতি, অনার্য্যদিগের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আবার যদি দেখি যে, সেই অনার্য্য জাতি কেবল আর্য্যভাষা নহে, আর্য্যধর্ম্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছে—তখন বুঝিতে হইবে যে, এক জাতি অপর জাতিকে বিজিত করিয়া একত্র বাস করায় একের সঙ্গে অন্য মিশিয়া গিয়াছে। যদি আবার দেখি যে, এই বিমিশ্র জাতিদ্বয়ের মধ্যে আর্য্য উন্নত—অনার্য্য অবনত, তবে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আর্য্যেরা জয়কারী, অনার্য্যেরাই বিজিত হইয়া আর্য্যসমাজের নিম্ন স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্ম অহিন্দুর পক্ষে গ্রহণীয় নহে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্টীয়, কি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতে

* ভারতবর্ষেও এই আর্য্য অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে আজিকার দিনেই আমাদিগের প্রত্যক্ষ-গোচরে এইরূপ ভাষাপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এখনও অনেকস্থানে অনার্য্যেরা দিনে দিনে আপন মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা গ্রহণ করিতেছে। কর্ণেল্ ডাল্‌টন্ বলেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালে কোড়বা জাতীয়গণের ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে কোড়বাদিগের বাসভূমি যশপুর রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তলবমতে বহুসংখ্যক অসভ্য কোড়বা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহই কোড়বা ভাষার এক বর্ণও বলিতে পারিল না। তাহারা বলিল, তাহারা ডিহি কোড়বা—অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমতল প্রদেশে বাস করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে। দেশ ও সমাজ পরিত্যাগের সঙ্গে ভাষাও ত্যাগ করিয়াছে। উদাহরণের স্বরূপ কর্ণেল্ ডাল্‌টন্ আরও বলেন যে, ছুটীয়া নাগপুর প্রদেশে ওরাওদিগের যে সকল গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে অনেক অনেক গ্রামের ওরাওয়েরা জাতীয় ভাষা বলিতে পারে না, হিন্দু বা মুণ্ডদিগের ভাষায় কথা কহে। Ethnology of Bengal, P. 115.

পারেন। কিন্তু যে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নাই—সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিতে পারে না। অতএব যে অনার্য্য আদৌ হিন্দুকুলজাত নহে, সে কখনও হিন্দু হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়াছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এই আপত্তি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বলবৎ বটে। কিন্তু এক একটি বৃহৎ জাতির পক্ষে ইহা খাটিতে পারে না। বিশেষতঃ বন্য অনার্য্য জাতিদিগের পক্ষে খাটিতে পারে ন। মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না; কেন না, যে সকল আচার হিন্দুত্ব ধ্বংসকারক, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার কবিয়া পুরুষানুক্রমে পতিত। কিন্তু এ প্রদেশের বন্য অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে হিন্দুত্ববিনাশক এমন কোন আচার ব্যবহার নাই যে, তাহা হিন্দুদিগের অতি নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে—হাড়ি ডোম মুচি কাওরা প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে কর, যেখানে হিন্দু প্রবল, এমন কোন প্রদেশের সন্নিকটে অথবা হিন্দুদিগের অধীনে কোন অসভ্য অনার্য্য জাতি বাস করে। এমন স্থলে ইহা অবশ্যই ঘটিবে যে, আর্য্যেরা সমাজের বড়, অনার্য্যেরা সমাজের ছোট থাকিবে। মনুষ্যের স্বভাব এই যে, যে বড়, ছোট তাহার অনুকরণ করে। কাজে কাজেই এমত স্থলে অনার্য্যেরা হিন্দুদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইবে। আমরা এখন ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতেছি, পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতাম। আমাদিগের একটি প্রাচীন ধর্ম্ম আছে, চারি হাজার বৎসর হইতে সেই ধর্ম্ম নানাবিধ কাব্য দর্শন ও উচ্চ নৈতিক তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া লোকমনোমোহন·হইয়াছে, তাহার কাছে নিরাভরণ ইস্লাম বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনুরাগভাজন হয় না। এই জন্য আমরা এখন সর্ব্বথা ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়াও, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের ততটা অনুগমন করি না। কতকটা না করিতেছি, এমনও নহে। কিন্তু অনার্য্যদিগের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল বা শোভাবিশিষ্ট কোন জাতীয় ধর্ম্ম নাই। অনেক স্থলে একেবারে কোন প্রকার জাতীয় ধর্ম্ম নাই। এমত অবস্থায় অধীন অনার্য্যসমাজ প্রভু আর্য্যদিগের অন্য বিষয়ে যেমন অনুকরণ করিবে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ অনুকরণ করিবে। হিন্দুরা যে সকল উৎসব করে, তাহারাও সেই সকল উৎসব করিতে আরম্ভ করিবে। জীবননির্ব্বাহের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলে হিন্দুদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে থাকিবে। সমগ্র জাতি এইরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে কালক্রমে তাহারাও হিন্দু নাম ধারণ করিবে। অন্য হিন্দু কেহ কখন তাহাদিগের অন্ন খাইবে না। তাহাদিগের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবে না, অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগের সহিত মিশিবে না—হয় ত তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করিবে না। অতএব তাহারাও একটি পৃথক্ হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। তাহারা আগে যেমন পৃথক্ জাতি ছিল, এখনও তেমনি পৃথক্ জাতি রহিল, কেবল হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া খ্যাত হইল। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে একটি বিবাদের কথা আছে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ধর্ম্ম "proselytizing" নহে অর্থাৎ যে জন্মাবধি হিন্দু নয়, হিন্দুরা তাহাকে হিন্দু করে না। আর এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দু ধর্ম্ম proselytizing, অর্থাৎ অহিন্দুও হিন্দু হয়। এ বিবাদের স্থূলমর্ম্ম উপরে বুঝান গেল। খ্রীষ্টান বা মুসলমানদিগের proselytism এইরূপ যে, তাহারা অন্যকে ডজায় "তুমি খ্রীষ্টান হও, তুমি মুসলমান হও।" আহুত

ব্যক্তি খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার, কন্যা আদান প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্য্য সকলেই করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দুদিগের proselytization সেরূপ নহে। হিন্দুরা কাহাকেও ডাকে না যে, "তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া হিন্দু হও।" যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার বা কোন প্রকার সামাজিক কার্য্য করে না, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বংশে হিন্দুধর্ম্ম বজায় থাকিলে, তাহার হিন্দুনামও লোপ করিতে পারে না। একটা সম্পূর্ণ জাতি এইরূপে হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম্ম পালন করিলে, সকলেই তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া স্বীকার করে। হিন্দুদিগের proselytism এই প্রকার। ঐ শব্দ মুসলমান বা খ্রীষ্টান সম্বন্ধে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, হিন্দু-দিগের সম্বন্ধে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রকৃতপ্রস্তাবে হিন্দুদিগের মধ্যে proselytism নাই এবং তদর্থবাচক ভারতীয় কোন আর্য্যভাষায় কোন শব্দ নাই।

যে অর্থে অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে বলা গিয়াছে, সে অর্থে এখনও অনেক অনার্য্য জাতি হিন্দু হইতেছে।

অনার্য্যজাতি যে আপনাদিগের অনার্য্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিন্ধ্য নামে একটি জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক। বিন্ধ্যমাহাত্ম্য নাম তাহারা কখন কখন ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দি ভাষা কয় এবং হিন্দুমধ্যে গণ্য; কিন্তু এই বিন্ধ্যগণ মুণ্ডজাতীয় কোল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। চুটীয়া নাগপুরের মুণ্ডদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুণ্ডদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্য কর্ম্মচারী সর্ব্বত্র দেখা যায়, বিন্ধ্যগণের মধ্যেও ঐরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্ডেরা লোহা প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিন্ধ্যগণও সেই কাজে সুদক্ষ ও সুব্যবসায়ী। আর মুণ্ডদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতিবিভাগ আছে, ইহাদিগেরও সেইরূপ আছে। মুণ্ডদিগের কিলীরও যে যে নাম, বিন্ধ্যদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, বিন্ধ্যগণ মুণ্ড কোল। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দিভাষা বলে ও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে।*

দ্বিতীয়। আসামে চুটীয়া নামে একটি জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্য্যের ন্যায়। কোন আসামী বুরুঞ্জীতে কর্ণেল্ ডাল্টন্ দেখিয়াছেন যে, উত্তর-প্রদেশস্থ পর্ব্বত হইতে তাহারা উপর আসামে প্রবেশ করিয়া, সুবণেশ্বরী পার হইয়া সদীয়াপ্রদেশে বাস করে। লকিমপুরপ্রদেশে দিক্রু নদীর উপরে, এবং উপর আসামের অন্যত্র দেউরী চুটীয়া নামে এক চুটীয়াজাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগের ভাষা সমালোচন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ঐ চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার সঙ্গে একজাতীয়। অতএব চুটীয়ারা যে অনার্য্যজাতি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটীয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য। এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু

* Statistical Account of Bengal, Vol. VII, P. 213.

চুটীয়া বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটীয়া বলিলেই বুঝাইবে যে, ম্লেচ্ছ চুটীয়া ছিল বা আছে।*

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্য্যবংশ। তাহাদের অবয়ব মোঙ্গলীয়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে। এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

চতুর্থ। কোচেরা আর একটি অনার্য্যজাতি। আসল কোচভাষা মেছকাছাড়ি ভাষা সদৃশ, কিন্তু ঐতিহাসিক সময়েই কোচবেহারের রাজাদিগের আদিপুরুষ হজুর পৌত্র বিসু সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচবেহারের যত ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন। ইতর কোচেরা মুসলমান হইল।†

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্য্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।‡

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্য্যজাতি কালীপূজা করিযা থাকে।§

সপ্তম। পহেয়া নামে পালামৌতে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা কয় এবং কতকগুলি আচার ব্যবহার তাহাদের হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদের অনার্য্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সগু'জায় কিসান বলিয়া এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য্য এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার সব কোলের ন্যায়, তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচাব ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।@

নবম। "বুনো" কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড় (ওরাঁও), কিন্তু এ দেশে যত "বুনো" দেখা যায়, সকলেই হিন্দু।

এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যাহা দেওয়া গেল, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে। এই কয়েকটি উদাহরণ দ্বারাই উত্তমরূপে প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালার বাহিরে এমন অনেক অনার্য্যবংশ পাওয়া যায় যে, তাহারা আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া ও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদি বাঙ্গালার বাহিরে অনার্য্য হিন্দু পাওয়া যাইতেছে, তবে বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনার্য্য হিন্দু থাকাও সম্ভব। বাস্তবিক আছে কি না, তাহা বিচার করার প্রয়োজন।

এইখানে বলা উচিত যে, পাশ্চাত্যদিগের সাধারণ মত এই যে, প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্রদিগের উৎপত্তি এইরূপই ঘটিয়াছিল। জাতিভেদ সম্বন্ধে অনেকে অনেক মত প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের মতে জাতিভেদ তিন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যভেদ। এটি ব্যবসায়ভেদেই উৎপন্ন হইয়াছিল।

* Statistical Account of Bengal, Vol. XVI, P. 82-83.

† Dalton's Ethnology, P. 78,

‡ Buchanan Hamilton—Rungpur, Vol. III, P. 419. Hodgson I. A. S. B. XXXI. July 1849.

§ Dalton's Ethnology, P. 130.

@ Dalton's Ethnology, P. 132

এখন আমরা ইউরোপে দেখিতে পাই যে, কোন কোন কুলীনবংশ পুরুষানুক্রমে রাজকার্য্যে লিপ্ত। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য করিতেছে। কোন সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্য্য বা মজুরী করিতেছে। কিন্তু ইউরোপে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ব্যবসায় গ্রহণ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন নাই। এবং সচরাচর এরূপ ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যেরা বিবেচনা করিতেন যে, যাহার পিতৃ-পিতামহ যে ব্যবসায় করিয়াছে, সে সেই ব্যবসাতেই সুদক্ষ হয়। তাহাতে সুবিধা আছে বলিয়া লোকে প্রথমতঃ ইচ্ছা করিয়া পৈতৃপিতামহিক ব্যবসায় অবলম্বন করিত। শেষ উচ্চব্যবসায়ীদিগের নিকট নীচব্যবসায়ীবা ঘৃণ্য হওয়াতেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদিগের প্রণীত দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির বলেই হউক, বিদ্যাব্যবসায়ী যুদ্ধব্যবসায়ীর সঙ্গে মিশিল না। যুদ্ধব্যবসায়ী বণিকের সঙ্গে মিশিল না। এইরূপে তিনটি আর্য্যবর্ণের সৃষ্টি। জাতিভেদ উৎপত্তিব দ্বিতীয় রূপ শূদ্রদিগের বিবরণে দেখা যায়। তাহা উপরে বুঝাইয়াছি। শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় সকল আর্য্যেরা আপনার হাতে রাখিল, নীচব্যবসায় শূদ্রের উপর পড়িল। বোধ হয়, প্রথম কেবল আর্য্যে ও শূদ্রে ভেদ জন্মে; কেন না, এ ভেদ স্বাভাবিক। শূদ্রেরা যেমন নূতন নূতন আর্য্যসমাজভুক্ত হইতে লাগিল, তেমনি পৃথক্ বর্ণ বলিয়া, আর্য্য হইতে তফাত রহিল। বর্ণ শব্দই ইহার প্রমাণ। বর্ণ অর্থে রঙ। পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি যে, আর্য্যেরা গৌর, অনার্য্যেরা "কৃষ্ণত্বচ্"। তবে গৌর কৃষ্ণ দুইটি বর্ণ পাওয়া গেল। সেই প্রভেদে প্রথম আর্য্য ও শূদ্র, এই দুইটি বর্ণ ভিন্ন হইল। একবার সমাজের মধ্যে থাক আরম্ভ হইলে, আর্য্যদিগের হস্তে ক্রমেই থাক বাড়িতে থাকিবে। তখন আর্য্যদিগের মধ্যে ব্যবসায়ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিনটি শ্রেণী পৃথক্ হইয়া পড়িল, সেই ভেদ বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বপরিচিত "বর্ণ" নামই গৃহীত হইল। তার পর আর্য্যে আর্য্যে, আর্য্যে অনার্য্যে বৈধ বা অবৈধ সংসর্গে সঙ্করজাতিসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল। সঙ্করে সঙ্করে মিলিয়া আরও জাতিভেদ বাড়িল। জাতিভেদের তৃতীয় উৎপত্তি এইরূপ।

এক্ষণে আমরা বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে অনার্য্যত্বের অনুসন্ধান করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—অনার্য্য বাঙ্গালী জাতি*

বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত মালপাহাড়িয়া বলিয়া একটি অনার্য্য জাতি আছে; তাহারা কোন আর্য্যভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালী মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য। জেনারেল্ কনিংহাম্ প্রাচীন রোমীয় লেখক প্লিনি হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেবা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালবের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আর্য্যজাতি হইতে একটি পৃথক্ জাতি ছিল। জেনারেল্ কনিংহাম্ বলেন, এই প্লিনির লিখিত মালেরা টলেমি

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, বৈশাখ।

প্রণীত মণ্ডলজাতি। টলেমিলিখিত মণ্ডলজাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিভারলি সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্লিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালী মাল। এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে অনার্য্যদিগকেই দেখিতে পাই। কান্দু নামক অতি অসভ্য অনার্য্যজাতির দেশের বিভাগকে মাল বা মালো বা মালিয়া বলে।* অনার্য্যপ্রধান মানভূম প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য পাহাড়িদিগকে মালের জাতি বলে। উড়িষ্যার কিঁউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভূঁইয়া নামক এক অনার্য্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভূঁইয়া। † বুকানন্ হ্যামিল্টন্ ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্য জাতির মধ্যে মালেব বলিযা একটি অনার্য্যজাতি দেখিয়াছিলেন। কাঁধদিগের মালিয়া বলিয়া একটি জাতি আছে। ‡ বাজমহলীর মাল পাহাড়িদিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আর্য্যদিগেব মধ্যে মল্ল শব্দ আছে—অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্য্যমল্ল। আর্য্যমল্ল হইতে মালজাতির উৎপত্তি, না অনার্য্য মল্লগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া আর্য্যভাষায় বাহুযোদ্ধার নাম মল্ল হইয়াছে? মালেরা যে অনার্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা এক প্রকাব স্থির বলা যাইতে পাবে।

সাঁওতালদিগেব পাহাডমধ্যে ডম নামে একটি অনার্য্যজাতি আছে। তাহাদিগের হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন।§ ইহা সত্য বটে যে, অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগের পৃথক্ ধর্ম্মযাজক আছে। ঐ ধর্ম্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত। এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি। নেপালের নিকটে ডুমী নামে এক অনার্য্যজাতি আজিও বাস করে।@

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্য্যজাতির নাম অনার্য্যভাষায় মনুষ্যবাচক শব্দবিশেষ হইতে হইয়াছে। হো শব্দ ইহার পূর্ব্বে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। সাঁওতালী ভাষায় হাড শব্দে মনুষ্য। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি অনার্য্যবংশ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি স্বভাবতঃই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ। কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ, এমত নহে; যেমন তপ্ত দেশে কাফ্রির বাস আছে, তেমনি তপ্ত দেশে গৌরবর্ণ আর্য্য বা মোঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইণ্ডিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত, সেই প্রদেশেই সাক্সন্ বংশীয়দিগের বর্ণ গৌর; তিনি শত বৎসরে কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে

* Dalton, P. 299.

† Dalton, P. 145.

‡ Dalton, P. 293.

§ Non-Aryan Dictionary, P. 29.

@ Non-Aryan Dictionary, P. 29.

এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্য্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে। রৌদ্র-সন্তাপে কতক দূর কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্য্যদের তাহা কিছু দূর জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবাসী কতকগুলি অনার্য্যজাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে, বেণ রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় খর্ব্বকায় অট্টাস্য এক পুরুষ জন্মে। এই বর্ণনায় মধ্যভারতের খর্ব্বাকৃত অট্টাস্য কৃষ্ণকায় অনার্য্য-দিগকে পাওয়া যায়। ঐ পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে।* ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্য্যজাতির উৎপত্তি।† হরিবংশে বেণের উপাখ্যানে ঐরূপ লিখিত হইয়া, ঐ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবর জাতির আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে।‡ মনু বলিয়াছেন যে, আয়োগবি অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলে।§ অমরকোষাভিধানে কৈবর্ত্তদিগের নাম কৈবর্ত্ত, দাস, ধীবর। পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে যে, ঋগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্য্যজাতি পাওয়া যায়। দাস, ধীবর, কৈবর্ত্ত তিনই এক। যদি দাস ও ধীবর অনার্য্য হইল, তবে কৈবর্ত্তও অনার্য্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত্ত, কতকগুলি জেলে কৈবর্ত্ত। পূর্ব্বে সকলেই মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর ছিল, সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত্ত। ধোপারা ঐরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষাধোপা বলিয়া পৃথক্ জাতি হইয়াছে।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামে প্রাচীন জাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মনু লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌণ্ড্রকদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও পহ্লব ভারতবর্ষের বাহিরে। ভিতরে সকলগুলিই অনার্য্য, যথা—

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিডাঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, "অন্ধ্রা পুণ্ড্রা সবরা পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি।" মহাভারতেও এই পুণ্ড্রদিগের কথা আছে। সভাপর্ব্বে আছে যে, ভীম দিগ্বিজয়ে

* "কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ আহ স চাতুরঃ
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ॥"

† "তেন দ্বারেণ নিষ্ক্রান্তং তৎ পাপং তস্য ভূপতেঃ।
নিষাদাস্তে তথা যাতা বেণকল্মষসম্ভবাঃ॥"

‡ "নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ।
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেণকল্মষসম্ভবান্॥"

§ "নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনং।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥"
মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকিকচ্ছবাসী মনোজ্ঞা রাজা, এই দুই মহাবল-পরাক্রান্ত বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিযা বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে। উইলসন্ সাহেবও স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণা-নুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক তত্ত্ব নিরূপণকালে বাঙ্গালাব পশ্চিমাংশেই পুণ্ড্রজাতিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।* তার পর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থ্ সাঙ্ নামক চীন পরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ড্রদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন

*"*Pundras* the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following districts: Rajashahi, Dinagepore, and Rungpore; Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapore ·and the Jungle Mehals; Ramghur, Pacheti, Palamow, and part of Chunar. See an account of Pundra translated from what is said to be part of the Brahmanda Section of the Bhavishyat Purana in the Quarterly Oriental Magazine, Decr. 1824. *Wilson's Vishnu Puranas.*

আমাদিগের প্রিয়বন্ধু, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন (ভবিষ্যপুরাণ, ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে ; ব্রহ্মাখণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড নহে ; এগুলি ছোট ছোট সাহেবী ভুল)। উহার এক কাপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুঁথিখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে ; কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্ত্তৃক ·যশোরের আক্রমণ বর্ণিত আছে। যবনাধিকারের চারি শত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালী রাজার যে যুদ্ধ হয়, তাহার বর্ননা আছে। বিশেষ, গ্রন্থকারের বঙ্গদেশমধ্যে আসাম, চট্টল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এতদূর ত গ্রন্থের পরিচয় গেল। তাহাতে আছে যে, পৌণ্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত :— গৌড়দেশ, বারেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্যপার্শ্ব। এই সকল দেশের লোক দুষ্ট, চোর, ·পরদারনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি। গৌরদেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরসিধাবাদ, (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত ফরম ; মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুধাবাদ বলিত বলিয়া ষ্টুয়ার্টের হিষ্টরি অব্ বেঙ্গলে উক্ত আছে) : সুতরাং গ্রন্থখানি ২০০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড়দেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই। পাণ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বরেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পুট্রিলা, নটারো, চপলা (যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ), কাকমারী। নীবৃত দেশের প্রধান নগর কচ্ছপ, নসর, শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বাগদী রাজা। নারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড়, করা, সোণামুখী ইত্যাদি। বরাহভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর, ধবল ইত্যাদি। বর্দ্ধমানের প্রধান নগর বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। বিন্ধ্যপার্শ্বের প্রধান নগর সুদর্শন, পুষ্পগ্রাম ও বদরী

দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কানিংহাম্ সাহেব ঐ চীন পরিব্রাজকের লিখিত দিক্ ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলার অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বলিলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রকৃত সংস্থান ঘটিত। তারপর দশকুমারচরিতে লেখা আছে, "অনুজায় বিষাণবর্ম্মণে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ড্রাভিযোগায় বিরোচেয়ং।" অর্থাৎ পুণ্ড্রদেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্ম্মাকে দণ্ড চক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরিলিখিত উক্তি কোন মৈথিল রাজার উক্তি, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয়, তখনও পুণ্ড্রেরা মিথিলাব নিকটবাসী।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, স্মৃতি, এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্ব্বকাল হইতে দশকুমারচরিত ও হিয়েন্থ্সাঙের সময় পর্য্যন্ত পুণ্ড্র নামে প্রবল জাতি বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বাস কবিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় ব ।বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড্র নামে কোন জাতি নাই। এই পুণ্ড্রজাতি তবে কোথায় গেল ?

সংস্কৃত শব্দে "ণ্ড" থাকিলে, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ড-কার, ড-কার হইয়া যায়। আর ণ-কার লুপ্ত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পবিণত হয়। যথা—ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড, যণ্ডের স্থলে ষাঁড, শুণ্ডের স্থলে শুঁড। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের র-কারাদির সচরাচর লোপ হয়,—যথা—তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তার পর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড হয়, শুণ্ড স্থলে শুঁড হয়, তেমনি পুণ্ড স্থলে পুঁড বা পুঁড়ো হইবে। পুঁড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতির সঙ্গে গণিত হইয়াছে। অতএব পুঁড়ো আর একটি অনার্য্য-বংশোদ্ভূত বাঙ্গালী জাতি।

কুড়ক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদূর মানচিত্র বোধ আছে, তাহাতে বোধ হয়, চতুঃসীমা অনেক ভজিবে না। গৌড়দেশের উত্তরে পদ্মাবতী ও দক্ষিণে বর্দ্ধমান। আসল গৌড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না।

উইল্‌সন্ সাহেব ঐ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পুণ্ড্র দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

"নদীং গোদাবরীং চৈব সর্ব্বমেবানুপশ্যতঃ।
তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্॥"

* দশকুমারচরিত, তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

শব্দের অপভ্রংশ এক প্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষার কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত 'স্থান' শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান, কোথাও ঠাঁই। 'চন্দ্র' শব্দ কখন চন্দর, কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালীর উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড্র শব্দ স্থানবিশেষে পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালীরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে, যেমন সাঁওতাল সাঁওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়াল হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ড্র শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুণ্ডরীতে পরিণত হয়। পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালী জাতি আছে, পুণ্ড্রেরা এবং পুঁড়োরা যদি অনার্য্য, তবে পুণ্ডরীরাও অনার্য্যজাতি।

পোদ শব্দ পুণ্ড্র শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয়।

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, পুঁড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্রজাতির সন্তান। পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালী সমাজের ভিতর আর তিনটি অনার্য্যজাতি পাওয়া যাইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—আর্য্য শূদ্র *

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালী শূদ্র বলিয়া গণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালী শূদ্রে সকল না হউক, কেহ কেহ অনার্য্যবংশ। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা সবগুলি ছিদ্রশূন্য নহে। তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অখণ্ডনীয় আছে। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্য্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্য্যশোণিত বর্ত্তমান, তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয় জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান, অতএব ঐ কয়টি জাতির অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে।

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালী ও ধর্ম্মে হিন্দু, সুতরাং তাহারা বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্য্যের ন্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাকৃত, শূকর পালে এবং শূকর খায়। সুতরাং তাহাদিগের অনার্য্যত্বে কোন সংশয় নাই। মনু, মহাভারতাদির পুলিন্দ জাতি বর্ত্তমান পলিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ।

কোন আর্য্যবংশীয় জাতি যে শূকর পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। কেন না, শূকর আর্য্যশাস্ত্রানুসারে অতি অপবিত্র জন্তু; বাঙ্গালাজয়কারী আর্য্যেরা ঐ সকল ব্যবসায় যে অনার্য্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ, শূকর বা শূকরমাংস আর্য্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শূকরপালক জাতিদিগকে অনার্য্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণবাঙ্গালার কাওরারাও অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনার্য্যদিগের ন্যায়। কাওরারা কোন্ অনার্য্যজাতিসম্ভূত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি অনার্য্যজাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা—কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাড়িয়া, কৌর ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃততে কিরাও হইবে। কিরাও শব্দের অপভ্রংশে কাওরাও হওয়া অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার উত্তরে কিরাতেরা কিরাতি বা কিরান্তি নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পাশ্চাত্ত্যেরা বাগ্‌দীদিগকেও অনার্য্যবংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন। বাস্তবিক বাগ্‌দীদিগের আকার ও বর্ণ হইতে অনার্য্যবংশ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে বাগ্‌দী ও বাউরী এক আদিম জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন।

আমাদিগের এমত ইচ্ছা নহে যে, বাঙ্গালার হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি অনার্য্যবংশ, তাহা একে একে নিঃশেষ করিয়া মীমাংসা করি। বাঙ্গালার শূদ্রদিগের মধ্যে অনেকাংশ যে অনার্য্যবংশ, ইহাই দেখান আমাদিগের উদ্দেশ্য। এবং পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী শূদ্রের মধ্যে অনার্য্যবংশ অতিশয় প্রবল। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র মাত্রেই অনার্য্যবংশ। প্রথম বর্ণভেদ উৎপত্তির সময়ে সকল শূদ্রই অনার্য্য ছিল বোধ হয়। কিন্তু ক্রমে আর্য্যসম্ভূত সঙ্কীর্ণ বর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ আর্য্যবর্ণ যে এখন শূদ্রের মধ্যে মিশিয়াছে, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এখনকার সকল শূদ্রই অনার্য্য, এই কথার অমূলকতা প্রতিপাদন করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথম, কে আর্য্য আর কে অনার্য্য, ইহা মীমাংসা করিবার দুইটি মাত্র উপায়। এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতরে ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। কেন না, সকল বাঙ্গালী শূদ্রই আর্য্য ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই একমাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কায়স্থ প্রভৃতি অনেক শূদ্রের আকার আর্য্যপ্রকৃত। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণগত কোন বৈসাদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে, কতকগুলি শূদ্র আর্য্যবংশীয়।

দ্বিতীয়, পূর্ব্বে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের রীতি ছিল; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যাকে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত। ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলিত। এইরূপ অধঃস্থজাতীয় পুরুষ শ্রেষ্ঠজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করিলে, প্রতিলোম বিবাহ বলিত। ইহার বিধি মন্বাদিতে আছে। যেখানে বিবাহ বিধি ছিল, সেখানে অবশ্য বৈধ বিবাহ ব্যতীতও অসবর্ণ সংযোগে সন্তানাদি জন্মিত। তাহারা চতুর্বর্ণের মধ্যে স্থান পাইত না।

মনু বলিয়াছেন, চতুর্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।* টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহাতে লেখেন যে, সঙ্কীর্ণ জাতিগণ অশ্বতরবৎ মাতা বা পিতার জাতি হইতে ভিন্ন; তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই।+ এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক।

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥"

মনু, ১০ম অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠের জন্ম, আর শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ

"শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাং।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" মনু, ১০ম অ, ১২।

অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্তা, আর ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম।

যে সকল ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে জাত বলিয়া বর্ণিত আছে।

এই সকল সঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যমধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত। এবং ইহারা যে শূদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ; কেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই। কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল; বাঙ্গালী শূদ্রের তাহা একটি প্রধান ভাগ। চণ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালায় শূদ্রজাতি অনেকেরই সঙ্করবর্ণ; সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্য্য-শোণিত, হয় পিতৃকুল, নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অম্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয় কুলে বিশুদ্ধ আর্য্য, তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আর্য্য।

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয় এবং কতকগুলি আর্য্যে অনার্য্যে মিশ্রিত, পিতৃমাতৃকুলের মধ্যে এক কুলে আর্য্য, আর কুলে অনার্য্য।

চতুর্থতঃ, কতকগুলি শূদ্রজাতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যজাতিমধ্যে গণ্য, কিন্তু

---

* "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥"

মনু, ১০ম অধ্যায়, ৪।

+ "পঞ্চমঃ পুনর্বর্ণো নাস্তি। সঙ্কীর্ণজাতীনাং ত্বশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজাতিব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বং।"

আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত, যথা বণিক্। বণিকেরা বৈশ্য; তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয়, কেহই তাহাদিগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—স্থূল কথা*

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহার পুনরুক্তি করিতেছি।

ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতিসকল এক প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা আর্য্যভাষা, সেই আর্য্য-বংশীয়। বাঙ্গালীর ভাষা আর্য্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালী আর্য্যবংশীয় জাতি।

কিন্তু বাঙ্গালী অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য্য সন্দেহ নাই, কেন না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে ঐরূপ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও বণিক্‌গণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য্য, কিন্তু শূদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্য, কি বিশুদ্ধ অনার্য্য বিবেচনা করিব, কি মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচার আমরা এতদূর বিস্তারিত করিয়াছি। কেন না, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সংখ্যায় শূদ্রই প্রধান।†

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না?

বিচারে পাওয়া গিয়াছে যে, আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অনার্য্যদিগের বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি যে, সেই অনার্য্যগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড়বংশের পূর্ব্বে কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালার অধিকারী ছিল। তারপর দ্রাবিড়বংশীয়েরা আইসে। পরে আর্য্যগণ আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে কোলীয় ও দ্রাবিড়ী অনার্য্যগণ তাঁহাদিগের তাড়নায় পলায়ন করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু সকল অনার্য্যই আর্য্যের তাড়নায় বাঙ্গালা হইতে পলাইয়া বন্য ও পার্ব্বত্য দেশে আশ্রয় লইয়াছিল, এমত নহে; আমরা দেখিয়াছি যে, অনার্য্যগণ আর্য্যের সংঘর্ষণে পড়িলে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে, হইয়াছিল ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এইরূপে

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ।

† ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৬০০০০০ লোক বসতি করে—তন্মধ্যে ১১ লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ।

হিন্দুত্বপ্রাপ্ত অনার্য্য থাকা অসম্ভব নহে। আছে কি না—তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া দেখিয়াছি।

দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার এমন একটি ভাগ আছে যে, অনার্য্যভাষাই তাহার মূল বলিয়া বোধ হয়। আরও দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালী শূদ্রদিগের মধ্যে এমন অনেকগুলি জাতি আছে যে, অনার্য্যগণকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী শূদ্রের কিয়দংশ অনার্য্যসম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্য্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আর্য্য অনার্য্য উভয়কুলজাত, যেমন চণ্ডাল।

এক্ষণে এই বাঙ্গালী জাতি কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সাক্সন্, ডেন্ ও নর্ম্মান্ মিশিয়া ইংরেজ জন্মিয়াছে। কিন্তু ইংরেজের গঠনে ও বাঙ্গালীর গঠনে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। টিউটন্ হউক বা নর্ম্মান্ হউক, যতগুলি জাতির সংমিশ্রণে ইংরেজ জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলগুলিই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালী যে কয়েকটি জাতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহার কেহ আর্য্য, কেহ অনার্য্য। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডে টিউটন্ ও ডেন্ ও নর্ম্মান্, এই তিন জাতির রক্ত একত্রে মিশিয়াছে। পরস্পরের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধের দ্বারা মিলিত হইয়া তাহাদিগের পার্থক্য লুপ্ত হইয়াছে। তিনে এক জাতি দাঁড়াইয়াছে, বাছিয়া তিনটি পৃথক্ করিবার উপায় নাই। মোটের উপর এক ইংরেজজাতি কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যদিগের বর্ণধর্ম্মিত্বহেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক্ স্রোত মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই; আর্য্যসম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্য্যসম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ রহিয়াছেন। যদি কোন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য্য অনার্য্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙ্গালীসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।

বাহুবল ও বাক্যবল*

সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত—বাহুবল ও বাক্যবল। এই দুই বল সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবার পূর্ব্বে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। বাহ্য জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। মনুষ্যও বাহ্য জগতের অংশ, সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়মসকল উল্লঙ্ঘন করিলে রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্য জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগৎও আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থসকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র্য দুঃখ সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র্য নাই।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল—যথা দারিদ্র্য। যেমন আলো হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে—তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই দারিদ্র্যাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে।† এ সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখনও সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্যফল নহে; তাহা নিবার্য্য, এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদজন্য বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি, এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্বাধীনতার হানি, একটি দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, যতগুলি মনুষ্য সমাজসভুক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, ততগুলি মনুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন—এবং সমাজের কর্ত্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার হানি একটি সামাজিক নিত্যদুঃখ।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, জ্যৈষ্ঠ।

† আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহা সত্য যে, এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি যে, সে জগতে আলোকদায়ী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই—সুতরাং আলোক আছে, ছায়া নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি যে, তাহাতে সুখ আছে—দুঃখ নাই। কিন্তু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকল্পিত, অস্তিত্বশূন্য।

স্বানুবর্ত্তিতা একটি পরম সুখ। স্বানুবর্ত্তিতার ক্ষতি পরম দুঃখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদ্রিত রাখিলাম—তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি আমি কখনও কখনও বা কোন কোন বস্তুসম্বন্ধে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম—দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম না—তবে আমি কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে দুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি—বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিই আমার সুখ। যদি আমি বুদ্ধির মার্জ্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বুদ্ধিসম্বন্ধে দুঃখী। সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাই না—সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই না—অথবা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বানুবর্ত্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এগুলি সামাজিক নিত্যদুঃখ।

দারিদ্র্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে—বনের ফলমূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য, পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএ্য একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশূন্য। দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতমব সামাজিকতার নিত্যফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল.

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যতদিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, ততদিন এ সকল ফল নিবার্য্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা অনিত্য এবং নিবার্য্য। এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক দুঃখ—নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দু সমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক দুঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি নিবার্য্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ।

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া থাকে। সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে, সোশিয়ালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট্ প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্ত্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মিল্ "Liberty" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন—অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বরূপ্ গণ্য। যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও

চিকিৎসা আছে—যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না।

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্যসমাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখসকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য্য ফল—সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সেগুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলি কোথা হইতে আইসে? সেগুলি সমাজের অপরিহার্য্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এগুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত। বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে হইবে—নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন, সমাজের আবার অত্যাচার কি? শক্তির অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসর্গিক শক্তি, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে, তাহার কখনও আধিক্য নাই, কখনও অল্পতা নাই; বিধিবদ্ধ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল শক্তি মানুষের হস্তে, তাহার এরূপ স্থিরতা নাই। মনুষ্যের হস্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে এবং অবিহিত হইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ। তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত প্রয়োগ। বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শত্রুবধ হয়, অহিহিত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার।

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার।

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থে যাহারা সমাজবদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই পরস্পরে উৎপীড়ন করে? তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তিরই অত্যাচার; যাহার হাতে সামাজিক শক্তি, সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিণ্ডমাত্রের মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি—শাসনশক্তি; সামাজিক কেন্দ্র—রাজা বা সামাজিক শাসনকর্ত্তৃগণ। সমাজরক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক। সকলেই শাসনকর্ত্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেরই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে। তাঁহারাই সমাজের শাসনশক্তিধর—সামাজিক কেন্দ্র। তাঁহারই অত্যাচারী। তাঁহারা মনুষ্য; মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই

সমাজপ্রদত্ত শাসনশক্তি, শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও তাঁহারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন।

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুরুষ—অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে। যিনিই সমাজের শাসনকর্ত্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ, রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন না, অথচ তাঁহারা সমাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেন ঘুরাইতেন, আর্য্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আর্য্যসমাজ সেই শিকল পরিত। মধ্যকালিক ইউরোপের ধর্ম্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন—রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্ত্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেন্ট্, লিও বা আড্রিয়ান্ ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ্ বা চতুর্দ্দশ লুই, অষ্টম হেন্‌রী বা প্রথম চার্লস্ ততদূর করিতে পারেন নাই।

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্ম্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাজা (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন—শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসনশক্তি ইংলণ্ডে সংবাদপত্রলেখকদিগের হস্তে। সুতরাং ইংলণ্ডের সংবাদপত্রলেখকগণ অত্যাচারী। যেখানে সামাজিক শক্তি, সেইখানেই সামাজিক অত্যাচার।

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্ত্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী, এমত নহে। অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধর্ম্মশাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্ত্তার শাসন নাই—সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে কোন গোলই নাই—কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ ঐকমত্য অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্পাংশ ভিন্ন-মতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে। নহিলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া দিবে—বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে না বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অল্পাংশের মত, বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইংলণ্ডদর্শন পরম ইষ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্পাংশ আপনাদিগের মতানুসারে কার্য্য করে,—বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা অধিকাংশকর্ত্তৃক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্ত্তৃক অল্পাংশের উপর সামাজিক অত্যাচার।

ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টভক্ত এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী বা খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তিশূন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত করিলে, নানা প্রকার সামাজিক পীড়ায় পীড়িত হয়। মিল্ জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না ; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লিয়ামেণ্টে অভিষেক-কালে অনেক বিঘ্নবিব্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত ; এক, সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ ; দ্বিতীয়, সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহাদিগের অত্যাচারে-সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিরাকরণ মনুষ্যের সাধ্য এবং অবশ্য কর্তব্য। কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে ?

দুই উপায় ; বাহুবল এবং বাক্যবল।

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অস্তলিজ্ বা সেডান্ জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল ;—দুইই বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে একটা টিকটিকি একটা মক্ষিকা ধরিয়া খাইল—সিস্ত্রিস্ হইতে আলেক্‌জণ্ডর্ রমানফ্ পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে—রোমান্ বা মাকিদনীয়, খস্রু বা খলিফা, রুস্ বা প্রুস্ যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত্ত টিকটিকির বল, একই বল—বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল—আর কালামুখী মার্জ্জারী ইঁদুর মুখে করিয়া পালাইল—উভয়েই বীর—বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি ;—কিন্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর এক মার্জ্জারীতেও প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ—বীর্য্যে প্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও জল—শিশিরবিন্দুও জল। মহম্মদের বীর্য্য ও টিকটিকি বিড়ালের বীর্য্য, একই বীর্য্য। দুইই বাহুবলের বীর্য্য।। পৃথিবীর বীরপুরুষগণ ধন্য! এবং তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তনকারী ইতিবৃত্ত-লেখকগণ—হেরডোটস্ হইতে কে ও কিঙ্‌লেক্ সাহেব পর্য্যন্ত—তাঁহারাও ধন্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে পাণিপাত সেডান্ জিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন্ বা মার্লবর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল—অর্থাৎ বুদ্ধিবল—বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কার্য্যে নহে—কেহ কি মনে করে যে, বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইঁদুর ধরে ? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের স্ফূর্ত্তি নাই—এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফূর্তি নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে

প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বক্ষম, এবং সর্ব্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না— তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না—এমত প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে ; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল ; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশু-গণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদরপূর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ, কোন সিংহ কর্ত্তৃক বন্য পশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহারজন্য উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল,—সিংহকর্ত্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলের রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন ; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল প্রয়োগ-সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞাবিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এই এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এস্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাঁহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবল প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে

তাহাকে বুঝে। বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্ত্তব্য সাধন করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, বাহুবল প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্ত্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস্ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্স্, বাহুবল প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোন কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।৫৮ শালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগেব আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনা প্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু বাক্যবল বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহাব প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কিপ্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই—বর্ত্তমান অবস্থায় অকর্ত্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচার নিবারণের বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিমাণ বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতক দূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে

প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এক কালে কোনো বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্য্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদ্গত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না—তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্ট সাধন হয় না, এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত্তা বাহুবলবীর ওয়াশিংটন্। হলণ্ড্ বেলজীয়মের প্রধান উন্নতিসাধনকর্ত্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম্। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ—বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে পারিলে বাক্যবল হয় না।—বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্বসকল মনোমধ্য হইতে উদ্ধৃত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত—কখন কখন বলের আধার পৃথক্‌ভূত। একত্রিত হউক, পৃথক্‌ভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

(অসম্পূর্ণ)

বাঙ্গালা ভাষা

লিখিবার ভাষা*

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ।

বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা ; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য* গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন ; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী, এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী—যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক

* পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত—এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে ; চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধেই বর্ত্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকরী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না।

শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ, সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না—পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-স্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে

* যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরেজী জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাঁধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই—তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

পারিবেন কি ?—বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না ?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়, এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না ? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় ন, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহাব পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া ওরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য ; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, "হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে" এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, "ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া"। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জ বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহাব ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাস-পরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না ; বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্র একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে একদল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা—একাদশ বা চত্বারিংশৎ ব দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কন্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিযাছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাত হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা—জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা—মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, বামনের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাততঃ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি", কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে

যে, এই সেই "খেউরি" শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে—তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণ ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র, তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা, আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে; "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাইভাব", "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাইগিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ

করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে, ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? "মাধ্যাকর্ষণ" বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। "গ্র্যাবিটেশন্" বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য—অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য

নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওযা উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে বচনা সকলেই বুঝিতে পাবে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যেব অনুরোধে শব্দেব একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলেব অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে ; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রযোজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় হইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

মনুষ্যত্ব কি ?*

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই, বাক্যে না হউক, কার্য্যে এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই এক সম্প্রদায়ের মত—মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর এক সম্প্রদায়ের মত—মদ্যপান পরকালের জন্য পরম কার্য্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালী এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মনুষ্যজন্মের প্রধান কার্য্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অর্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে; মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ, এবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি পুণ্যকর্ম্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। অথবা মনে কর, রবিবারে কার্য্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়া নয়ন নিমীলন, এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মান্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্যকর্ম্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত নহে, যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র।

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজিও বড় গোল আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত—আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্ত্তি, এবং অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয়সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপূর্ত্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। তাহার উপর কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদরপূর্ত্তির পর, ধনে হউক বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ করাকে মনুষ্যগণ আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজ্যপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্য্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ব্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ্ বলিয়া পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্লভ, অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ ধন থাকিলেই সম্পদ্ বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাঙ্ক্ষাই সমাজমধ্যে

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৪, আশ্বিন।

লোকজীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ অগ্রবর্ত্তী, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে, বাহ্য সম্পদ্ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* কেবল সাধারণ মনুষ্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে।

কদাচিৎ কখনও এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পদ্‌কে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক, জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিঘ্ন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যে রাজ্যসম্পদ্‌কে অপর লোকে জীবনসফলকর বিবেচনা করে, শাক্যসিংহ তাহা বিঘ্নকর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যে, তাঁহারা বাহ্য সম্পদ্‌কে ঐরূপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে, ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী হউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হইয়াছে। এইরূপ আরও অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে, ঐহিক সম্পদে অননুরক্ত হইয়াও, সমাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় বৈরাগীসম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে।

স্থূল কথা এই যে, ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মহত্ত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র—পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্ম্মভূমি মাত্র—এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে। কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ, পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব।

তৃতীয়তঃ, পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষাভূমিমাত্র হইলেও ঐহিক এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্য্যেই ইহলোকেও শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দ্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, ইহলোকে অধার্ম্মিকের শুভ, এবং ধার্ম্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ। তাঁহাদিগের বিচার এই মূল ভ্রান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্যকর্ম্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণ্যকর্ম্ম

* স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র অমঙ্গলজনক, এ কথা বলি না, ধন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।

শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্যকর্ম্ম কি পরলোকে, কি ইহলোকে শুভপ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্যকর্ম্ম, তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথব যশের লালসায় অপ্রসন্নচিত্তে দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্যকর্ম্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব।

অতএব মনোবৃত্তিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃ নিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমত নহে। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাহাদিগের জীবন-বৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদিগের জীবনের গূঢ় তত্ত্ব সকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল দুই জন আপন আপন জীবন-বৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। একজন গেটে, দ্বিতীয় জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্।

লোকশিক্ষা*

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়।

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, অগ্রহায়ণ।

বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহার লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যাবুদ্ধিপ্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী-নবীশ সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এদেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না।

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদপত্র, কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তারপর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্ব্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূট তর্কসকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে—গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন,

ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয় আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুলাক কাওরাণী শূয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বৰ্দ্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার অস্লি ইডেন্, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি যাট লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি যাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে

আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

রামধন পোদ*

বাঙ্গালার সাহিত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই—বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই অভিনব অভ্যুত্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্ন কণ্ঠে একই অস্ফুট বোল—"হায়! বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।" বাঙ্গালীর যত দুঃখ, তার একই মূল—বাহুতে বল নাই।

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইব—বাঙ্গালী খাইতে পায় না—বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পূরিয়া স্তন্য পায় না, তেমনি আমাদের জন্মভূমি বহুসন্তানপ্রসবিনী বলিয়া তাহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ। প্রজাবাহুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণশরীরত্ব, জ্বরাদি পীড়া এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য।

অনেকে বলিবেন—দেখ, দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে—তাহাদের আহারের কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুর্ব্বল—বড় মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু এক পুরুষে অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই এক পুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথা ছাড়িয়া দাও—তাঁহারা নড়িয়া বসেন না—সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না—ভুক্ত আহার জীর্ণ করিতে পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায় বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল।

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, "এ রকম কঠিনহৃদয় মাল্‌থসি বুলি রাখিয়া দাও! ও ছাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?" এ সম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী টাকা দিবে, তাহাকেই আমি জিনিষ বেচিব।

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জুটিল না বলিয়া খাইতে পাইল না—এরূপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এ দেশে নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন, চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলেই হইতে পারে—কিন্তু সে

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৮, ভাদ্র।

জীবনরক্ষা মাত্র। শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক সার পদার্থ শতাংশে সাত ভাগ আছে মাত্র। চর্বি—যাহা শরীরপুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চাউলে তাহা কিছু মাত্র নাই।

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিটা, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা আং কাঁচকলার কণিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম "ভাত ব্যঞ্জন"। এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে উনিশ গণ্ডা—ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া। সুতরাং ইহাকেও শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এইরূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে—হইয়াও থাকে কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে,—(সাক্ষী ম্যালেরিয়া জ্বর)—আর এরূপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যতদিন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, ততদিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। মাংসের প্রয়োজন নাই, দুগ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাল সব্জী, ইহাই উত্তম আহার। দৃষ্টান্ত—পশ্চিমে হিন্দুস্থানী। নৈবেদ্যে বিল্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাত্রের পরিবর্ত্তে, অন্নের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল। বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়া দিয়া এই সকলের মাত্রা বাড়াইতে পারে, তবে এক পুরুষে নীরোগ, দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতেছিলাম—কেন না, রামধন পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা। রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, "মহাশয় যা আজ্ঞা করলেন, তা সবই যথার্থ—কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না।"

কথাটা দেখিলাম সত্য। আমি রামধনের ঢেঁকিশালে ঢেঁকির উপর বসিয়াছিলাম—উঠানে একটা ঘেও কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারি নাই—সেইখান হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রামধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে, তাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে, একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে—পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে—তবে কম। পোদ বলিল যে, "মহাশয় গা! একটু পরিবার ছেঁড়া নেকড়া জুটাইতে পারি না—আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!" আমি বুঝিলাম, কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিবার উদ্যোগী—বোধ হইল, যেন সে বলিতেছে, "একমুঠা ফেলা ভাত পাই না, আবার উনি বুট পায়ে দিয়া ঢেঁকির উপর বসিয়া ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ করিলেন।" একটি রোমশূন্য গৃহমার্জ্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উঁচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রামধনালয়ে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল সন্দেহ নাই।

আমি রামধনকে বলিলাম, "চারিটি ছেলে—তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর দুইটি পুত্রবধূ বাড়িয়াছে?" রামধন হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্রবধূ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহাদের সন্তান সন্ততিও হইয়াছে?"

রামধন বলিল, "আজ্ঞা একটির দুইটি মেয়ে, একটির একটি ছেলে।"

আমি বলিলাম, "রামধন! শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহু পরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।"

রামধন বলিল, "এখন বড় কষ্ট হইয়াছে।"

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামধন! কেন এত পরিবার বাড়াইলে?"

রামধন কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি মহাশয়! আমি কি পরিবার বাড়াইলাম! বিধাতা বাড়াইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ—সুতরাং তুমিই দুইটি পুত্রবধূ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলিয়াই তিনটি নাতি নাতিনী বাড়াইয়াছ।"

রামধন কাতর হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমাকে অমন করিয়া খুঁড়িবেন না, যমদণ্ডে সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে।"

আমি দুঃখপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেটি কিসে গেল রামধন!"

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, বাহির করিলাম যে, সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুধ ছিল না। রামধনের গোরু মরিয়া গিয়াছিল—দুধ কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটি না খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া* মরিয়া গিয়াছিল।

অমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তারপর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে?"

রামধন বলিল, "টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যেগুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না—আবার বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌমা আসবেন—তাঁর আহার চাই। তারপর তাঁর পেটে দুটি চারিটি হবে—তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না—আবার বিয়ে?"

রামধন চটিল। বলিল, "বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায়, সেও দেয়, যে না খেতে পায়, সেও দেয়।"

আমি বলিলাম, "যে না খেতে পায়, তার বেটার বিয়েটা কি ভাল?"

রামধন বলিল, "জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।"

আমি বলিলাম, "জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্ব্বোধ জাতি আর কোন দেশে নাই।"

* অনাহারের একটি ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে।

রামধন উত্তর করিল, "তা দেশশুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ হইল?"

এমন নির্ব্বোধকে কিরূপে বুঝাইব? বলিলাম, "রামধন! দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে?"

রামধন চেঁচাইতে আরম্ভ করিল, "তুমি বল কি মশাই? গলায় দড়ি আর বেটার বিয়ে দেওয়া সমান?"

আমিও রাগিলাম, বলিলাম, "সমান কে বলে রামধন। এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।"

এই বলিয়া আমি ঢেঁকি হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম, গরিব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এইরূপ রামধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরিব পোদের ছেলে—বিদ্যা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক—আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাতগোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার—জ্বর প্লীহায় ব্যতিব্যস্ত—তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য—সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য—সে জ্বর প্লীহার সাথি হইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে! মনুষ্যজন্মে তাহাই তাঁহাদের সুখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল, তাহার বাঙ্গালীজন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সেটা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে, এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পল্টনের বাপ—রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব বিবাহিত তখন স্কুল ছাড়িয়া পুঁথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড় হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। হয়ত সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয়ত সে সময়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্তু পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির পেষণে—সংসারধর্ম্মের জ্বালায়—অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে—ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই—এখন সেই একমাত্র পথ খোলা—উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কেন না, আপনার স্ত্রীকন্যা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না—তাহারা রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে। আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ! লেখা পড়া, ধর্ম্মচিন্তা—এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই—ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে টাকাটা পেট্রিয়টিক্ আসোসিয়েসনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহাতে বধূঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে মনে করেন, ছেলেরও সর্ব্বনাশ—নিজেরও সর্ব্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্ব্বব্যাপী, সে দেশের

মঙ্গল কোথায় ? যে দেশে বাপ মা, ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে ?

সম্পাদকীয় মন্তব্য

'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দে ; 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ' ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে।

কিন্তু এই দুটি গ্রন্থ প্রকাশের আগে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলীর দুটি সংকলন প্রকাশ করেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'বিবিধ সমালোচনা'। তাতে মোট নয়টি প্রবন্ধ ছিল। 'বিজ্ঞাপন'টি ছিল এই :

"বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

'বিবিধ সমালোচনা'-য় প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র" 'বিবিধ প্রবন্ধে' পরিত্যক্ত হয় ; "সেকাল আর একাল" "অনুকরণ" নামান্তর গ্রহণ ক'রে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'প্রবন্ধ পুস্তক'—প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল দশ। 'বিজ্ঞাপনে' জানানো হয় :

"এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

"এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সেগুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কণের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

'প্রবন্ধ পুস্তক'-এ প্রকাশিত "বুড়া বয়সের কথা" 'কমলাকান্তে'

স্থানান্তরিত হয়। বাকি নয়টি প্রবন্ধ 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ'-এর অঙ্গীভূত হয়। তার মধ্যে, "হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক মূল" নামক প্রবন্ধটি সামান্য পরিবর্জিত আর সংশোধিত হয়ে "ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে" নাম গ্রহণ করে।

'বিবিধ প্রবন্ধ'-র 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র জানান :

"ইতিপূর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' নামে আর কতকগুলি 'প্রবন্ধ পুস্তক' নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রন্থই অপ্রাপ্য।

"দুইখানি পৃথক্ সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

"এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে ভ্রম সংশোধন করা গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থানে বিশেষ কারণবশতঃ প্রবন্ধ যেমন ছিল, তেমনি রাখিতে হইয়াছে।"

'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগ'-এর 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম জানান :

"যে সকল প্রবন্ধ এই সংগ্রহে পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল ; অল্পভাগ প্রচারে।

"১২৭৯ সালে আমি বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ করি। চারি বৎসর আমি উহার সম্পাদকতা নির্ব্বাহ করি। ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ চারি বৎসরের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে—যেমন সামান্যই হউক, একটু স্থান লাভ করিয়াছে। এজন্য অনেকে উহা পাইবার অভিলাষ করেন। অনেকে আমাকে সেজন্য পত্র লেখেন ; কিন্তু যাহা নাই তাহা আমি দিতে পারি না। অনেকে পরামর্শ দেন যে, বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রিত কর। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আমি একমাত্র লেখক ছিলাম না। অন্যের রচনা আমি কি প্রকারে পুনর্মুদ্রিত করিব ? যাহা পারি, তাহা করিয়াছি। আমরা নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি। যাহা বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

"সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত

পুনর্ম্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম। ইহার সঙ্গে প্রচার নামক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধও পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্ম্মুদ্রিত করিব কি না, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।

"যাহা পুনর্ম্মুদ্রিত হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি পুনর্ম্মুদ্রিত করা উচিত হইয়াছে কি না, এ বিষয় বিচারের স্থল। "বঙ্গদেশের কৃষক" তাহার মধ্যে একটি। যে সকল কারণে ঐ প্রবন্ধ পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম, তাহা ঐ প্রবন্ধের শিরোভাগে কতক কতক লিখিয়াছি। কিন্তু ঐখানে সকল কথা লিখিবার স্থান করিতে পারা যায় নাই। আমি সেখানে স্বীকার করিয়াছি যে, ঐ প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রঘটিত বিচারে কতকগুলি ভ্রম আছে। ভ্রমগুলি সংশোধিত না করিয়া প্রবন্ধটি পুনর্ম্মুদ্রিত করার একটি কারণ সেইখানে লিখিয়াছি। আর একটি কারণ নির্দ্দিষ্ট করিবার উপযুক্ত স্থান নাই। ঐ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে যেমন বাহির হইয়াছিল, তেমনই পুনর্ম্মুদ্রিত করিতে চাই। যে মানুষ খ্যাতি লাভ করে, তাহার দোষ গুণ আমরা দুই ই দেখিতে ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটিও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, অনেক পাঠক ঐ প্রবন্ধটিও দোষ গুণ সমেত দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন।

"এরূপ বিবেচনা করিয়াও বহুবিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্ম্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাঁহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাঁহার কোন ত্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম, তাহা যাঁহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাঁহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী সেদিন একটা হুলস্থুল

উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।

"বলিতে কেবল বাকি আছে "মনুষ্যত্ব কি?" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের সমালোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে যে অনুশীলনধর্ম্ম বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে। "রামধন পোদ' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধের অন্য নাম ছিল।"—ব. র, স।

সাম্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই সংসারে একটি শব্দ সর্ব্বদা শুনিতে পাই—"অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক।" এটি কেবল শব্দ নহে। লোকের পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল। অমুক বড লোক, পৃথিবীর যত ক্ষীর সর নবনীত সকলই তাঁহাকে উপহার দাও। ভাষার সাগর হইতে শব্দরত্নগুলি বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়া হার গাঁথিয়া তাঁহাকে পরাও, কেন না, তিনি বড় লোক। যেখানে ক্ষুদ্র অদৃশ্যপ্রায় কণ্টকটি পথে পড়িয়া আছে, উহা যত্নসহকারে উঠাইয়া সরাইয়া রাখ—ঐ বড় লোক আসিতেছেন, কি জানি যদি তাঁহার পায়ে ফুটে। এই জীবনপথের ছায়াস্নিগ্ধ পার্শ্ব ছাড়িয়া রৌদ্রে দাঁড়াও, বড লোক যাইতেছেন। সংসারের আনন্দকুসুম সকল, সকলে মিলিয়া চয়ন করিয়া শয্যারচনা করিয়া রাখ, বড় লোক উহাতে শয়ন করুন। আর তুমি—তুমি বড় লোক নহ—তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী দোলায়মান বেত্র তোমার জন্য—বড় লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।

বড় লোকে ছোট লোকে এ প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দক লোকে এক প্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানে না, বঞ্চনা করিতে জানে না, পরের সর্ব্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, সুতরাং যদু ছোট লোক, রাম চুরি করিয়া, বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু তাহার প্রপিতামহ চৌর্য্যবঞ্চনাদিতে সুদক্ষ ছিলেন, মুনিবের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া বিষয় করিয়া গিয়াছেন, রাম জুয়াচোরের প্রপৌত্র, সুতরাং সে বড় লোক। যদুর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—সুতরাং সে ছোট লোক। অথবা রাম কোন বঞ্চকের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর।

অথবা রাম সেলাম করিয়া, গালি খাইয়া, কদাচিৎ পদাঘাত সহ্য করিয়া, অথবা ততোধিক কোন মহৎ কার্য্য করিয়া, কোন রাজপুরুষের নিকট প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। রাম চাপরাশ গলায় বাধিয়াছে—চাপরাশের বলে বড় লোক হইয়াছে। আমরা কেবল বাঙ্গালীর কথা বলিতোছ না—পৃথিবীর সকল দেশেরই চাপরাশবাহকের একই চরিত্র—প্রভুর নিকট কীটাণুকীট, কিন্তু অন্যের কাছে?—ধর্ম্মাবতার!! তুমি যে হও, দুই হাতে সেলাম কর, ইনি ধর্ম্মাবতার। ইঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, অধর্ম্মেই আসক্তি,—তাহাতে ক্ষতি কি? রাজকটাক্ষে ইনি ধর্ম্মাবতার। ইনি গণ্ডমূর্খ, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ—সে কথা এখন মনে করিও না, ইনি বড় লোক, ইঁহাকে প্রণাম কর।

আর এক প্রকারের বড় লোক আছে। গোপাল ঠাকুর "কন্যাভারগ্রস্ত—কন্যাভারগ্রস্ত" বলিয়া দুই চারি পয়সা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—এও বড় লোক।

কেন না, গোপাল ব্রাহ্মণ জাতি! তুমি শূদ্র—যত বড় লোক হও না কেন, তোমাকে উহার পায়ের ধূলো লইতে হইবে। দুই প্রহর বেলা ঠাকুর রাগ করিয়া না যান—ভাল করিয়া আহার করাও, যাহা চাহেন, দিয়া বিদায় কর। গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড় লোক।

অতএব সংসার বৈষম্যপরিপূর্ণ।—সকল বিষয়ে বৈষম্য জন্মে! রাম এ দেশে না জন্মিয়া, ও দেশে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল; রাম পাঁচির গর্ভে না জন্মিয়া, জাদির গর্ভে জন্মিল, সে একটি বৈষম্যের কারণ হইল। তোমার অপেক্ষা আমি কথায় পটু বা আমার শক্তি অধিক বা আমি বঞ্চনায় দক্ষ,—এ সকলই সামাজিক বৈষম্যের কারণ। সংসার বৈষম্যপূর্ণ।

সংসারে বৈষম্য থাকাই উচিত। প্রকৃতিই অনেক বৈষম্যের নিয়ম করিয়া আমাদিগকে এই সংসার-রঙ্গে পাঠাইয়াছেন। তোমার অপেক্ষা আমার হাড়গুলি মোটা মোটা, বড় কঠিন—তোমার অপেক্ষা আমার বাহুতে অধিক বল আছে—আমি তোমাকে এক ঘুষিতে ভূতলশায়ী করিয়া তোমার অপেক্ষা বড় লোক হইতেছি। কুমুদিনীর অপেক্ষা সৌদামিনী সুন্দরী; সুতরাং সৌদামিনী জমীদারের স্ত্রী, কুমুদিনী পাট কাটে। রামের মস্তিষ্কের অপেক্ষা যদুর মস্তিষ্ক দশ আউন্স ওজনে ভারি, সুতরাং যদু সংসারে মান্য, রাম ঘৃণিত।

অতএব বৈষম্য সাংসারিক নিয়ম। জগতের সকল পদার্থেই বৈষম্য। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রাকৃত বৈষম্য আছে। যেমন প্রাকৃত বৈষম্য আছে—প্রাকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ,—তেমনি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য। ব্রাহ্মণবধে গুরু পাপ,—শূদ্রবধে লঘু পাপ; ইহা প্রাকৃতিক নিয়মানুকৃত নহে। ব্রাহ্মণ অবধ্য—শূদ্র বধ্য কেন? শূদ্রই দাতা, ব্রাহ্মণই কেবল গৃহীতা কেন? তৎপরিবর্ত্তে যাহার দিবার শক্তি আছে, সেই দাতা, যাহার প্রয়োজন, সেই গৃহীতা, এ বিধি হয় নাই কেন?

দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইরূপ আর একটি অপ্রাকৃত বৈষম্য। কিন্তু সে কথা অধিক আন্দোলন করিতে পারি না।

সর্ব্বাপেক্ষা অর্থগত বৈষম্য গুরুতর। তাহার ফলে কোথাও কোথাও দুই একজন লোক টাকার খরচ খুঁজিয়া পায়েন না—কিন্তু লক্ষ লোক অন্নাভাবে উৎকট রোগগ্রস্ত হইতেছে!

সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দ্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।

ভারতবর্ষেই যে বৈষম্যের আধিক্য ঘটিয়াছে, এমত নহে। এই সংসার বৈষম্যময়, সকল দেশই বৈষম্যজালে আচ্ছন্ন। উন্নতিশীল সমাজে, সামাজিকেরা পরস্পরে সংঘৃষ্ট হইয়া সেই বৈষম্যকে অপনীত করিয়াছেন। সেই সকল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রোম ইহার প্রধান উদাহরণ। রোমরাজ্যের প্রথমকালিক বৈষম্য—পেত্রিষীয় ও প্লিবীয়দিগের সম্প্রদায় ভেদ—তাহা এক প্রকার সামাজিক সামঞ্জস্যে লয়

প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রাজ্যের যে পশ্চাৎকালিক বৈষম্য—নাগরিকত্ব এবং অনাগরিকত্ব : তাহাও শাসনকর্ত্তৃপক্ষের অলৌকিক রাজনীতিদক্ষতার গুণে অপনীত হইয়াছিল। সুতরাং রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল।

অন্যত্র এরূপ ঘটে নাই। আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদ জন্য সেদিন ঘোরতর আভ্যন্তরিকসমর হইয়া গেল—অস্ত্রাঘাতে ক্ষতচিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা সামাজিক-ইষ্টসাধন করিতে হইল। এই চিকিৎসার বড ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীর। বৈষম্যের পরিবর্ত্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।

কিন্তু সর্ব্বত্র এই কঠোর চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং সংস্থাপিত হইয়াছে। অস্ত্রবল অপেক্ষা বাক্যবল গুরুতর—সমরাপেক্ষা শিক্ষা অধিকতর ফলোপদায়িনী। খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বাক্যে প্রচারিত হয়—ইস্লামের ধর্ম্ম শস্ত্রসাহায্যে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে মুসলমান অল্পসংখ্যক—বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয়ানই অধিক।

পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর, তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম, "মনুষ্য সকলেই সমান"। এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচাব করিয়া, তাঁহাবা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন কবিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্যজাতি, দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, "তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর"। তখন দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইযাছে।

প্রথম, শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিকধর্ম্মসঞ্জাত বৈষম্যে ভারতবর্ষ পীডিত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষেব উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভাবতবর্ষেব পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য—কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপবাধেও অবধ্য। ব্রাহ্মণে তোমাব সর্ব্বপ্রকাব অনিষ্ট করুক। তুমি ব্রাহ্মণেব কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চবণে লুটাইয়া তাঁহার চবণরেণু শিরোদেশে গ্রহণ কব—কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য। শূদ্রস্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। এ পৃথিবীর কোন সুখে শূদ্র অধিকারী নহে, কেবল নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বদ্ধ, অথচ শাস্ত্র যে কি, তাহা তাহাব স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণ যাহা করাইবেন, তাহা করিলেই পরকালে গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালে গতি, কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই শূদ্রের পরকালে গতি। অথচ শূদ্রও মনুষ্য, ব্রাহ্মণও মনুষ্য। প্রাচীন ইউরোপের, বন্দী এবং প্রভু মধ্যে যে বৈষম্য, তাহাও এমন ভয়ানক নহে। অদ্যাপি ভারতবর্ষবাসীরা কোন গুরুতর বৈষম্যের কথার উদাহরণস্বরূপ বলে, "বামন শূদ্র তফাৎ"।

এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। পশ্বাদিবৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিন্ন পৃথিবীর এমন কোন একটি সুখ তুমি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারিবে না, যাহার মূল জ্ঞানোন্নতি নহে। বর্ণবৈষম্য জ্ঞানোন্নতির পথরোধ হইল। শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে; একমাত্র ব্রাহ্মণ তাহার অধিকারী। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতরবর্ণ। অতএব অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনে কর, যদি ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম থাকিত যে, রসেল, কাবেন্দিষ, স্তান্‌লি প্রভৃতি কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বংশের লোক ভিন্ন আর কেহ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সভ্যতা কোথায় থাকিত? কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ দূরে থাকুক, ওয়াট্, ষ্টিবিন্‌সন, আর্করাইট, কোথায় থাকিত? ভারতবর্ষে প্রায় তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। অনন্যসহায় ব্রাহ্মণেরা যে বিদ্যার আলোচনা একাধিকার করিলেন, তাহাও বর্ণবৈষম্য দোষে কুফলপ্রদা হইয়া উঠিল। সকল বর্ণের প্রভু হইয়া, তাঁহারা বিদ্যাকে প্রভুত্বরক্ষণীরূপে নিযুক্ত করিলেন। বিদ্যার যেরূপ আলোচনায় সেই প্রভুত্ব বজায় থাকে, যাহাতে তাহার আরও বৃদ্ধি হয়, যাহাতে অন্য বর্ণ আরও প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণপদরজ ইহজন্মের সারভূত করে, সেইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আরও যাগযজ্ঞের সৃষ্টি কর, আরও মন্ত্র, দান, দক্ষিণা, প্রায়শ্চিত্ত বাড়াও, আরও দেবতার মহিমাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস কল্পনা করিয়া এই অপ্সরানূপুরনিক্কণনিন্দিত মধুর আর্য্যভাষায় গ্রন্থিত কর, ভারতবাসীদিগের মূর্খতাবন্ধন আরও আঁটিয়া বাঁধ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সে সবে কাজ কি? সেদিকে মন দিও না। অমুক ব্রাহ্মণখানির কলেবর বাড়াও—নূতন উপনিষদ্‌খানি প্রচার কর—ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা, তার টীকা, তার ভাষ্য অনন্তশ্রেণী—বৈদিক ধর্ম্মের গ্রন্থে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন কর। বিদ্যা?—তাহার নাম ভারতবর্ষে লুপ্ত হউক!

লোক বিষণ্ণ, ব্যস্ত, শঙ্কিত হইল। ব্রাহ্মণেরা লেখেন, সকল কাজেই পাপ—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন। তবে কি বিপ্রেতরবর্ণের পাপ হইতে মুক্তি নাই—পারত্রিক সুখ কি এতই দুর্ল্লভ? লোক কোথায় যাইবে? কি করিবে? এ ধর্ম্মশাস্ত্রপীড়া হইতে কে উদ্ধার করিবে? সর্ব্বসুখনিরোধকারী ব্রাহ্মণের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? ভারতবাসীকে কে জীবন দান করিবে?

তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, ভারতাকাশে উদিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে বলিলেন, "আমি উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগের উদ্ধারের বীজমন্ত্র দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগ যজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।"

বৈষম্য-পীড়িত ভারত এ মহামন্ত্র শুনিয়া হিমগিরি হইতে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল—বর্ণবৈষম্য কতক দূর বিলুপ্ত হইল। প্রায়

সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, সেই সহস্র বৎসরই ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট্ হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত যথার্থই একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছেন—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি—এই কালমধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই তক্ষশিলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত বহুজনসমাকীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালিনী সহস্র সহস্র নগরীতে ভারতবর্ষ পরিপূরিত হইয়াছিল। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিমে রোমকে, পূর্ব্বে চীনে গীত হইয়াছিল—তদ্দেশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় সম্রাট্দিগের সহিত রাজনৈতিক সখ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা করিয়া অর্দ্ধেক আশিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার যে এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন বৌদ্ধোদয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত যে, সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট। যে সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন ইউরোপ ও পশ্চিম আশিয়া রোমক রাজ্যভুক্ত। রোমের সৌষ্ঠবদিবসের অপরাহ্ণ উপস্থিত। তখন রোম আর যুদ্ধবিশারদ বীরপ্রসবিনী নহে, অমিত ধনশালী ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরবশ "বাবু"দিগের আবাস। যাঁহাদিগের আমোদ কেবল রণক্ষেত্রেই ছিল, তাঁহারা এক্ষণে কেবল আহারে, দাসীসংসর্গে, এবং রঙ্গভূমের কৃত্রিম যুদ্ধে আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দেশবাৎসল্যগুণে রোম নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। যে সমসামাজিকতার জন্য আমরা রোমের প্রশংসা করিয়াছি, যে সমসামাজিকতার গুণে রোম পৃথিবীশ্বরী হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত হইতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বে রোমনগরীর কথা বলিয়াছি। এক্ষণে রোমক সাম্রাজ্যের কথা বলিতেছি। রোমকসাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত। প্রভুর অকরণীয় সমুদায় কার্য্য সেই সকল দাসের দ্বারা হইত। ভূমিকর্ষণ, গার্হস্থ্য ভৃত্যের কার্য্য, শিল্প-কার্য্যাদি চিরদাসগণের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। তাহারা গোরু বাছুরের ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইত। গোরু বাছুরের উপর প্রভুর যেরূপ অধিকার, দাসের উপরও সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রভু মারিলে মারিতে পারিতেন, কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় হইতেন না। প্রভুর আজ্ঞায় দাস রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইত—প্রভু তামাসা দেখিতেন। রোমক সাম্রাজ্যের লোক দুই ভাগে বিভক্ত—প্রভু এবং দাস। এক ভাগ অনন্তভোগাসক্ত—আর এক ভাগ অনন্ত দুর্দ্দশাপন্ন।

কেবল এই বৈষম্য নহে। সম্রাট্ স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতাপের সীমা ছিল না। নীরো, নগরে অগ্নি লাগাইয়া বীণাবাদনপূর্ব্বক রঙ্গ দেখিয়াছিলেন। কালিগুলা আপন অশ্বকে কনসলের পদে বরণ করিলেন। হেলিয়গেবলসের স্বেচ্ছা-চারিতা বর্ণনা করিতে লজ্জা করে। যে হউন না কেন, যত বড় লোক হউন না কেন,

সম্রাটের ইচ্ছামাত্রে তিনি বধ্য,—বিনা কারণে বিনা প্রয়োজনে, বিনা বিচারে, তিনি বধ্য। আবার সেই সম্রাটের উপর সম্রাট্ প্রেটরীয় সৈনিক। তাহারা আজ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে সম্রাট্ করে—কাল সে সম্রাট্কে বধ করিয়া অন্যকে রাজা করে। রোমক সাম্রাজ্য তাহারা আলু পটলের মত ক্রয় বিক্রয় করে। রোমকে তাহারা যাহা মনে করে, তাহাই করে। সুবায় সুবায় সুবাদারেরা স্বেচ্ছাচারী। যাহার শক্তি আছে, সেই স্বেচ্ছাচারী। যেখানে স্বেচ্ছাচার প্রবল, সেখানে বৈষম্যও প্রবল।

এই সময় খ্রীষ্টধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টের উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—প্রভুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব নহে—ঐহিক সুখ সুখ নহে—ঐহিক প্রাধান্য, প্রাধান্য নহে। পৃথিবীতে দুইবার দুইটি বাক্য উক্ত হইয়াছে,—তাহাই নীতি-শাস্ত্রের সার—তদতিরিক্ত নীতি আর কিছুই নাই। একবার আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে বলিয়াছিলেন, 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"। দ্বিতীয়বার জেরুসালেমের পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া য়ীহুদাবংশীয় যীশু বলিলেন, "অন্যের নিকট তুমি যে ব্যবহারের কামনা কর, অন্যের প্রতি তুমি সেই ব্যবহার করিও"। এই দুইটি বাক্যের ন্যায় মহৎ বাক্য ভূমণ্ডলে আর কখন উক্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই বাক্য সাম্যতত্ত্বের মূল।

এই সকল তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে লাগিল, দাসের বন্ধনশৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাষী ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে লাগিল। তৎপ্রসাদে রোমকে বর্ব্বরে মিলিত হইয়া, মহাতেজস্বী, উন্নতিশীল, যুদ্ধদুর্ম্মদ জাতি সকল সঞ্জাত হইল। তাহারাই আধুনিক ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ; আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ন্যায় লৌকিক উন্নতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই বা হইবে এমত ভরসা পূর্ব্বগামী মনুষ্যেরা কখন করেন নাই। ইহা যে কেবল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ফল, এমত নহে; ইহার অনেক কারণ আছে—কিন্তু প্রধান কারণ খ্রীষ্টীয় নীতি এবং গ্রীক্ সাহিত্য এবং দর্শন। এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মে যে কেবল সুফলই ফলিয়াছে, এমত নহে; ইষ্ট এবং অনিষ্ট উভয়বিধ ফলই ফলিয়াছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সাম্যাত্মক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় রাজ্যে এই বৈষম্য বড় গুরুতর হইয়াছিল। বিশেষ ফ্রান্সে তৎসহিত উচ্চ শ্রেণী এবং অধঃশ্রেণীর মধ্যে ঈদৃশ গুরুতর বৈষম্য জন্মিয়াছিল যে, সেই বৈষম্যের ফলে ফরাসী মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্ত্তা ছিলেন—তিনিই তৃতীয় বারের সাম্যতত্ত্ব প্রচারকর্ত্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রুসো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনার স্থান নাই—প্রয়োজনও নাই। জগদ্বিখ্যাত, বাক্যবিশারদ, পুরাবৃত্তজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী বহুসংখ্যক লেখক তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন; সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য। দুই একটা বলিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন হইবে।

কার্লাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া হইতে আসিয়া দুই জন দাস বধ করিয়া তাহাদিগের রক্তে পদ প্রক্ষালন করিতে পারিতেন, সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না।" ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে পূর্ব্বে ছিল! "পঞ্চাশৎ-বৎসরমধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলি করিয়া তাহারা কি প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে দেখিয়া আনন্দ লাভ করে না।" সেরাজউদ্দৌল্লা দেশের অধিপতি ছিলেন, শারলোয়া উচ্চশ্রেণীর প্রজা মাত্র।

এই ব্যঙ্গোক্তিতেই তাৎকালিক ফরাসীদিগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে। পঞ্চদশ লুই প্রমোদানুরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত ব্যয়শৌণ্ড, স্বার্থপর রাজা ছিলেন। তাঁহার উপপত্নীগণের পরিতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির আবশ্যক। মাদাম পোম্পাদুর ও মাদাম দুবারি যে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিণীতা রাজমহিষীর নিষ্কলঙ্ক কপালেও ঘটে না। মাদাম দুবারির একটি বানরবৎ কাফ্রি খানসামা ছিল; সে এক স্থানে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিল—মাদামের আজ্ঞা! লুইর বিলাসভবনের বর্ণনা শুনিলে ইন্দ্রপ্রস্থের দৈবশক্তিনির্ম্মিতা পাণ্ডবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়—সেই সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের সঙ্গে তাহার তুলনা করিব? জলবৎ অর্থব্যয়,—এদিকে রাজকোষ শূন্য! রাজকোষ শূন্য, এবং প্রজাবর্গমধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। রাজকোষ শূন্য—প্রজামধ্যে অন্নাভাব, হাহাকার রব—তবে এ সভাপর্ব্বের রাজসূয়, এ নন্দনকাননে ঐন্দ্র বিলাস—এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা হইতে? সেই অন্নাভাবপীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া। পিষ্টকে পেষণ করিয়া—শুষ্ককে শোষণ করিয়া, দগ্ধকে দাহন করিয়া দুবারি কুলকলঙ্কিনীর অলকদাম রত্নরাজিতে শোভিত হয়। আর বড় মানুষেরা? তাহারা এক কপর্দ্দক রাজকোষে অর্পণ করে না—কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। রাজপ্রসাদ অজস্র, অনন্ত, অপরিমিত—যে যত পায়, গ্রহণ করে, কেন না, তাহা পিষ্টপেষণলব্ধ। কিন্তু রাজপ্রসাদভোগীরা কপর্দ্দক মাত্র রাজকোষে দেয় না। বড় মানুষে কর দেয় না, ধর্ম্মযাজকেরা কর দেয় না, রাজপুরুষেরা কর দেয় না—কেবল দীন দুঃখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর করসংগ্রাহকদিগের অত্যাচার। মিশালা বলেন, "কর আদায় এক প্রকার প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় ছিল। তাহার দ্বারা দুই লক্ষ নিষ্কর্ম্মা ভূমিকে প্রপীড়িত করিত। এই পঙ্গপালের রাশি, সর্ব্বগ্রাস, সর্ব্বনাশ করিত। এই প্রকারে পরিশোষিত প্রজাদিগের নিকট আরও আদায় করিতে হইলে, সুতরাং নিষ্ঠুর রাজব্যবস্থা, ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি, নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হইল।" রাজকর ইজারা বন্দোবস্ত ছিল; ইজারাদারের এমন অধিকার ছিল যে,

শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে। তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্য্যন্ত করিত। এক দিকে রমোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়, হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা,—আর এক দিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, প্রাণবধ। পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য কদর্য্য, অপবিশুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রূসোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাঁহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণ কৃত করিল।

শাক্যসিংহ এবং যীশুখ্রীষ্ট পবিত্র সত্য কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য মনুষ্যলোকে তাঁহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। রূসো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাঁহা কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে। তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া, ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একে কথাগুলি কালোপযোগিনী, তাহাতে রূসো বাক্‌শক্তিতে যথার্থ ঐন্দ্রজালিক, তাঁহার প্রেরিত সৎকথানুসারিণী ভ্রান্তিও ফরাসীদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাসী তাঁহার মানস শিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসী-বিপ্লব উপস্থিত করিল।

রূসোরও মূল কথা, সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান; সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া, রূসো সভ্যতাকে মনুষ্যজাতির গুরুতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে নৈসর্গিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে—সভ্যতাজনিত ভোগাসক্তি পাপানুরক্তি এবং সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্যের সমভাবে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়, এজন্য সকলেরই সমভাবে শরীরপুষ্টি হয়; নীরোগ শরীরের ফল নীরোগ মন। যখন মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত—অল্পমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাগ্বৈ-দগ্ধ্য জানিত না, যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানিত না, ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাসিব না, এ আপন, ও পর, এ স্ত্রী, ও পরস্ত্রী, এ সকল বুঝিত না—সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ মনে করিয়া, মনুষ্যজাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখ! ইহার সহিত এখনকার দুঃখপূর্ণ, পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা কর!"

যেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, সেই মনুষ্যমাত্রের সমান—নৈসর্গিক প্রকৃতিতে সমান, এবং সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান। এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে প্রাকৃতিক অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। ভূমি সকলেরই—কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে দুর্ব্বলকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল, তখনই সমাজ সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নাম আইন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বাদৌ, কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া বলিয়াছিল, "ইহা আমার",

সেই সমাজকর্ত্তা। যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, "এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমরা উহার কথা শুনিও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন ; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই।" সে মানবজাতির অশেষ উপকার করিত।

রুসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক। বলটের শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল বদমায়েসের দর্শনশাস্ত্র। এই সকল কথার অনুবর্ত্তী হইয়া রুসোর মানস শিষ্য প্রুধোঁ বলিয়াছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পত্তি।

জগদ্বিখ্যাত Le Contrat Social নামক গ্রন্থে রুসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থার তাদৃশ দোষকীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্ত্তে ন্যায়ানুভাবকতা সন্নিবেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে মাত্র—প্রথম, যদি ভূমি পূর্ব্বে অধিকৃত না হইয়া থাকে ; দ্বিতীয়, অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয়, তৃতীয়, যদি নামমাত্র দখল না লইয়া, কর্ষণাদির দ্বারা দখল লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি। Le Contrat Social গ্রন্থের স্থূলোদ্দেশ্য এই যে, সমাজ সমাজভুক্তদিগের সম্মতিসৃষ্ট। যেমন পাঁচ জন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া, একটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সৃষ্ট করেন, রুসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল সেইরূপে লোকের মঙ্গলার্থ লোকের দ্বারা সৃষ্ট। এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে, তুমি আমার জমী চষিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজা প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, "তুমি চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা ; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আজ্ঞাপালন করিব না। তুমি রত্নসিংহাসন হইতে অবতরণ কর।"

অতএব যে দিন Le Contrat Social প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসী রাজার হস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। Le Contrat Social গ্রন্থের চরম ফল ষোড়শ লুইর সিংহাসনচ্যুতি, এবং প্রাণদণ্ড। ফরাসীবিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই যজ্ঞে বেদমন্ত্র, এই গ্রন্থোক্ত বাণী।

সেই ফরাসীবিপ্লবে, রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল ; সম্ভ্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল ; পুরাতন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজকসম্প্রদায় গেল ; মাস, বার প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল—অনন্তপ্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল—মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল

সিদ্ধ হইল। রূসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিতা হইল। কেন না, সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক—সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত।

ফরাসীবিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু "ভূমি সাধারণের" এই কথা বলিয়া রূসো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। "কম্যুনিজম্" সেই বৃক্ষের ফল। "ইণ্টারন্যাশনল" সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের। আমার বাড়ী, তোমার ভূমি, তাহার বৃক্ষ। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত নহে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হইয়া, সর্ব্বলোকসাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। এই সর্ব্বলোকপালিকা বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই বা দশ পনের জন ভূম্যধিকারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী বাক্‌শক্তির বলে, এই কথা রূসো পৃথিবীর মধ্যে আদৃতা করাইয়াছিলেন। ক্রমে বিজ্ঞ, বিবেচক পণ্ডিতেরা সেই ভিত্তির উপর সম্পত্তিমাত্রেরই সাধারণতা স্থাপন করিবার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ব্বলোকে সমভাগে বণ্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড় লোক ছোট লোক কোন প্রভেদ রহিল না; সকলেই সমান ভাবে পরিশ্রম করিবে। সকলেই সমান ভাগের ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজম্। ইহার প্রচারকর্ত্তা ওয়েন, লুই ব্লাং, এবং কাবে। কিন্তু সাধারণ কম্যুনিষ্ট, বহুশ্রমী এবং অল্পশ্রমী, কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ, সকলেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন, লুই ব্লাং সে মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্ত্তব্য। যে মত সেণ্টসাইমনিজম্ বলিয়া বিখ্যাত, তাহার অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাবে ধনভোগী হইবে বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম করিবে বা সকলেই সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে কার্য্যের উপযুক্ত, সে তেমনি পরিশ্রম করিবে ও সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব, এবং কর্ম্মকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য, যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে তাহা নিরূপণ এবং সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধারণ জন্য কতকগুলিন কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক সামগ্রী সকল সাধারণের। ইত্যাদি।

ফুরীরিজম্ আর এক প্রকার সাধারণ সম্পত্তির পক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমন মত নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। সম্পত্তির বৈশেষিকতা, এবং উত্তরাধিকারিতাও ইহাদের অনুমত। ইঁহারা বলেন যে, দুই সহস্র বা তদ্রূপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিভরিত হইবে। যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট

থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কর্ম্মনিপুণদিগের মধ্যে কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবান্, সে তদুপযুক্ত পাইবে। ইত্যাদি।

ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক, কেন না, তাহাও সাম্যতত্ত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্জ্জনকর্ত্তা, উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তাঁহার যে সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল্ স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অপর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছ, তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি একা ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে দশ সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে পারে, কিন্তু রাম উপার্জ্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহস্র নয় শত নিরানব্বই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা ভোগের অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে স্বত্ববান্ করিবারও তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সে যদি কাহাকেও দিয়া না গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পুত্রও কেন একা অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জ্জন কর্ত্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে অধিকারী বলিয়া যায় নাই যে, আমার পুত্র সকল ভোগ করিবে, সেখানে পুত্র অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমান ভাবে অধিকারী।

তবে পিতা পুত্রকে এই দুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এজন্য যাহাতে সে কষ্ট না পায়, সুশিক্ষিত হইয়া, অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। পিতৃসম্পত্তির যে অংশ রাখিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, পুত্রের তাহা বিনা দানেও প্রাপ্য। কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে। মিল্ বলেন, জারজ পুত্রের অপেক্ষা অন্য পুত্রের কিছুমাত্র অধিকার নাই,—উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী। কিন্তু এরূপ যাহা কিছু অধিকার, তাহা সন্তানের। পুত্রের অবর্ত্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতি মৃতের সর্ব্বসম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। যাহার সন্তান নাই, তাহার সমুদয় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক উত্তরাধিকারিত্বসম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। বিলাতী ব্যবস্থার অপেক্ষা, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু ভাল; হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা সরা আরও ভাল। কিন্তু সকলই অন্যায়পূর্ণ। এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য, এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে।

সাম্যতত্ত্বের শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্মার প্রচারিত। স্ত্রী পুরুষে সমান। এক্ষণে সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকার্য্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে একা পুরুষেই অধিকারী—স্ত্রীলোক অনধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল্ বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী। তাহারা যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক

ভ্রান্তি মাত্র। মিলের এ মত ইউরোপে গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে। আমাদিগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

সাম্যতত্ত্বসম্বন্ধে সার কথা পুনর্ব্বার উক্ত করিতে হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে, কেহ দুর্ব্বল, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে; যে বুদ্ধিমান্ এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা, যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্ব্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুসোও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে. সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে, মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল্ এক স্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্ব্বতন কুব্যবহারসংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড় লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোট লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে, অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছে সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা যদি পরাণ মণ্ডলের কথা পাড়িলাম, তবে তাহার দুঃখের পরিচয় কিঞ্চিৎ সবিস্তারে না দিয়া থাকিতে পারি না। জমীদারের ঐশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সম্বাদপত্র লিখিয়া বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সাম্যতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। যে বসুন্ধরা কাহারও নহে, তাহা ভূম্যধিকারিবর্গ বন্টন করিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহা কিছু বলিতে হইল।

যতক্ষণ জমীদার বাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিল সার্সি প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্রসহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মাবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া

যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুণ লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয়, ভূমে, গোহালের একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত, চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস!

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল—কাহার বাকি রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া, গোলায় তুলিয়া, সময়মত হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সম্বৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্র মাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা, চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকি আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে"। পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল—দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিল দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না। হয় ত তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমিদারী নিরিক টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸০ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২৲ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা ১৲ টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নাএব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক, সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পড়তা গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইবে।

এ সকল দৌরাত্ম্য জমীদারের অভিপ্রায়ানুসারে হয় না, তাহা স্বীকার করি। তিনি ইহার মধ্যে ন্যায্য খাজানা এবং সুদ ভিন্ন আর কিছুই পাইলেন না, অবশিষ্ট সকল নায়েব গোমস্তার উদরে গেল। সে কাহার দোষ? জমীদার যে বেতনে দ্বারবান্ রাখেন, নায়েবেরও সেই বেতন; গোমস্তার বেতন খানসামার বেতন অপেক্ষা কিছু কম। সুতরাং এ সব না করিলে তাহাদের দিনপাত হয় কি প্রকারে? এ সকল জমীদারের আজ্ঞানুসারে হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার কার্পণ্যের ফল। প্রজার নিকট

হইতে তাঁহার লোকে আপন উদরপূর্ত্তির জন্য অপহরণ করিতেছে, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি ? তাঁহার কথা কহিবার কি প্রয়োজন আছে ?

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। তাহার পর নায়েব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা। তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা—তাঁহারাও পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে। কিন্তু ইহাতে পরাণ ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরেই ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন ছার! হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং 'প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পবিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসব জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম্য আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়, নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমূল, কখন ভরসা "রিলিফ", কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসাস্থল নহে। মনে কর, সে বার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের আর কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, "পরাণ মণ্ডল আপনাকে শ্যালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিন জন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা

পরাণকে মাটি ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল—শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচগুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপব পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে, তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ একদিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, কাছারিতে রহিল। হয় ত, পরাণের মা কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজেহার করিল। সব্ ইন্‌স্পেক্‌টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কনষ্টেবল পাঠাইলেন। কনেষ্টবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদাকাটা আরম্ভ করিল। কনষ্টেবল সাহেব একটু ধূমপান করিতে লাগিলেন—কিন্তু "কয়েদ খালাসের" কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিন বার পার্ব্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরমপবিত্রমূর্ত্তি রৌপ্যচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, "কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক—সে পুকুর ধারে তালতলায় লুকাইয়া ছিল—আমি ডাক দিবামাত্র সেখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না"—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে" —অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সংবাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ব্ভবতী হইয়াছে—অমনি পরাণকে ধরিতে লোক ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্য সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক বা পুনর্ব্বার পুলিশ আসার আশঙ্কায় হউক বা বহুকাল আবদ্ধ রাখার কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ-আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা। মহলে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর ।০ আনা দিবে। তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে। দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ মণ্ডলের আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পূরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বার্ত্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটিতে ঘর পুরিয়া যাইতে লাগিল। দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের ত কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে "আগমনী" "নজর", বা "সেলামী" দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ৶০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাচারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া, উপযুক্ত আদালতে "ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, "পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়ত করিয়াছে। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।" গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলের যত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম "ক্রোক সহায়তা"।

পরাণ দেখিল সর্ব্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পারশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এত দিন পরাণ সহিয়াছিল—কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না। পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্ট্যাম্পের মূল্য চাই, উকীলের ফিস্ চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয়ত আমীন খরচা লাগিবে। এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব। তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহার অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পালটা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা—সুতরাং জমীদারের বশীভূত; স্নেহে নয়—ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাঁহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্‌মিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল,

দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমি বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল; নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই একজন প্রজার প্রতি এক বৎসর মধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি—একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচার-পরায়ণ জমীদারের যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি একজনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অনুরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কত রকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক রকম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে, অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পারেন, আদায় করেন।

এক্ষণে জমীদারদিগের পক্ষে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। দিন দিন অত্যাচারপরায়ণ জমীদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতাস্থ সুশিক্ষিত ভূস্বামী-দিগের কোন অত্যাচার নাই—যাহা আছে তাহা তাঁহাদিগের অজ্ঞাতে এবং অভিমত-বিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তাগণের দ্বারায় হয়। মফঃস্বলেও অনেক সুশিক্ষিত জমীদার আছেন, তাঁহাদিগেরও প্রায় ঐরূপ। বড় বড় জমীদারদিগের অত্যাচার তত অধিক নহে;—অনেক বড় বড় ঘরে অত্যাচার একেবারে নাই। সামান্য সামান্য ঘরেই অত্যাচার অধিক। যাঁহার জমীদারী হইতে লক্ষ টাকা আইসে—অধর্ম্মাচরণ করিয়া প্রজাদিগের নিকট আর পঁচিশ হাজার টাকা লইবার জন্য তাঁহার মনে প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু যাঁহার জমীদারী হইতে বার মাসে বার শত আসে না, অথচ জমীদারী চাল চলনে চলিতে হইবে, তাঁহার মারপিট করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা সুতরাং বলবতী হইবে। আবার যাঁহারা নিজে জমীদার, আপন প্রজার নিকট খাজানা আদায় করেন, তাহাদের অপেক্ষা পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ইজারাদারের দৌরাত্ম্য অধিক। আমরা সংক্ষেপানুরোধে উপরে কেবল জমীদার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জমীদার অর্থে করগ্রাহী বুঝিতে হইবে। ইহারা জমীদারকে জমীদারের লাভ দিয়া তাহার উপর লাভ করিবার জন্য ইজারা পত্তনি গ্রহণ করেন, সুতরাং প্রজার নিকট হইতেই তাঁহাদিগকে লাভ পোষাইয়া লইতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী তালুকের সৃজন প্রজার পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা যে সকল অত্যাচার বিবৃত করিয়াছি, তাহার অনেকেই জমীদারের অজ্ঞাতে, কখন বা অভিমতবিরুদ্ধে, নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে। প্রজার উপর যে কোনরূপ পীড়ন হয়, অনেকেই তাহা জানেন না।

তৃতীয়তঃ, অনেক জমীদারীর প্রজাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। সকলের উপর নালিশ করিয়া খাজানা আদায় করিতে গেলে জমীদারের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হইলে, তাহারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

যাঁহারা জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাঁহাদিগের বিরোধী। জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যে এক্ষণে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে, আপামর সাধারণ সকলেই যে আপন আপন গ্রামে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতেছে, ইহা জমীদারদিগের গুণে। জমীদারেরা অনেক স্থানে চিকিৎসালয়, রথ্যা, অতিথিশালা ইত্যাদি সৃজন করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন। আমাদিগের দেশে লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল জমীদারের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশ্যন—জমিদারদের সমাজ। অতএব জমীদারদিগের কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতার কাজ। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজাপীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগের হাত; যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ। ইহা তাঁহাদিগের অসাধ্য নহে। সকল দণ্ড অপেক্ষা আপন সম্প্রদায়ের বিরাগ, আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অপমান সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এবং কার্য্যকরী। যত কুলোক চুরি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চৌর্য্যে বিরত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিবাসীদিগের মধ্যে চোর বলিয়া ঘৃণিত হইবার ভয়ে চুরি করে না। এই দণ্ড যত কার্য্যকরী, আইনের দণ্ড তত নহে। জমীদারের পক্ষে এই দণ্ড জমীদারেরই হাত, অপর জমীদারের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত ও সমাজচ্যুত হইবার ভয় থাকিলে অনেক দুর্ব্বৃত্ত জমীদার দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগ করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ দেশীয় কৃষকদিগের এ দুর্দ্দশা কিসে হইল? এ ঘোরতর সামাজিক বৈষম্য কোথা হইতে জন্মিল? সাম্য নীতি বুঝাইবার জন্য আমরা তাহা সবিস্তারে বলিতেছি।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গদেশের কৃষকের দুর্দ্দশা আজি কালি হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতর লোকের অনুন্নতি ধারাবাহিক; যতদিন হইতে ভারতবর্ষে সভ্যতার সৃষ্টি, প্রায় ততদিন হইতে ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগের দুর্দ্দশার সূত্রপাত। পাশ্চাত্ত্যেরা কথায় বলেন একদিনে রোমনগরী নির্ম্মিতা হয় নাই। এদেশের কৃষকদিগের দুর্দ্দশাও দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বক্‌ল সাহেবের স্থূল কথা। বক্‌ল্ বলেন যে, জ্ঞানিক উন্নতি ভিন্ন নৈতিক উন্নতি নাই। সে কথায় আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু জ্ঞানিক উন্নতি যে সভ্যতার কারণ এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি না হইলে সভ্যতার উন্নতি হইবে না। জ্ঞান আপনি জন্মে না; অতিশয় শ্রমলভ্য। কেহ যদি বিদ্যালোচনায় রত না হয় তবে সমাজমধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না। কিন্তু বিদ্যালোচনার পক্ষে অবকাশ আবশ্যক। বিদ্যালোচনার পূর্ব্বে উদরপোষণ চাই; অনাহারে কেহ জ্ঞানালোচনা করিবে না। যদি সকলকেই আহারান্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে কাহারও জ্ঞানালোচনার অবকাশ হয় না। অতএব সভ্যতার সৃষ্টির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে। অন্যে পরিশ্রম করিবে, তাঁহারা বসিয়া বিদ্যালোচনা করিবেন। যদি শ্রমোপজীবীরা সকলেই কেবল আত্ম-ভরণপোষণের যোগ্য খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে না, কেন না, যাহা জন্মিবে, তাহা শ্রমোপজীবীদের সেবায় যাইবে, আর কাহারও জন্য থাকিবে না। কিন্তু যদি তাহারা আত্মভরণপোষণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষা অধিক উৎপাদন করে, তবে তাহাদিগের ভরণপোষণ বাদে কিছু সঞ্চিত হইবে। তদ্দ্বারা শ্রমবিরত ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যানুশীলন করিতে পারেন। তখন জ্ঞানের উদয় সম্ভব। উৎপাদকের খাইয়া পরিয়া যাহা রহিল, তাহাকে সঞ্চয় বলা যাইতে পারে। অতএব সভ্যতার উদয়ের পূর্ব্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়ন।

কোন দেশে সামাজিক ধনসঞ্চয় হয়, কোন দেশে হয় না। যেখানে হয়, সে দেশ সভ্য হয়। যে দেশে হয় না, সে দেশ অসভ্য থাকে। কি কি কারণে দেশবিদেশে আদিম ধনসঞ্চয় হইয়া থাকে? দুইটি কারণ সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা। যে দেশের ভূমি উর্ব্বরা, সে দেশে সহজে অধিক শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং শ্রমোপজীবীদিগের ভরণপোষণের পর আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় কারণ, দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। শীতোষ্ণতার ফল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, যে দেশ উষ্ণ, সে দেশের লোকের অল্পাহার আবশ্যক, শীতল দেশে অধিক আহার আবশ্যক। এই কথা কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের উপর নির্ভর করে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিবার স্থান নাই; আমরা এতদংশ বক্‌লের গ্রন্থের অনুবর্ত্তী হইয়া লিখিতেছি; কৌতূহলবিশিষ্ট পাঠক সেই গ্রন্থ দেখিবেন। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ অল্প খাদ্যের প্রয়োজন, সে দেশে শীঘ্র যে সামাজিক ধনসঞ্চয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণতার দ্বিতীয় ফল, বক্‌ল্ এই বলেন যে, তাপাধিক্য হেতু লোকের শারীরিক তাপজনক খাদ্যের তত আবশ্যক হয় না। যে দেশ শীতল, সে দেশে শারীরিক তাপজনক খাদ্যের অধিক আবশ্যক। শারীরিক তাপ শ্বাসগত বায়ুর অম্লজানের সঙ্গে শরীরস্থ দ্রব্যের কার্ব্বনের রাসায়নিক সংযোগের ফল। অতএব যে খাদ্যে কার্ব্বন অধিক আছে, তাহাই তাপজনক ভোজ্য। মাংসাদিতেই অধিক কার্ব্বন। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকের মাংসাদির বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণদেশে মাংসাদি অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক—বনজের অধিক আবশ্যক।

বনজ সহজে প্রাপ্য—কিন্তু পশুহনন কষ্টসাধ্য, এবং ভোজ্য পশু দুর্লভ। অতএব উষ্ণদেশের খাদ্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। খাদ্য সুলভ বলিয়া শীঘ্র ধনসঞ্চয় হয়।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ, এবং তথায় ভূমিও উর্ব্বরা। সুতরাং ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় হওয়াই সম্ভব। এই জন্য ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকালেই সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধনাধিক্য হেতু, একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া, জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জিত ও প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমরা ব্রাহ্মণদিগের কথা বলিতেছি।

কিন্তু এইরূপ প্রথমকালিক সভ্যতাই ভারতীয় প্রজার দুরদৃষ্টের মূল। যে যে নিয়মের বশে অকালে সভ্যতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই নিয়মের বশেই তাহার অধিক উন্নতি কোন কালেই হইতে পারিল না।—সেই সেই নিয়মের বশেই সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রভাতেই মেঘাচ্ছন্ন। বালতরু ফলবান্ হওয়া ভাল নহে।

যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ শ্রম করে; এক ভাগ শ্রম করে না। এই দ্বিতীয় ভাগের শ্রম করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাহারা করে না; প্রথম ভাগের উৎপাদিত অতিরিক্ত খাদ্যে তাহাদের ভরণপোষণ হয়। যাহারা শ্রম করে না, তাহাদেরই কেবল সাবকাশ; সুতরাং চিন্তা, শিক্ষা, ইত্যাদিতে তাহাদিগেরই একাধিকার। যে চিন্তা করে, শিক্ষা পায়, অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, সে অন্যাপেক্ষা যোগ্য, এবং ক্ষমতাশালী হয়। সুতরাং সমাজমধ্যে ইহাদিগেরই প্রধানত্ব হয়। যাহারা শ্রমোপজীবী, তাহারা ইহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রম করে। অতএব প্রথমেই বৈষম্য উপস্থিত হইল। কিন্তু এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে।

বুদ্ধ্যুপজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমোপজীবীরা উপকৃত হয়, পুরস্কারস্বরূপ উহারা শ্রমোপজীবীর অর্জ্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করে; শ্রমোপজীবীর ভরণপোষণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যাহা জন্মে, তাহা উহাদেরই হাতে জমে। অতএব সমাজের যে অতিরিক্ত ধন, তাহা ইহাদেরই হাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। তবে, দেশের উৎপন্ন ধন দুই ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ শ্রমোপজীবীর, এক ভাগ বুদ্ধ্যুপজীবীর। প্রথম ভাগ, "মজুরির বেতন," দ্বিতীয় ভাগ ব্যবসায়ের "মুনাফা"।* আমরা "বেতন" ও "মুনাফা," এই দুইটি নাম ব্যবহার করিতে থাকিব। "মুনাফা" বুদ্ধ্যুপজীবীদের ঘরেই থাকিবে। শ্রমোপজীবীরা "বেতন" ভিন্ন মুনাফার কোন অংশ পায় না। শ্রমোপজীবীরা সংখ্যায় যতই হউক না কেন, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইবে, "মুনাফার" মধ্য হইতে এক পয়সাও তাহারা পাইবে না।

মনে কর, দেশের উৎপন্ন কোটি মুদ্রা, তন্মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ "বেতন", পঞ্চাশ লক্ষ "মুনাফা"। মনে কর, দেশে পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবী। তাহা হইলে এই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা "বেতন", পঁচিশ লক্ষ লোকের মধ্যে ভাগ হইবে, প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর

* "ভূমির কর" এবং "সুদ" ইহার অন্তর্গত এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে। সংক্ষেপাভিপ্রায়ে আমরা কর বা সুদের উল্লেখ করিলাম।

ভাগে দুই মুদ্রা পড়িবে। মনে কর, হঠাৎ ঐ পঁচিশ লক্ষ শ্রমোপজীবীর উপর আর পঁচিশ লক্ষ লোক কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। তখন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমোপজীবী হইল। সেই পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রাই ঐ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে বিভক্ত হইবে। যাহা "মুনাফা", তাহার এক পয়সাও উহাদের প্রাপ্য নহে, সুতরাং ঐ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রার বেশী এক পয়সাও তাহাদের মধ্যে বিভাজ্য নহে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক শ্রমোপজীবীর ভাগ দুই মুদ্রার পরিবর্ত্তে এক মুদ্রা হইবে। কিন্তু দুই মুদ্রাই ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যক বলিয়াই, তাহা পাইত। অতএব এক্ষণে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টে বিশেষ দুর্দ্দশা হইবে।

যদি ঐ লোকাগমের সঙ্গে সঙ্গে আর কোটি মুদ্রা দেশের ধনবৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে এ কষ্ট হইত না। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা বেতন ভাগের স্থানে কোটি মুদ্রা বেতন ভাগ হইত। তখন লোক বেশী আসাতেও সকলের দুই টাকা করিয়া কুলাইত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শ্রমোপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ। যে পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যদি সেই পরিমাণে দেশের ধনবৃদ্ধি পায়, তবে শ্রমোপজীবীদের কোন অনিষ্ট নাই। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অপেক্ষাও ধনবৃদ্ধি গুরুতর হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের শ্রীবৃদ্ধি—যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকায়। আর যদি এই দুইয়ের একও না ঘটিয়া, ধনবৃদ্ধির অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হয়, তবে শ্রমোপজীবীদের দুর্দ্দশা। ভারতবর্ষে প্রথমোত্তমেই তাহাই ঘটিল।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে অনেক সন্তান জন্মে। তাহার আর একটি সন্তানের আবার অনেক সন্তান জন্মে। অতএব মনুষ্যের দুর্দ্দশা এক প্রকার স্বভাবের নিয়মাদিষ্ট। সকল সমাজেই এই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার সদুপায় আছে। প্রকৃত সদুপায় সঙ্গে সঙ্গে ধনবৃদ্ধি। পরন্তু যে পরিমাণে প্রজাবৃদ্ধি, সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। ঘটিবার অনেক বিঘ্ন আছে। অতএব উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। উপায়ান্তর দুইটি মাত্র। এক উপায় দেশীয় লোকের কিয়দংশের দেশান্তরে গমন। কোন দেশে লোকের অন্নে কুলায় না, অন্য দেশে অন্ন খাইবার লোক নাই। প্রথমোক্ত কতক দেশের লোক শেষোক্ত দেশে যাউক, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দেশের লোকসংখ্যা কমিবে। এবং শেষোক্ত দেশেরও কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। এইরূপে ইংলণ্ডের মহদুপকার হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাগে বাস করিয়াছে। তাহাতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, উপনিবেশ সকলেরও মঙ্গল হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায় বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। এইটি প্রধান উপায়। যদি সকলেই বিবাহ করে তবে প্রজাবৃদ্ধির সীমা থাকে না। কিন্তু যদি কতক লোক অবিবাহিত থাকে, তবে প্রজাবৃদ্ধির লাঘব হয়। যে দেশে জীবনের স্বচ্ছন্দতা লোকের অভ্যস্ত, যেখানে জীবিকানির্ব্বাহের সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে আবশ্যক, এবং কষ্টে আহরণীয়, সেখানকার লোকে বিবাহপ্রবৃত্তি দমন করে। পরিবার প্রতিপালনের উপায় না দেখিলে বিবাহ করে না।

ভারতবর্ষে এই দুইটির একটি উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে না। উষ্ণতা শরীরের

শৈথিল্যজনক, পরিশ্রমে অপ্রবৃত্তিদায়ক। দেশান্তরে গমন, উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পরিশ্রমের কাজ। বিশেষতঃ প্রকৃতিও তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত এবং বাত্যাসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যস্থ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যবদ্বীপ এবং বালি উপদ্বীপ ভিন্ন আর কোন হিন্দু উপনিবেশের কথা শুনা যায় না। ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ প্রাচীন দেশের এইরূপ সামান্য ঔপনিবেশিক ক্রিয়া গণনীয় নহে।

বিবাহপ্রবৃত্তির দমনবিষয়ে ভারতবর্ষের আরও মন্দাবস্থা। মাটি আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিলেই শরীরের উপকার হউক না হউক, ক্ষুধানিবৃত্তি এবং জীবনধারণ হয়। বায়ুর উষ্ণতাপ্রযুক্ত পরিচ্ছদের বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অপকৃষ্ট জীবিকা অতি সুলভ। এমত অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতা-ভয়ে কেহ ভীত নহে। সুতরাং বিবাহপ্রবৃত্তি দমনে পরাঙ্মুখ হইল। প্রজাবৃদ্ধির নিবারণের কোন উপায়ই অবলম্বিত না হওয়াতে তাহার বেগ অপ্রতিহত হইল। কাজে কাজেই সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের পরেই ভারতীয় শ্রমোপজীবীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। যে ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতাহেতুক সভ্যতার উদয়, তাহাতেই জনসাধারণের দুরবস্থার কারণ সৃষ্টি হইল। উভয়ই অলঙ্ঘ্য নৈসর্গিক নিয়মের ফল।

শ্রমোপজীবীর এই কারণে দুর্দ্দশার আরম্ভ। কিন্তু একবার অবনতি আরম্ভ হইলেই, সেই অবনতির ফলে আরও অবনতি ঘটে। শ্রমোপজীবীদিগের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিকতর হইতে লাগিল। প্রথম ধনের তারতম্য—তৎফলে অধিকারের তারতম্য। শ্রমোপজীবীরা হীন হইল বলিয়া তাহাদের উপর বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল। অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল। এই বৈষম্যই অস্বাভাবিক। ইহাই অমঙ্গলের কারণ।

আমরা যে সকল কথা বলিলাম, তাহার তিনটি গুরুতর তাৎপর্য্য দেখা যায়:

১। শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম, তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দারিদ্র্য। ইহা বৈষম্যবর্দ্ধক।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পরিশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন না, যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা। ইহাও বৈষম্যবর্দ্ধক।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব। ইহা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা।

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২। ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।

দেখান গিয়াছে যে, ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ। যদি বলি যে, ধনলিপ্সা সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ, তাহা হইলে অত্যুক্তি হইবে না। সামাজিক উন্নতির

মূলীভূত, মনুষ্যহৃদয়ে দুইটি বৃত্তি ; প্রথম জ্ঞানলিপ্সা, দ্বিতীয় ধনলিপ্সা। প্রথমোক্তটি মহৎ এবং আদরণীয়, দ্বিতীয়টি স্বার্থসাধক এবং নীচ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু "History Rationalism in Europe" নামক গ্রন্থে লেকি সাহেব বলেন যে, দুইটি বৃত্তির মধ্যে ধনলিপ্সাই মনুষ্যজাতির অধিকতর মঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ জ্ঞানলিপ্সা কদাচিৎক, ধনলিপ্সা সর্ব্বসাধারণ, এজন্য অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়ক। দেশের উৎপন্ন ধনে জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের কুলান হইতেছে বলিয়া সামাজিক ধনলিপ্সা কমে না। সর্ব্বদা নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পূর্ব্বে যাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইত, পরে তাহা আবশ্যকীয় বোধ হয়। তাহা পাইলে আবার অন্য সামগ্রী আবশ্যক বোধ হয়। আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টা, চেষ্টায় সফলতা জন্মে। সুতরাং সুখ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সুখ স্বচ্ছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখলালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলা হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে "সন্তোষ" কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকারক ; কবিগীতা এই প্রবৃত্তি সামাজিক জীবনের হলাহল।

লোকের অনিষ্টপূর্ণ সন্তুষ্টভাব, ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে সহজেই ঘটিল। এ দেশে, তাপের কারণ অধিক কাল ধরিয়া এককালীন পরিশ্রম অসহ্য। তৎকারণে পরিশ্রমে অনিচ্ছা অভ্যাসগত হয়। সেই অভ্যাসের আরও কারণ আছে। উষ্ণদেশে শরীরমধ্যে অধিক তাপের সমুদ্ভবের আবশ্যক হয় না বলিয়া তথাকার লোকে যে মৃগয়াদিতে তাদৃশ রত হয় না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। বন্য পশু হনন করিয়া খাইতে হইলে পরিশ্রম, সাহস, বল এবং কার্য্যতৎপরতা অভ্যস্ত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার একটি মূল, পূর্ব্বকালীন তাদৃক্ অভ্যাস। অতএব একে শ্রমের অনাবশ্যকতা, তাহাতে শ্রমে অনিচ্ছা, ইহার পরিণাম আলস্য এবং অনুৎসাহ। অভ্যাসগত আলস্য এবং অনুৎসাহেরই নামান্তর সন্তোষ। অতএব ভারতীয় প্রজার একবার দুর্দ্দশা হইলে, সেই দশাতেই তাহারা সন্তুষ্ট রহিল। উদ্যমাভাবে আর উন্নতি হইল না। সুপ্ত সিংহের মুখে আহার্য্য পশু স্বতঃপ্রবেশ করে না।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মে উভয় কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়। ইউরোপেও ধর্ম্মযাজকগণকর্ত্তৃক ঐহিক সুখে অনাদরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। ইউরোপে যে রোমীয় সভ্যতা লোপের পর সহস্র বৎসর মনুষ্যের ঐহিক অবস্থা অনুন্নত ছিল, এইরূপ শিক্ষাই তাহার কারণ। কিন্তু যখন ইতালিতে প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্য, গ্রীক্ দর্শনের পুনরুদয় হইল, তখন তৎপ্রদত্ত শিক্ষানিবন্ধন ঐহিকে বিরক্তি ইউরোপে ক্রমে মন্দীভূত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও

বৃদ্ধি হইল। ইউরোপে এ প্রবৃত্তি বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ইহা মনুষ্যের দ্বিতীয় স্বভাব স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যে ভূমি যে বৃক্ষের উপযুক্ত, সেইখানেই তাহা বদ্ধমূল হয়। এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তৃক যে নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল, দেশের অবস্থাই তাহার মূল; আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রদত্ত শিক্ষায় প্রাকৃতিক অবস্থা জন্য নিবৃত্তি আরও দৃঢ়ীভূতা হইল।

এতন্নিবন্ধ ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিল। সুপোষিত ইউরোপীয় প্রজাগণ, ঐহিক সুখে রত হইয়া সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে চেষ্টিত হইল। ইহার ফল সুখ, সমৃদ্ধি, সভ্যতাবৃদ্ধি। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ নিদ্রিত রহিল; সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিক হইয়া চলিল। ইহার ফল অবনতি।

৩। শ্রমোপজীবীদিগের দুরবস্থা যে চিরস্থায়ী হয়, কেবল তাহাই নহে। তন্নিবন্ধ সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌরবের ধ্বংস হয়। যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে এক বিন্দু অম্ল পড়িলে. সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দ্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দ্দশা জন্মে।

(ক) উপজীবিকানুসারে প্রাচীন আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইযাছিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বৈষম্যের উপর বৈষম্য। শুধু অধস্তন শ্রেণী; তাহাদিগেরই দুর্দ্দশার কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম। বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। বাণিজ্য, শ্রমোপজীবীর শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে দেশের আবশ্যকীয় সামগ্রীর অতিরিক্ত উৎপন্ন না হয়, সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি। লোকের অভাববৃদ্ধি, বাণিজ্যের মূল। যদি আমাদিগের অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণেচ্ছা না থাকে, তবে কেহ অন্য দেশোৎপন্ন সামগ্রী আমাদের কাছে আনিয়া বিক্রয় করিবে না। অতএব যে দেশের লোক অভাবশূন্য, নিজ শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীতে সন্তুষ্ট, সে দেশে বণিক্‌দিগের শ্রীহানি অবশ্য হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তবে কি ভারতবর্ষে বাণিজ্য ছিল না? ছিল বৈ কি। ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের তুল্য বিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমিবিশিষ্ট বহুধনের আকরস্বরূপ দেশে যেরূপ বাণিজ্যবাহুল্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল,—অতি প্রাচীন কালেই যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। বাণিজ্যহানির অন্যান্য কারণও ছিল, যথা—ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিবন্ধকতা, সমাজের অভ্যস্ত অনুৎসাহ ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(খ) ক্ষত্রিয়েরা রাজা বা রাজপুরুষ। যদি পৃথিবীর পুরাবৃত্তে কোন কথা নিশ্চিত প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তবে সে কথাটি এই যে, সাধারণ প্রজা সতেজ এবং রাজনিয়ন্তা না হইলে, রাজপুরুষদিগের স্বভাবের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। যদি কেহ কিছু না বলে, রাজপুরুষেরা সহজেই স্বেচ্ছাচারী হয়েন। স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল, এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়। অতএব যে দেশের প্রজা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অলস, সেইখানেই রাজপুরুষদিগের ঐরূপ স্বভাবগত অবনতি হইবে। যেখানে প্রজা দুঃখী, অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, আহারোপার্জ্জনে ব্যস্ত, এবং সন্তুষ্টস্বভাব, সেইখানেই তাহারা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী, অবিরোধী। ভারতবর্ষে বৈষম্যপীড়িত

হীন বর্ণেরা তাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের রাজগণ, মহাভারতকীর্ত্তিত বলশালী, ধর্ম্মিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়জয়ী রাজচরিত্র হইতে মধ্যকালের কাব্যনাটকাদিচিত্রিত বলহীন, ইন্দ্রিয়পরবশ, স্ত্রৈণ, অকর্ম্মঠ দশাপ্রাপ্ত হইয়া শেষে মুসলমান-হস্তে লুপ্ত হইলেন। যে দেশে সাধারণ প্রজার অবস্থা ভাল, সে দেশে রাজপুরুষদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটে না। তাহারা রাজার দুর্ম্মতি দেখিলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইতে পারে, এবং হইয়া থাকে। পরস্পরের উপরোধেই উভয় পক্ষের উন্নতি। রাজপুরুষগণ অনর্থক অসন্তোষের ভয়ে সতর্ক থাকেন। কিন্তু ইহাতে কেবল যে এই উপকার, ইহা নহে। রাজকার্য্যের অপক্ষপাতী সমালোচনায় মানসিক গুণসকলের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হয়। তদভাবে তৎসমুদায়ের লোপ। শূদ্রের দাসত্বে ক্ষত্রিয়ের ধন এবং ধর্ম্মের লোপ হইয়াছিল। রোমে, প্লিবিয়ানদিগের বিবাদে, ইংলণ্ডের কমনদিগের বিবাদে প্রভুদিগের স্বাভাবিক উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল।

(গ) ব্রাহ্মণ। যেমন, অধঃশ্রেণীর প্রজার অবনতিতে ক্ষত্রিয়দিগের প্রভুত্ব বাড়িয়া, পরিশেষে লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগেরও তদ্রূপ। অপর তিন বর্ণের অনুন্নতিতে বর্ণগত ঘোরতর বৈষম্যে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়। অপর বর্ণের মানসিক শক্তির হানি হওয়াতে, তাহাদিগের চিত্ত উপধর্ম্মের বিশেষ বশীভূত হইতে লাগিল। দৌর্ব্বল্য থাকিলেই ভয়াধিক্য হয়; উপধর্ম্ম ভীতিজাত, এই সংসার বলশালী অথচ অনিষ্ট-কারক দেবতাপূর্ণ, এই বিশ্বাসই উপধর্ম্ম। অতএব অপর বর্ণত্রয়, মানসিক শক্তিবিহীন হওয়াতে অধিকতর উপধর্ম্মপীড়িত হইল, ব্রাহ্মণেরা উপধর্ম্মের যাজক, সুতরাং তাঁহাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল। বৈষম্য বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মণেরা কেবল শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তারিত করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রকে জড়িত করিতে লাগিলেন। মক্ষিকাগণ জড়াইয়া পড়িল—নাড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তথাপি উর্ণনাভের জাল ফুরায় না। বিধানের অন্ত নাই। এদিকে রাজশাসনপ্রণালী দণ্ডবিধি দায় সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি হইতে আচমন, শয়ন, বসন, গমন, কথোপকথন, হাস্য, রোদন, এই সকল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের রচিত বিধির দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। "আমরা যেরূপে বলি, সেইরূপে শুইবে, সেইরূপে খাইবে, সেইরূপে বসিবে, সেইরূপে হাঁটিবে, সেইরূপে কথা কহিবে, সেইরূপে হাসিবে, সেইরূপে কাঁদিবে, তোমার জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবস্থার বিপরীত হইতে পারিবে না, যদি হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, আমাদিগকে দক্ষিণা দিও।" জালের এইরূপ সূত্র। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করিতে গেলে আপনিও ভ্রান্ত হইতে হয়, কেন না, ভ্রান্তির আলোচনায় ভ্রান্তি অভ্যস্ত হয়। যাহা পরকে বিশ্বাস করাইতে চাহি, তাহাতে নিজের বিশ্বাস দেখাইতে হয়; বিশ্বাস দেখাইতে দেখাইতে যথার্থ বিশ্বাস ঘটিয়া উঠে। যে জালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষকে জড়াইলেন, তাহাতে আপনারাও জড়িত হইলেন। পৌরাবৃত্তিক প্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে, মানুষের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনাতিরিক্ত রোধ করিলে, সমাজের অবনতি হয়। হিন্দুসমাজের অবনতির অন্য যত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে এইটি বোধ হয় প্রধান, অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। ইহাতে রুদ্ধ এবং রোধকারী সমান ফলভোগী। নিয়মজালে জড়িত হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধি স্ফূর্ত্তিলুপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণ রামায়ণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ, সংখ্যাদর্শন প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছিলেন তাঁহারা বাসবদত্তা, কাদম্বরী

প্রভৃতির প্রণয়নে গৌরব বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে সে ক্ষমতাও গেল। ব্রাহ্মণদিগের মানসক্ষেত্র মরুভূমি হইল।

অতএব বৈষম্যবিষ ভারতীয় প্রজার দুর্দ্দশার একটি মূল কারণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি। কৃষক ও ভূম্যধিকারীতে যে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা; পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু, পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমল, ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যে যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালি দুর্ব্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন ষ্টুয়ার্ট মিল্‌কৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।*

স্ত্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী। যে দেশ স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া না রাখে, সে দেশেও স্ত্রীগণকে পুরুষের উপর নিভর করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয়।

এই প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় সমাজতত্ত্ববিদ্ ইহার বিরোধী। তাঁহারা সাম্যবাদী। তাঁহাদের

* Subjection of women

মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্ব্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত। পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার থাকাই উচিত। পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্ত্রীগণে কেন করিবে না? পুরুষে রাজসভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্ত্রীলোকে কেন হইবে না? নারী পুরুষের পত্নী মাত্র, দাসী কেন হইবে?

আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় তাহার শতাংশও নহে। আমাদিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্ব্বপ্রকার অধীনতা ইহাতে বীজমাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্ব্বরা ভূমি পাইয়া বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এখানে প্রজা যেমন রাজার নিতান্ত অধীন, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে অশিক্ষিত যেমন শিক্ষিতের আজ্ঞাবহ, অন্যত্র তেমন নহে; এখানে যেমন শূদ্রাদি ব্রাহ্মণের পদানত, অন্যত্র কেহই ধর্ম্মযাজকের তাদৃশ বশবর্ত্তী নহে। এখানে যেমন দরিদ্র ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে। এখানে স্ত্রী যেমন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, অন্যত্র তত নহে।

এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ; দেবতাস্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। দাসীত্ব এত দূর যে, পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

এই আর্য্য পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অতি সুন্দর; ইহার জন্য আর্য্যগৃহ স্বর্গতুল্য সুখময়। কিন্তু পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকারশূন্য, সাম্যবাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।

অন্যদেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে। সে কয়টি বিষয় এই—

১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা থাকে।

২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অধিকারী। কিন্তু স্ত্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; বরং সর্ব্বভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বাধ্য।

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকে গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না।

৪র্থ। স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্তু পুরুষগণ স্ত্রী বর্ত্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিতে পারেন।

১। প্রথম তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরও একটু মত ফিরিয়াছে। সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে

বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলেই চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম-এ পাশ করিবে না, এ প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না। যদি কেহ, তাঁহাদিগকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে অনেকেই প্রশ্নকর্ত্তাকে বাতুল মনে করিবেন। কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, মেয়ে অত লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি? যদি সাম্যবাদী সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলেন, "কেনই বা চাকরি করিবে না?" তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, ছেলের চাকরিই জোটাইতে পারি না, আবার মেয়েদের চাকরি কোথায় পাইব? যাঁহারা বুঝেন যে, বিদ্যোপার্জ্জন কেবল চাকরির জন্য নহে, তাঁহারা বলিতে পারেন, "কন্যাদিগকে পুত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্ত্রীবিদ্যালয় কই?"

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতত্ত্বান্তর্গত এই নীতিটি যে অদ্যাপি পরিস্ফুট হয় নাই—লোকে যে স্ত্রীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত।

সেই উপায় দ্বিবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়—দ্বিতীয়, পুরুষবিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।

• দ্বিতীয়টির নামমাত্রে, বঙ্গবাসিগণ জ্বলিয়া উঠিবেন। তাঁহারা নিঃসন্দেহ মনে বিবেচনা করিবেন যে, পুরুষের বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই কন্যাগণ বারাঙ্গনাবৎ আচরণ করিবে। মেয়েগুলো ত অধঃপাতে যাইবেই; বেশীর ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে।

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু আপত্তির অভাব নাই। মেয়েরা মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশু পালন করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? বঙ্গীয় বালিকা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয়। ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে, তাহাই তাহাদের সাধ্য। অথবা তাহাও সাধ্য নহে—কেন না, ত্রয়োদশ বর্ষেই বা কুলবধূ বা কুলকন্যা, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে?

আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখিতে চাই যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ় সূত্রে গ্রথিত, যদি স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বত্র সমানাধিকারবিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে। যাহাকে গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্ম্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায়

নির্ব্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে। অপরঞ্চ পুরুষগণ নির্ব্বিঘ্নে যেখানে সেখানে যাইতে পারে, এবং স্ত্রীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে। এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যাশিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে। বৈষম্যের ফল বৈষম্য। যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে।

কথাটি আর এক প্রকারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কি না? বোধ হয়, সকলেই বলিবেন, "বিধেয় বটে।"

তারপর জিজ্ঞাস্য, কেন বিধেয়? কেহ বলিবেন না যে, চাকরির জন্য।* বোধ হয়, এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন যে, স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধি মার্জ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত।

তারপর, জিজ্ঞাস্য যে, পুরুষগণকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয় কেন? দীর্ঘকর্ণ দেশীয় গর্দ্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তর গণনীয়ের মধ্যে নহে। অন্যে বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জ্জন, এবং বুদ্ধি মার্জ্জনের জন্যই পুরুষের লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন। অন্য যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা গৌণ প্রয়োজন, মুখ্য প্রয়োজন নহে। গৌণ প্রয়োজনও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান।

অতএব বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার করিতে হইল। এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকথিত বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্যত্র সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে সে সাম্য স্বীকার কর না কেন? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সর্ব্বত্র সাম্য স্বীকার করিতে হয়।

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয়। বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিবেচনার স্থল এ নহে। তবে ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী। যদি পুরুষ পত্নীবিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির

* সাম্যবাদী বলেন, চাকরির জন্যও বটে।

ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "যদি" পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত? উচিত, অনুচিত, স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃ-পরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।

অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়। তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্ত্তা পুরুষজাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে; কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।

আর একটি কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধন, হিন্দু মহিলা-দিগের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু স্ত্রীমাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্যসুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে, তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে। এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?

তুমি বিধানকর্ত্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়া বারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।

৩য়। কিন্তু পুরুষের যত প্রকার দৌরাত্ম্য আছে, স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্ধ পশুর

ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।

এই প্রথার ন্যায়বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, অমর্য্যাদা ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্ম্মচক্ষে দেখিবে! কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশ্বালয়ে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? কিছু লজ্জা নাই? যদি না থাকে, তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি।

জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জন্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছুই নহে?

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এরূপ তৈয়ার করিয়াছ যে, তাহারা এখন আর এই শাস্তিকে দুঃখ বলিয়া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে। যাহাকে অর্দ্ধভোজনে অভ্যস্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অর্দ্ধভোজনেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্নাভাবকে দুঃখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা মার্জ্জনীয় হইল না। তাহারা সম্মত হউক, অসম্মতই হউক, তুমি তাহাদিগের সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনন্ত কাল মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, তাঁহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। তাঁহারা বলেন যে, স্ত্রীগণ সমাজমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিলে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে। যদি তাঁহাদিগকে বলা যায় যে, দেখ, ইউরোপাদি সভ্যসমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছা সমাজে বিচরণ করিতেছে, তন্নিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে? তাহাতে তাঁহারা উত্তর করেন যে, সে সকল সমাজের স্ত্রীগণ, হিন্দুমহিলাগণ অপেক্ষা ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং কলুষিতস্বভাব বটে।

ধর্ম্মরক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরনিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দুমহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে। যে ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ, সে ধর্ম্ম থাকা না থাকা সমান—তাহা রাখিবার জন্য এত যত্নের প্রয়োজন কি? তাহার বন্ধনভিত্তি উন্মূলিত করিয়া নূতন ভিত্তির পত্তন কর।

৪র্থ। আমরা চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুষগণের বহুবিবাহে অধিকার, তৎসম্বন্ধে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে, এই অধিকার নীতিবিরুদ্ধ। সহজেই বুঝা যাইবে যে, এ স্থলে স্ত্রীগণের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য

হইতে পারে না ; পুরুষগণের অধিকার কর্ত্তন করাই উদ্দেশ্য ; কারণ, মনুষ্যজাতিমধ্যে কাহারই বহুবিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না।* কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের ন্যায় বহুবিবাহে অধিকারিণী হউন, সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর ন্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার। অতএব, যেখানে অধিকারটি নীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে কার্য্যাধিকারটি অনৈতিক, সেখানে উহাকে কর্ত্তিত এবং সঙ্কীর্ণ করে। সাম্যের ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্বানুবর্ত্তিতা, এই দুই তত্ত্বমধ্যে সমুদায় নীতিশাস্ত্র নিহিত আছে।

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা অতি গর্হিত, তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন যে অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে, এমত ভরসা করা যায় না। আমরা আর দুই একটি কথার উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সর্ব্বসমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয়। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে। পুত্র কন্যা, উভয়েরই এক ঔরসে, এক গর্ভে জন্ম ; উভয়েরই প্রতি পিতা মাতার এক প্রকার যত্ন, এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; কিন্তু পুত্র পিতৃমৃত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা সুরাপানাদিতে ভস্মসাৎ করুক, কন্যা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যও তন্মধ্যে এক কপর্দ্দক পাইতে পাবে না। এই নীতির কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রাদ্ধাধিকারী, সেই উত্তরাধিকাবী ; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অযথার্থ যে, তাহার যৌক্তিকতা নির্ব্বাচন করা নিষ্প্রয়োজন। দেখা যাউক, এরূপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য কোন মূল আছে কি না। ইহা কথিত হইতে পারে যে, স্ত্রী স্বামীব ধনে স্বামীর ন্যায়ই অধিকারিণী ; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বর্য্যে কর্ত্রী, অতএব তাঁহার আর পৈতৃক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মূলস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন ? যে কন্যা দরিদ্রে সমর্পিত হইয়াছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন ? কিন্তু আমরা এ সকল ক্ষুদ্রতর আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক নহি। স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র বা এবম্বিধ কোন পুরুষের আশ্রিতা হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি। অন্যের ধনে নহিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারিণী হইতে পারিবে না—পরের দাসী হইয়া ধনী হইবে—নচেৎ ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি। পতির পদসেবা কর, পতি দুষ্ট হউক, কুভাষী, কদাচারী হউক, সকল সহ্য কর—অবাধ্য, দুর্ম্মুখ, কৃতঘ্ন, পাপাত্মা পুত্রের বাধ্য হইয়া থাক—নচেৎ ধনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির কোন সম্বন্ধ নাই। পতি পুত্র তাড়াইয়া দিল ত সব ঘুচিল। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার উপায় নাই—সহিষ্ণুতা ভিন্ন অন্য গতিই নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ব্বাধিকারী—স্ত্রীর

* কদাচিৎ হইতে পারে বোধ হয়। যথা, অপুত্রক রাজা, অথবা যাহার ভার্য্যা কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত। বোধ হয় বলিতেছি, কেন না, ইহা স্বীকার করিলে পুরুষের বিপক্ষেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। বস্তুতঃ বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার দুই একটা কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন কদর্য্য প্রথা যে, সকল কথার উল্লেখ মাত্রেও অনিষ্ট আছে।

ধনও তাঁর ধন। ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে সর্ব্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং নীতিবিরুদ্ধ।

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থাপ্রভাবে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকে বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই ; যত প্রকার বন্ধন আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্ত্রীগণের হস্তপদ বাঁধিয়া পুরুষপদমূলে স্থাপিত কর—পুরুষগণ স্বেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম নারীগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারে। জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয় ; পুরুষগণ স্ত্রীজাতির বশবর্ত্তী হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছ, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র? না রজ্জুটি পুরুষের হাতে বলিয়া, স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন? ইহা যদি অধর্ম্ম না হয়, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা—পতি অপুত্রক মরিলে। এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব। এইরূপ বিধি দুই একটা থাকাতেই আমরা প্রাচীন আর্য্য-ব্যবস্থাশাস্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি। কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র। স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী বটে, কিন্তু দানবিক্রয়াদির অধিকারিণী নহে। এ অধিকার কতটুকু? আপনার ভরণ-পোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাঁহার জীবনকালমধ্যে আর কাহাকেও কিছু দিবেন না, এই পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার। পাপাত্মা পুত্র সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিঘা হস্তান্তর করিতে সমর্থ নহেন। এ বৈষম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব নাই—স্ত্রীগণ অল্পবুদ্ধি, অস্থিরমতি, বিষয়রক্ষণে অশক্ত। হঠাৎ সর্ব্বস্ব হস্তান্তর করিবে, উত্তরাধিকারীর ক্ষতি হইবে, এ জন্য তাহারা বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্ত হওয়াই উচিত। আমরা এ কথা স্বীকার করি না। স্ত্রীগণ বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, চতুরতায় পুরুষাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয়রক্ষার জন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ। তোমরা তাহাদিগকে পুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয়কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহাদিগের বৈষয়িক শিক্ষা হয় না। আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা করিও। আগে মুড়ি রাখিয়া পরে পাঁটা কাটা যায় না। পুরুষের অপরাধে স্ত্রী অশিক্ষিতা—কিন্তু সেই অপরাধের দণ্ড স্ত্রীগণের উপরেই বর্ত্তাইতেছে। বিচার মন্দ নয়!

স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই—অসতী স্ত্রী, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে। শুনিয়া দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যা! এতকালে হিন্দুস্ত্রীর সতীত্বধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনি মর্ম্মস্থানে বাজিয়াছিল যে,

হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সম্বাদপত্র, "হা সতীত্ব! কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরেজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া "ওরে চাঁদা দে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না; কেন না, দেশী সম্বাদপত্র পাঠসুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে? বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষে বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ,—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না, সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী। ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?

স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়, তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রীগমন করুক, পরদারনিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? শাস্ত্রে ভূরি ভূরি নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। একজন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর একজন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না; এবং তাঁহার কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য।

আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক ভিন্ন এদেশীয় স্ত্রীগণ উপার্জ্জন করিতে পারে না। সত্য বটে, উপার্জ্জনকারী পুরুষেরা আপন আপন পরিবারস্থা স্ত্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক এ দেশে আছে যে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, এমন কেহই নাই। বাঙ্গালার বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষতঃ লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথা বঙ্গবিধবাদিগের অন্নকষ্ট লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই। তাহারা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি

করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়—তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প। অন্য কোনপ্রকারে ইহারা যে উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, তাহারা দেশী সমাজের রীত্যনুসারে গৃহের বাহির হইতে পারে না। গৃহের বাহির না হইলে উপার্জ্জন করার অল্প সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, এ দেশীয় স্ত্রীগণ লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিতা নহে; কোনপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে কেহ উপার্জ্জন করিতে পারে না। তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী শিল্পীরা প্রতিযোগী, এ দেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অন্ন করিয়া সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাহার উপর স্ত্রীলোক প্রবেশ করিয়া কি করিবে?

এই তিনটি বিঘ্ন নিরাকরণের একই উপায়—শিক্ষা। লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক্, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়া। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয় জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোসিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহার উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয় দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

যায় না; কেন না তাহাতে রঙ্ তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন না, তাহাতে রায় বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?

উপসংহার

এ দেশের বর্ত্তমান সমাজের তৃতীয় দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে জাতিগত বৈষম্যের উল্লেখ করিতে হয়। আমরা বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলিতেছি না। প্রাচীন ভারতের বর্ণ-বৈষম্যের ফলের পরিচয় দিয়াছি। তাহার ফলে যে সামাজিক বৈষম্য জন্মিয়াছে, তাহা কৃষকের উদাহরণে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে বর্ণগত বৈষম্যের সঙ্গে অধিকারগত বৈষম্য নাই; যাহা আছে, তাহা সামান্য। জাতিগত যে বৈষম্য বলিতেছি, তাহা জেতা ও বিজিতের মধ্যে।

যে জাতি রাজা ও যে জাতি প্রজা, তাহাদিগের মধ্যে এ দেশে অধিকারগত বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্য এতদ্দেশীয়গণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বিচারিত হইয়া থাকে, সুতরাং এ গ্রন্থে তাহার সবিস্তারে বিচার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে, আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে, অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তিনটি প্রস্তাব (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১২৮০, কার্ত্তিক ১২৮২) আর 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধের কতক অংশ একত্র করে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সাম্য' প্রকাশিত হয়।

'বিজ্ঞাপন' ছিল এইরূপ :

"এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত। কৃষকের কথা যে আধুনিক সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণ-স্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। প্রাচীন বর্ণ-বৈষম্যের ফলস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

"সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি—সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে, কেহ রাগ করিবেন না। আরও, স্বদেশীয় সাধারণজনগণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

'সাম্যে' প্রচারিত মত বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্ত্তীকালে 'ভুল' মনে করতেন—["বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।" (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', পৃষ্ঠা ১৯৮)] এই কারণে তিনি এই গ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ করান নি।—সম্পাদক, ব. র. স.।

মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম গুড় মহাশয় এই জগৎ পবিত্র করিবার জন্য, কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহা লেখে না। ইতিহাস এরূপ অনেকপ্রকার বদমাইশি করিয়া থাকে। এ দেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, নচেৎ উচিত ব্যবস্থা করা যাইত।

যশোদা দেবীর গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না, উচ্চবংশের কথা কিছুই বলিতে পারা গেল না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ মনে না করেন যে, তিনি মিষ্টবিশেষ হইতে জন্মিয়াছিলেন।

সাফলরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় মোহনপল্লী, অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘর কতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড় মহাশয় মোনাপাড়ায় একমাত্র ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক সূর্য্যই দিনমণি, যেমন এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম এক ব্রাহ্মণ মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা পাকা কদলী, আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পূজায়, অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী এবং তদর্জ্জিত রম্ভাভোজনের হক্‌দার হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বান্বিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম। এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দুষ্ট লোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো কালো কোঁকড়াচুল নধরশরীর মুচিরাম দাস নামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক, যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরাম শর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে "মা", "বাবা", "দু", "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচলে হয়।

পাঁচ বৎসরে সাফলরাম গুড় মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচ বৎসরে পুত্রের হাতে খড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের তিনপুরুষের মধ্যে

সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যে দিন কথা পড়িল, সে দিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরু মহাশয় নাই। কে লেখাপড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সম্বাদ-সুনিবেদিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল, তুমি কেন আপনিই হাতে খড়ি দিয়া ক, খ শিখাও না।" সাফলরাম একটু ম্লান হইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা আমি পারি, তবে কি জান, শিষ্যসেবক যজমানের জ্বালায়—আজি কি রান্না হইল? শুনিবামাত্র যশোদা দেবীর মনে পড়িল, আজি কৈবর্ত্তেরা পাতিলেবু দিয়া গিয়াছে। বলিলেন, "অধঃপেতে মিন্সে—" এই বলিয়া পতিপুত্রপ্রাণা যশোদা দেবী বিষণ্ণমনে সজলনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—"পরা অপরা চ"—গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। কৈবর্ত্ত যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের ঘরে সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দেশ এবং অন্যান্য সে সকল জাতীয় সন্দেশের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বদা মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে, কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন। এক বৎসরে মুচিরাম সন্ধ্যা আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কিনা, আমরা জানি না। কেন না, প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই।

তৎপরে একদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাওঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল।

*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যশোদার আর দিন যায় না। যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর এক ঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশ বৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোয়ারী পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারি; কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিন দিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিন রাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আস্ত-যাত্রা এই প্রথম শুনিল; চূড়া ধড়া ঠেঙ্গা লাঠি সহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সম্বাদ রাখি যে, পরদিন মুচিরাম, গালাগালি মারামারি বা চুরি বা মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথম দিন যাত্রা শুনিয়া বহু যত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন—প্রভাতবায়ুপরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারী মহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল,—মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে টাকার সিন্দুকের ভিতরেও প্রবেশ করিল। অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন—জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীল মহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীলবাবুদেরই বা দোষ কি—*Glorious British Constitution !* হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারী মহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মত এবঞ্চ কুরঙ্গিণীসদৃশ, মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে ?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু ভাল নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তার মার নিকট গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে ? এদিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলে ? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন ? আমি না দেখিতে পাই, তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল থাকিবে, ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না। অগত্যা পাঁচ টাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুচিরাম অল্পদিনেই জানিল যে, যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুল ভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারী মহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্পদিনেই মুচিরামের সোণার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে,

পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘ বৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন তালের বড়া করে।—মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বাহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা—লোচনচঞ্চলা

দধতি সুন্দররূপং"

মুচিরাম গায়িল—"নীরদ কুন্তলা—" থামিল—আবার পিছন হইতে বলিল, "লোচনচঞ্চলা"—মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল, "লুচি চিনি ছোলা"। পিছন হইতে বলিয়া দিল, "দধতি সুন্দররূপং"—মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল, "দধিতে সন্দেশ রূপং"। সেদিন আর গায়িতে পাইল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—"আ—বা—আ—বা—ধবলী"টি মুখস্ত ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে, "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতক দূর বলিল, "মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে—" সেই সময়ে বেহালা-ওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল, "গুড়ক খাও—" শুনিয়া মুচিরাম বলিল, "রাধে—একবার বদন তুলে গুড়ক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের—যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল, অধিকারী সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক·সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল যে, এই বাঁক তাহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তর লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারী মহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার ও তাহার পিতৃপিতামহ, মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া .অস্ফুটস্বরে অধিকারী মহাশয়ের পিতৃমাতৃ সম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান করিয়া না পাইয়া, সাজঘরে গিয়া বেশ ত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া,রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে সম্বোধন করিতে লাগিল; এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাহাকে কদলীভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধ কবাটকে বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া, মুচিরাম ঠাকুর-বাড়ীর মন্দিরের রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারী মহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন, মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল, তাহাকে খুঁজিয়া আনিব? অধিকারী মহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুটতে হয়, আপনি জুটবে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারি নে।" দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, "ছেলেমানুষ—যদি নাই জুট্তে পারে—আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা, মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাঁকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রিজাগরণ—দেবালয়বরণ্ডে সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে, অধিকারী কোন্ পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারি বামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিন প্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

গ্রন্থকার ভনে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপচৌদ্দপুরুষ বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্য জগতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে হে বাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমাদের যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঈশানবাবু একজন সংকুলোদ্ভুত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না, বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী। বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃপতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী চরণ-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী সেই অপূর্ব্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশানবাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটি লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কিনা বলিতে পারি না। যাত্রার পরদিন সন্ধ্যা-কালে তিনি পথে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্কশরীর, দীর্ঘকেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ্ছিস্ কেন বাবা?" ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম।"

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন্ বামনদের?

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা তো মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হৌক, ঈশানবাবু অল্প সময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব" এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন। মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং ক্ষণমলার অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরাম বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এদিকে ঈশানবাবুর ছুটি ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও, যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িলে, তবে একটু লেখা পড়া শিখিতে হইবে।" ঈশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এখানে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া, পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া, শেষ আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে, যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত, তবে সে আহারের সময়—ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্লমল্লিকাসন্নিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্য ঘৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্যভর্জ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, "মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!" সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময়ে নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরু মহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না, এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর

এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছু হইল না। ঈশানবাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। মাষ্টারেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে, কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টারেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ বাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত। ঈশানবাবুর ঘরের তপ্ত লুচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম, তপ্ত লুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "ঘুস-ঘাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আট গণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই তাহা প্রতিবাসিনীবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন এবং মুচিরামকে পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পোয়া বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুই চারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিশকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পুলিশের নামে পরওয়ানা-খানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে এক টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা, ক্রমে পাঁচ টাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন মাজিষ্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না—এক কোণে বসিয়া এক একজন মুহুরি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা এক রকম বলিত, মুচিরাম আর এক রকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া ফি সাক্ষ্য-প্রতি চারি আনা, আট আনা, এক টাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানাপ্রকার ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহেন, সকলেই করিত—তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ—কখন কখন লোকের ট্যাঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হৌক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন্ মুচি না হয়?—অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিঙ্গ—যাহার নাম করিতে আছে এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মুচিবাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দিল্লীর নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়ি কাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিট্‌খিট্ করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ,—সকল-তাতে মুচিরাম গালি খাইত। সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজপত্র ছুঁড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল—নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিক কাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলি হইয়া গেল—আর একজন আসিল।

এই নূতন সাহেবটির নাম (Grongerham) লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত গ্রঙ্গারহ্যাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব অতি ভদ্রলোক, দয়ার সাগর, কাহারও কোন অনিষ্ট করিতেন না, মোকদ্দমা করিতে গিয়া, কেবল ডিস্‌মিস করিতেন। তবে সাহেব কিছু অলস, কাজ কর্ম্মে বড় মন দিতেন না, এবং নিজে সরল বলিয়া তাঁবেদারদিগের উপর বড় বিশ্বাস ছিল। সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যত দিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের কালোকালো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া, এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া নিজের সরলচিত্তে একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আপিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না, কাজকর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। একদিন আপিসের মীর মুন্সী মিরজা গোলাম সর্ফদর খাঁ সাহেব, দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুন্সীর বেতন কুড়ি টাকা—কিন্তু বেতন কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধিরসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা একজনে পারে না—মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন, কোষ্ঠীতে তাহা লেখে না—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয় রহিত হইয়া তিনি অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই "হিতোপদেশ"-গুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ—আর এ দেশের সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—চাণক্য ভারতের রোশফুকল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুচিরাম দুই তিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারি খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মঠ লোক ছিলেন, কিন্তু একটা দোষ ছিল—কিছু মিষ্ট কথার বশ।

মুচিরাম একখানি ইংরেজি দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজবিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যা হৌক না হৌক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি 'মাই লার্ড আর 'ইওর লার্ডশিপ' থাকে।" লিপিকর সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানি ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া, থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন; চুড়িদার আস্তীন আল্লাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বুকফাঁক বন্ধকওয়ালা ঢিলা আস্তীন লাংক্লথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া স্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন; এবং চাঁদনির আমদানি নূতন চকচকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখানা সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোম সাহেব এজলাসে বসিয়া দুনিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

রেল দেওয়া কাটরার ভিতর, উঁচুতে হোম সাহেব এজলাস করিতেছেন। চারি দিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে--লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—একটা স্পানিয়েল টেবিলের নীচে শুইয়া, অর্থিগণের নয়নপথে লাঙ্গুল-শোভা বিকাশ করিতেছে—এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরিটির মালিক হোম সাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন—সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলারশিপ হোল্‌ডার। সাহেব তাঁহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন। "I dare say, you are well up in Shakespeare and Milton and Bacon and so forth. Unfortunately we don't want quotations from Shakespeare and Milton and Bacon in the office. It is not the most learned man who is best fitted for this kind of work. So you can go, Baboo." অনেকে শামলা

মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন, সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see; I want a poor man who will work for his bread. You will throw up your place on the slightest quarrel. You can go" শামলা চেনের দল, অভিমন্যুসম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম, এবং তাহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন, "Why do you call me, my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল, "বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড-ঘরানা।"

এখন হোম সাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল। সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল; মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন, "হো সকতা; লার্ড ঘরানা হো সকতা; লার্ড ঘরানা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বুঝিল যে, মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল, "বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হজুর লার্ড হেঁ।"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বহাল করিলেন।

Struggle for existence? Survival of the Fittest! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

হোম সাহেবের কিছু মাত্র দোষ নাই। দেশী, বিদেশী, সকল মনুষ্যই এইরূপ। সকলেই মিষ্ট কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্ট কথা ভুলিতেছে। হোম সাহেব একজন অতিশয় সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ লোক। মূর্খ মুচিরামও তাঁহাকে ভুলাইতে পারিল—কেবল মিষ্ট কথার বলে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুচিরামবাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু, এখন তাঁহাকে শুধু মুচিরাম বলা যাইতে পারে না—মুচিরামবাবু পেস্কারি পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারি পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরামবাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আপিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বার বৎসর তাইদনবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ, কালেক্টরীর সকল কর্ম্ম কাজ বার বৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই—ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসাখরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসায় লইয়া গিয়া রাখিলেন। ভজগোবিন্দ মুচিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্ম্মে সহায়তা করে, রাত্রিকালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে, এবং আপিসের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। মুচিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের

সাহায্যে মুচিরামের কাজ কর্ম্ম রেলগাড়ির মত গড় গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধ প্রণালীতে সেলাম করিত, এবং "মাই লার্ড" এবং "ইওর অনার" কিছুতেই ছাড়িত না।

মুচিরামবাবুর উপার্জ্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, "টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই—তালুক মুলুক করুন।" মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কর্ম্ম করে, সে জেলায় বিষয় খরিদ করা নিষেধ। ভজগোবিন্দ বলিল যে, বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা, ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এ দিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন যে, স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না জানি না,—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে, স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখনকার দেবত্র। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকুরুণের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়কর্ত্তা "সেবাইত" মাত্র—পরম ভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত। এইরূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। বিষয় হস্তান্তরের কিছু সুবিধা হইয়াছে। দধি ভোজনের পক্ষে নেপোর খুব সুযোগ হইয়াছে।

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ, ইহা মুচিরাম বুঝিলেন, কিন্তু এই সঙ্কল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মুচিরামের স্ত্রী নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই—অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এ স্থলে অনুকল্প চলিবে কি না, তদ্বিষয়ে পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল—কিন্তু ভজগোবিন্দ একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে, এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন্ কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে, তাহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মুচিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভ লগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সুতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমিদারী পত্তনি ছলে, বলে, কলে, কৌশলে খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধান ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দ বৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল, সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল—সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে; মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং মাই লার্ড বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সময়ে হোম সাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাঁহার স্থানে রীড সাহেব আসিলেন। রীড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটি বৃক্ষভ্রষ্ট বানর—অকর্ম্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু রীড সাহেব যেমন বিচক্ষণ, তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্; সেকালের হেলীবরির সিবিলিয়ান সাহেবরা বাঙ্গালীদিগকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। মিছে ছুতাছলে কাহাকে অন্নহীন করিতে রীড সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছুক; কাহাকে একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল ভূসম্পত্তি করিয়াছে—রীড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। রীড সাহেব মুচিরামকে দুই একবার ইস্তেফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারি বার "গরীব খানা বেগর মারা যায়েগা" বলাতে তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তারপর তাহাকে পেস্কারির তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে যে, আমার শরীর ভাল নহে, মফস্বলে গেলে মরিয়া যাইব—হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ালুচিত্ত রীড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা রীড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গাল আপিসে সেক্রেটারি ছিলেন—রিপোর্ট পৌঁছিবামাত্র মুচিরাম ডিপুটি বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

রীড সাহেব ইহাতে বিজ্ঞ লোকের মতই কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, ভারি ঘুষখোরেও ডিপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে, ডিপুটিগিরি এক প্রকারে আমলাদিগের বৈধব্য—বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মুচিরাম যে মূর্খ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; সেরূপ অনেক ডিপুটি আছে, ডিপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। অতএব রীড সাহেব লোকহিতার্থ মুচিরামকে ডিপুটি করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছিলেন।

আপিসে সম্বাদ পৌঁছিল যে, মুচিরামের উচ্চ পদ হইয়াছে। একজন বুড়া মুহুরি ছিল, সে বড় সাধুভাষা বুঝিত না। "উচ্চ পদ" শুনিয়া সে বলিল, "কি? ঠ্যাঙ্গ উঁচু করেছেন না কি? ভাগাড়ে দিয়া আইবা।"

দশম পরিচ্ছেদ

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াই শত টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে? মুচিরাম

সিদ্ধান্ত করিলেন—ডিপুটিগিরি অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ বুঝাইলেন যে, অস্বীকার করিলে রীড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে, মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারি ছাড়িতেছে না—তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুই দিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রূবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে, শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড রায়বাহাদুর ডিপুটি কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল,—কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরি রূবকারী লিখিয়াছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে—গুড়টা নাই লিখিলে। শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, কিন্তু আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায়খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা' এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লিখিলেই হইবে।" মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মুহুরি দ্বিতীয় রূবকারীতে লিখিল, "বাবু মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর।" মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম "রায়" চলিতে লাগিল; কেহ লিখিত, "মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর," কেহ লিখিত, "রায় মুচিরাম রায় বাহাদুর।" মুচিরামের একটা যন্ত্রণা ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসাক্ষাতে বলিত "গুড়ের পো"—অথবা "গুড়ে ডিপুটি।" আর স্কুলের ছেলেরা কবিতা শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত,

"গুড়ের কল্‌সীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি সার কি মাত?"

কেহ বলিত,

"সরা মাল্‌সায় খুসি নই।
ও গুড় তোর নাগরী কই?"

মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কোঁচা বাঁধিয়া আছাড় খাইলেন—ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষে মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া কবিতা হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুর গুড়ের সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা।

বাজারে যাহা হউক, সাহেব মহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। সেই মিষ্ট কথা। একবার তিনি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এত্তেলা হইবামাত্র বলিলেন, "নেকাল দেও শালাকো।" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।"

দ্বিতীয়। মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না—তাতে আবার মুচিরাম বিচার আচারের বড ধার ধারিতেন ন'—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মস্কোবাব দেখিয়া সাহেবরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জনরব যে, মুচিরামের একেবাবে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে। কতকগুলো চেঙ্গড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আরও পদবৃদ্ধি? ছটা পা হবে না কি?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখানকার কমিশ্যনার একজন ভারি বিচক্ষণ ডিপুটি কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন—বিচক্ষণ ডিপুটি? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক। গবর্ণমেন্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটির্গাঁ বদলি করিলেন।

সম্বাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরি ছাড়িতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, চাটির্গাঁ গেলেই লোকে জ্বর প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে, চাটির্গাঁ যাইতে সমুদ্র পার হইতে হয়—এক দিন এক রাত্রের পাড়ি—সুতরাং চাটির্গাঁ যাওয়া কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা—সে বলিল, "আমি কোন মতেই চাটির্গাঁ যাইব না—কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোড়া লইয়া তেঁতুল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভালবাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন, "ওতে ভারি অম্বল হয়—ও বিষ।" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন—মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও শর্করা সংযোগপূর্ব্বক আধ সের চাউলের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণলোচনে শপথ করিলেন যে, তিনি কখনই চাটির্গাঁ যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না—সমুদায় তেঁতুলমাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপান-কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরিতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডিপুটিগিরির সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম ভদ্রকালীকে বলিলেন, "প্রিয়ে!" (তিনি সে কালের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে! বিষয় যেমন আছে—তেমনি একটি বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?"

ভদ্র। দাদা বলে, এখানে বড় বাড়ী করিলে, লোকে বল্‌বে, ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুক পুরে বড়মানুষি করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে, সেই গ্রামেই বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন। ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, যত বড় মানুষের বাড়ী কলিকাতায়—তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল, একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া, এক কালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়—ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল—যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না,—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ। যাহারা রাজপথে কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না—সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ী করিয়া বাজার যাইতেন, এবং যাহা দেখিতেন, তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানি দেখিয়া বিক্রেতৃবর্গ পাঁচ টাকার জিনিসের দেড় শত টাকা হাঁকিত, এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল যে, বাবুটি মধুচক্র-বিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুটিতে ছুটিল। জুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিষ্কর্ম্মা ভাল ধুতি চাদর, জুতা ও লাঠিতে অঙ্গ পরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল—তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজনা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায়, এবং

বাবুর প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে। টাকাটায় আপনার বার আনা মুনাফা রাখে, বলে দাঁওয়ে যোওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয় পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্রবাবু প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়—একটু ব্রাণ্ডি বা একখানা কাটলেটের লোভে কাহারও আনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর কাষ্ঠ কাচ কার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত; তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলো দ্বারবান্ গালচাল্লা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়—তিনখানা গাড়ি আছে, সোণাবাঁধা হুঁকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাঁধা 'কাগজ'—সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর,—জুয়াচুরিতেই এই সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন যে, গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে; আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কি প্রকারে—বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। রামচন্দ্রবাবু বড়লোক—মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অনুচর মুচিরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্রবাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী—মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি। রামচন্দ্রবাবুর সেই ইচ্ছা! তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ; মুচিরাম গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্প কালেই মুচিরাম-মৎস্য ফাঁদে পড়িল—রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন—মুচিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণভূমে তাঁহার রাখাল—কালীঘাট হইতে চিতপুর পর্য্যন্ত, তখন মুচিরামবলদ সুখের গাড়ি টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়োয়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা করা গেল—

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না—মাপ করিও। দুইখানা গাড়ি কিনিয়াছি—একখানা বেরুষ—

একখানা ব্রৌনবেরি। একটা আরবের মুড়িতে ২২০০৲ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ, তাহা জানিলে কখন আসিতাম না—সেখানে সাত সিকায় কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ারী হইত—এখানে একটা চাপকানে ৮৫৲ টাকা পড়িয়াছে। এক সেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না—এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বানরামি নম্বর এক। তারপর, মুচিরাম, কলিকাতায় যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্রবাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাঁহার বাড়ীতে আসিলে জন্ম সার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে, সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র; মুচিরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তারপর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক জায়গাতেই ঝাঁটা লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্ট কথা পাইলেন। অনেকস্থানেই একজন মাতাল জমীদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তারপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশ্যনে ঢুকিলেন। নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু কথিত মহামহিমমহাসভার "একটা বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন, এই ছোট মুচিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় একজন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ডু, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাড়িত না। গবর্ণমেণ্ট হৌসে ও বেলবিডীরে গেলে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে গবর্ণমেণ্ট হৌসে ও বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী, নিরীহ—সেকেলে খাঁটী সোণা, একালের ঠনৎঠনে পিতল নয়। অতএব মুচিরামকে বহাল করিব।"

অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বড় বাড়াবাড়িতে অনরেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফন্দিতে অল্প দামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীত সম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনটন হইয়া আসিল। দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্রবাবুর কাছে। রামচন্দ্রবাবুর সঙ্কল্প এতদিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এত বড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাখিলেন — জানেন যে, মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবে না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে, এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল, যে, গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা—এই সুযোগে একটা বড় চাকরি যোটাইয়া লইতে হইবে—এই ভরসায় ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন, মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন।

বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুশী হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকবর্ত্তী স্থান সকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহালে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে সশরীরে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত—বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল—প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা টেঁকে টাকা লইয়া মুচিরাম-দর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে আর একদিকে তাঁহার আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মুচিরাম-দর্শনে আসে—কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট, তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই—তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে—তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ প্রকাশে তাহাদের

বেলা গেল ; তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া অশ্বযানে একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীন্‌ওয়েল্। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী এবং পরিশ্রমী। কিসে এ দেশের লোকের মঙ্গল সাধন করিবেন, সেই জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বৎসর ঐ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইযাছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল—তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলে লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সহজেই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য, নিকটে একজন চাষাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

চাষা অবশ্য ইংরেজি জানে না। সাহেব উত্তম বাঙ্গালা জানেন, পরীক্ষা দিয় পুরস্কার পাইয়াছেন ; সুতরাং চাষার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাডিগের গ্‌ডামে* ডুব্‌বেক্কা† কেমন আছে?"

চাষা ত জানে না ডুড়্‌বেক্কা কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পড়িল। ডুড়্‌বেক্কা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে?" ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে, সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয়ত এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে যে, ভাল আছে, তাহ হইলে সাহেব হয়ত ডুড়্‌বেক্কাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে : তাহা হইলে কি করিবে? চাষা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার—Sick?" সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "Well there may be much sickness without there being any scarcity the fellow does not understand perhaps ; these people are so dull—I say ডুড়্‌বেক্কা কেমন আছে—অঢিক আছে কিংবা অল্প আছে?"

এখন চাষা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে, এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম। (সে দেশের নীলকর নাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাস করিতেছে যে, ডুড়্‌বেক্ক অধিক আছে, কি অল্প আছে—তখন ডুড়্‌বেক্কা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল, কই, আমরা ত ডুড়্‌বেক্কার টেক্স দিই না ; কিন্তু যদি বলি আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই—তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টোমাডের গ্‌ড়ামে ডুড়্‌বেক্কা অঢিক কিম্বা অল্প আছে?"

চাষা উত্তর করিল, "হুজুর, আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুড়্‌বেক্ক আছে।"

---

* গ্রামে। † দুর্ভিক্ষ।

সাহেব ভাবিলেন, "Hump! I thought as much— পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে বোজন করিল?" (উদ্দেশ্য "ভোজন করাইল")

চাষা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে।

সাহেব, চটিয়া, "টাহা আমি জানে— They eat, that I see—but who pays?—টাকা কাহাড়?"

এমন সে চাষা জানে যে, যত টাকা আসিতেছে সকলই জমীদারের সিন্দুকে যাইতেছে, সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল—অতএব সে বিনা বিলম্বে উত্তর করিল, "টাকা জমীদারের।"

সাহেব। Ah! there it is, they do their duty—how it is that some people find pleasure in maligning them? জমীদারের নাম কি?

চাষা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে?

চাষা। তা ধর্ম্মাবতার, প্রজারা রোজ রোজ আসে খায় দায় যায়।

সাহেব। এ গ্ড়ামের নাম কি?

চাষা। চন্নপুর।

সাহেব। নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন

For Famine Report

"Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every day a large number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ায় চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। [illegible] আসায় গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আট আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চন্দ্র মহাশয়ের বুদ্ধিকৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এ দিকে মীনওয়েল সাহেব যথাকালে রিপোর্ট লিখিলেন। একটি পারাগ্রাফ শুধু মুচিরাম রায় সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগুলির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশ্যনরীতে গেল। কমিশ্যনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া—কমিশ্যনর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেণ্টে গেল। গবর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা—যে যার প্রজা, সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগের সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায় মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল—রাজাবাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট বলিলেন, তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৯০ সনে)।

''বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন,

"পাঠকদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাজ ভিন্ন, কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্যচরিত্র দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্যচরিত্র সকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে; কিন্তু তৎস্থিত কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে। যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, তিনিই ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা করি, তিনি কথাটা মনে মনেই রাখিবেন। প্রকাশে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখি না।"

সম্পাদক, ব. র. স.।